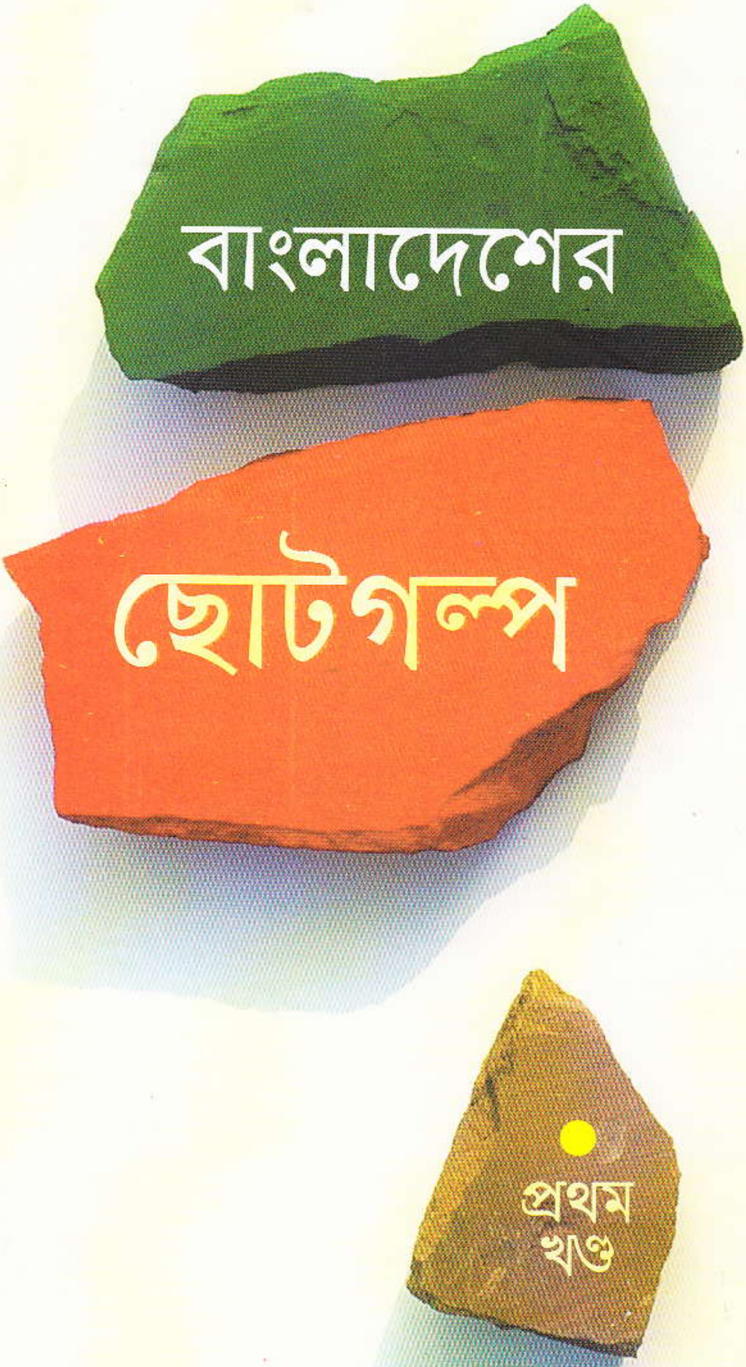
বাংলাদেশের
ছোটগল্প
প্রথম
খণ্ড

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের ছোটগল্প

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

আহমাদ মোস্তফা কামাল

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৪৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0243-7

BANGLADESHER CHHOTOGALPO [Vol. 1]
A collection of short stories of Bangladesh
Edited by Ahmad Mustafa Kamal
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Price : Tk. 250.00 only

উৎসর্গ

প্রীতিভাজন বন্ধুযুগল
মাজহারুল আনোয়ার
ও
মাহমুদা আখতার
গল্পময় হোক সমগ্র জীবন!

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সৌভাগ্য যে, এগুলোর জন্ম হয়েছিল এবং শৈশব-কৈশোরে এরা পরিচর্যিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো দুজন জাতশিল্পীর হাতে। এই একটি ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য পৃথিবীর যে-কোনো দেশের কথাসাহিত্য থেকে আলাদা, ইউনিক। আর কোনো দেশে গল্প বা উপন্যাসের জন্ম এককভাবে কোনো লেখকের হাতে হয়নি, জন্মেই এতটা পরিচর্যা পায়নি, এত দ্রুত পত্রপল্লবে বিকশিতও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গল্পচর্চার সময়কাল খুব বেশি নয়— অথচ এই সময়ের মধ্যেই বহুবিচিত্র বিষয় ও চরিত্র, আর নির্মাণকৌশলের চমৎকারিত্বে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছিল বাংলা গল্পের ভুবন। এর পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) মতো প্রতিভাবান কথাশিল্পীর হাত ধরে বাংলা গল্প অতি দ্রুত হয়ে উঠল প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু একটি সত্য এ প্রসঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে যে, ১৯৪০ দশকের আগ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে পূর্ববাংলার মানুষ ও তাদের জীবন প্রায় উপেক্ষিতই ছিল। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর কোনো উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা এই সময়ে চোখে পড়ে না। যেটুকু হয়েছে তা সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, অনুল্লেখযোগ্য। অন্তত এই সময়ের লেখা পড়লে বাঙালি জাতির অর্ধেক অংশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না— যেন তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই! এর কারণও হয়তো ছিল। মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে তেমন কোনো শক্তিমান কথাশিল্পী '৪০ দশকের আগে আত্মপ্রকাশ করেননি। অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছে এই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ-ভাষা-বিশ্বাস-সংস্কার সবই অচেনা ছিল। একটি 'লালসালু' লেখার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাই যোগ্যতম লেখক, এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেও সেটি লেখা সম্ভব ছিল না। তো, '৪০ দশক থেকে পূর্ববাংলার মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী, বাংলা কথাসাহিত্যে নিজেদের ছবি দেখা শুরু করল। এই দিক থেকে সময়টি বাংলা কথাসাহিত্যের একটি টার্নিং পয়েন্ট। আর এই বাঁক ফেরার মুহূর্তে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ও শিল্পরুচি নির্মাণের প্রাথমিক দায়িত্ব নিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, সরদার জয়েনউদদীন, মাহবুব-উল-আলম, আবু রুশদ, সোমেন চন্দ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শাহেদ আলী, রশীদ করীম,

শামসুদ্দিন আবুল কালাম প্রমুখ। এঁদের ছিল ঈর্ষা করার মতো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গল্প-উপন্যাস সম্ভার, কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না— তাঁদের সামনে খুব গভীর একটি সমস্যাও ছিল। একটি নতুন রাষ্ট্র আর তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্ন, মানুষের জীবনাচরণে নব্য রাষ্ট্রের নতুন ধরনের খবরদারি ভূমিকায় সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এত সহজে রূপায়ণ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, যেহেতু এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান, এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মোটামুটিভাবে উপেক্ষিতই ছিল, ফলে এক্ষেত্রে কোনো ঐতিহ্যের ভাগীদার তাঁরা হতে পারেননি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে যা-কিছু কাজ হয়েছে, সেই উত্তরাধিকারকে ধারণ করেই চল্লিশের দশকে যাত্রা শুরু করেছিলেন পূর্ববাংলার তরুণ লেখকরা। তারপর প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাস। এরই মধ্যে বাংলাদেশের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসেছে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন। ভাষা আন্দোলনের মতো অনন্য ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের মতো অসামান্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক পৃথক আবাসভূমি— বাংলাদেশ।

এই সংকলনের তিনটি খণ্ডে এই সময়কালের গল্পগুলোর সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হয়েছে।

দেশভাগের সেই বিহ্বল সময়ে যে কজন আলোকপ্রাপ্ত অগ্রসর মানুষ পূর্ববাংলার শিল্পবোধ, সাহিত্যচেতনা, দর্শনচিন্তা ও জাতিসত্তার স্বরূপ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের অন্যতম এবং অবশ্যই উজ্জ্বলতর, সচেতন, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও লক্ষ্যমুখী। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও আঘাতে লালিত ও বিক্ষিপ্ত এই জনপদের মানুষগুলো তাদের সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাস, সংকট ও সম্ভাবনা, স্বপ্ন ও হতাশা, অর্থাৎ সমস্ত ইতি ও নেতিবাচকতাসহ এই প্রথম ঠাঁই পেল কোনো শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীর সৃষ্টিতে। এই প্রথম কোনো লেখক প্রায় পূর্ব-ঐতিহ্য ছাড়াই এদেরকে তাঁর চিন্তা ও স্বপ্ন ও সৃষ্টির অন্তর্গত করে নিলেন। তাঁর আগে বাঙালি মুসলমান লেখকের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই এতটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেননি। মাত্র তিনটে উপন্যাস— *লাল সালু, কাঁদো নদী কাঁদো* ও *চাঁদের অমাবস্যা,* দুটো গল্পগ্রন্থ— *নয়ন চারা* ও *দুই তীর,* দুটো নাটক— *তরঙ্গভঙ্গ ও বহিপীর,* বত্রিশটি অগ্রন্থিত গল্প, একটি কিশোর নাটক ও একটি একাঙ্কিকা এবং আরো কিছু অগ্রন্থিত রচনা, এই নিয়েই তিনি যে আমাদের প্রধান লেখক, উত্তরকাল যে তাঁকে বরাবরই দেখেছে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে— তার কারণ তো শুধুমাত্র এই নয় যে, তিনি শুধুই একজন কথাশিল্পী। তিনি বরং বাঙালি মুসলমানদের কথাসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পালন করেছেন পিতৃপুরুষের ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যের আবহমান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ধারণ করেও অচিরেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন— পূর্ববাংলার মানুষের জীবন-যাপন, তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা পশ্চিমবঙ্গীয় জীবন-যাপন,

সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। লক্ষ্যমুখী ছিলেন তিনি, সচেতন তো বটেই, ফলে আমরা দেখতে পাই— বিভাগ-পূর্বকালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থে ব্যবহৃত পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতি থেকে তিনি সচেতনভাবেই নিজেকে সরিয়ে এনেছেন। তিনিই প্রথম— অত্যন্ত সফলভাবে এবং নিপুণ কুশলতায়— এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যে উপেক্ষিত এ অঞ্চলের মানুষকে তাঁর সাহিত্যে তুলে আনলেন তাদের মৌলিক ও দৈনন্দিন জীবনাচরণ-সহই— এমনকি তাদের মুখের ভাষাটিও আর উপেক্ষিত রইল না। কী হবে আমাদের ভাষারীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায়— অবিলম্বে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এই অঞ্চলের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন এক গ্রহণযোগ্য ভাষারীতি এবং ব্যবহার করেছিলেন সংখ্যাহীন আঞ্চলিক শব্দ— যা ছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ সঠিকভাবে ফোটে না— যা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-ঐতিহ্য থেকে স্পষ্টতই আলাদা করে ফেলল। এজন্য তাঁকে পেরুতে হয়েছে এক রুক্ষ, অমসৃণ, দীর্ঘপথ। তাঁর গল্পসমগ্র পড়লে অন্তত সে-কথাই মনে হয়। লক্ষ্যমুখী ছিলেন তিনি, নিজের গন্তব্য সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন— কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না। পাকিস্তানি ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের যখন জয়জয়কার চলছে এদেশে, এ জাতিকে কেবলই মুসলমান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, তখন তিনি বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্বকেই বড় করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন, এই অঞ্চলের আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছায়ায় বেড়ে ওঠা জাতিটি শুধু মুসলমানই নয়— বাঙালিও বটে। তিনি তাই তাঁর পাঠকদেরকে অন্যান্য অনেকের মতো আরব-মুসলিমের গৌরব-গাথা শোনাননি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন যথার্থই আধুনিক, সবকিছু মিলিয়ে এই যে জনগোষ্ঠী তিনি তাদেরকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে।

গ্রন্থিত-অগ্রন্থিতসহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পসংখ্যা পঞ্চাশটির মতো। সমাজ সচেতন ছিলেন তিনি, রিয়্যালিস্টিক, পরে অস্তিত্ববাদের দিকে ঝোঁক দেখা দিলেও, তাঁকে এ অঞ্চলের প্রথম সফল রিয়্যালিস্টিক কথাশিল্পী বললে ভুল হয় না। কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেননি তিনি। উপন্যাসে যেমন— *লাল সালু* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*'র মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, গল্পেও তাই। ফলে *নয়নচারা*'য় দুর্ভিক্ষপীড়িত বিপন্ন মানুষ যেমন তাঁর গল্পের চরিত্র হল কিংবা *একটি তুলসী গাছের কাহিনী* গল্পে দেশভাগের ফলে শেকড়হারা মানুষ, তেমনি *দুই তীর* গল্পে প্রেমহীন সংসারজীবনের ক্লান্ত মানুষ। তাঁর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে ভালোভাবে টের পাওয়া যায় অগ্রন্থিত গল্পগুলো পড়লে। বেশ কিছু দুর্বল গল্প এর মধ্যে থাকলেও *ছায়া, দ্বীপ, মানুষ, রক্ত* ও *আকাশ* প্রভৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট বর্ণনাসমৃদ্ধ ধ্রুপদী গল্পও আছে এখানে। এসব গল্পের একধরনের বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। *স্বপ্ন নেবে এসেছিলো*'র মতো অদ্ভুত প্রেমের গল্প, ও *আর তারা*'র মতো ফর্ম ও ভাষা-সচেতন প্রেমের গল্প, *নকল, স্বপ্নের অধ্যায়*'র মতো নতুন দেশ প্রাপ্তির ফলশ্রুতিতে মানুষের পরিবর্তিত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার গল্প,

মাঝি'র মতো মানবস্বভাবের চমৎকার ব্যাখ্যা সম্বলিত গল্প— এই রকম আরো অনেক ধরনের বিষয় ভাবনা ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের গল্পের জন্য একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ গড়ে দিলেন। তাঁকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রথম এবং প্রধানতম দার্শনিক কথাশিল্পী। আর তাঁর গল্পের গুরুত্ব এখানেই। মানুষের মনোজগতের নানাবিধ কার্যকলাপ আর দার্শনিক ভাবনাচিন্তা রূপায়ণে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। বলা যেতে পারে একথাও, একটি নতুন দেশে তিনি খুলেছিলেন কথাসাহিত্যের এক নতুন স্কুল যার ভাষা-বিষয়-দার্শনিক প্রতীতি ছিল তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে আলাদা— আজকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা সেই স্কুলেরই গর্বিত ছাত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলোর মধ্যে *নয়নচারা, জাহাজী, মৃত্যুযাত্রা, একটি তুলসীগাছের কাহিনী, গ্রীষ্মের ছুটি, স্তন, কেরায়া, মতিনউদ্দিনের প্রেম, মানুষ, ছায়া, দ্বীপ, মানসিকতা, ও আর তারা, নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা, মাঝি, নকল, রক্ত ও আকাশ, না কান্দে বুবু* প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

আবু ইসহাকও এ সময়ের ক্ষমতাবান গল্পকার। তাঁর গল্পে সমাজের নিম্নবিত্ত-শ্রমজীবী-সংগ্রামী মানুষের জীবনযাপনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্র খুব সফলভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। শ্রেণিসচেতন ছিলেন তিনি, সামাজিক বৈষম্যগুলো খুব ভালো ধরতে পারতেন— *জোঁক*-এর মতো এমন সফল প্রতীকী গল্পের মাধ্যমে শোষণের সর্বগ্রাসী রূপটিকে চিহ্নিত করার উদাহরণ বাংলা গল্পে খুব বেশি নেই। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৬ সালে, তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস— *সূর্য-দীঘল বাড়ী* এবং অচিরেই পরিণত হন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখকে। তবে যে পরিমাণ সক্রিয়তা-সচলতা-নিরবচ্ছিন্নতা থাকলে একজন লেখকের পক্ষে সবসময় পাঠক এবং সহযাত্রী ও উত্তরসূরি লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা সম্ভব হয়, তা তাঁর ছিল না কোনোদিন। দুটো উপন্যাস, দুটো গল্পগ্রন্থ, একটি রহস্যোপন্যাস, একটি স্মৃতিকথা— প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ লেখকজীবনে এই রচনার পরিমাণকে আমরা কী বলব, সামান্য না নগণ্য?

আবু ইসহাকের দুটো উপন্যাসেরই— *সূর্য-দীঘল বাড়ী* ও *পদ্মার পলিদ্বীপ*— বিষয়বস্তু গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ সমাজ-জীবন বলে অনেকেরই ধারণা যে, তিনি শুধু গ্রাম নিয়েই লিখতেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সে-রকম নয়। গল্পে তিনি কাজ করেছেন বিবিধ বিষয় নিয়ে। তাঁর দুটো গল্পগ্রন্থভুক্ত একুশটি গল্পের মধ্যে *জোঁক* এবং আবর্ত— মাত্র এই দুটো গল্পে তীব্রভাবে গ্রামীণ জীবন এসেছে। *দাদীর নদীদর্শন, শয়তানের ঝাড়ু, বোম্বাই হাজী* প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ সমাজের দেখা মিললেও এগুলোর মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের বর্ণনা নয়— ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে বন্দি মানুষের গল্প বলা হয়েছে এগুলোতে। অন্যদিকে *উত্তরণ, কানাভুলা, বিস্ফোরণ* প্রভৃতি গল্প নিম্নশ্রেণির মানুষ নিয়ে লেখা হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সংকটের বর্ণনা নেই এসব গল্পে, রয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে অসাধারণ মানবিক বোধের

উন্মোচনের গল্প। আবার *বনমানুষ, প্রতিবিম্ব, বর্ণচোর* প্রভৃতি গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক জীবন। নাগরিক জীবন নিয়ে তাঁর গল্পগুলো গতানুগতিক নয়— শহুরে মানুষ ও জীবনের মধ্যে লুকায়িত ভণ্ডামি ও শঠতার উন্মোচন রয়েছে কোনো-কোনো গল্পে, কোনো গল্পে রয়েছে নাগরিক যন্ত্রণার চমৎকার বিবরণ। বেশ কিছু গল্পে আবু ইসহাক ধর্মীয় কুসংস্কারকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন যেমন— *কানাভুলা, প্রতিষেধক, বোম্বাই হাজী, শয়তানের ঝাড়ু, সাবীল* ইত্যাদি। কিন্তু এ-ধরনের গল্পের মধ্যে *দাদীর নদীদর্শন* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবগুলো গল্পেই বিদ্রূপ আছে বটে, কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে, গল্পের মধ্যে এমন সুকৌশলে তা প্রবিষ্ট যে, কখনো সেগুলোকে আরোপিত বা উচ্চকিত বলে মনে হয় না, মেসেজটি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিছক একটি গল্পপাঠের আনন্দও পাঠকের মনে সমানভাবে জেগে থাকে। প্রতীকের ব্যবহার শুধু এই গল্পেই নয়, আরও অনেক গল্পেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন আবু ইসহাক। তাঁর অতি বিখ্যাত গল্প *জোঁক* শুধু এর অসাধারণ প্রতীকময়তার কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে বহুবছর ধরে। ভাগচাষিরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়, কিন্তু অর্ধেকই দিয়ে দিতে হয় মালিককে। নানাভাবে তারা প্রতারিত হয়, অনুভব করে— জোঁকের মতোই এরাও তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে পাট তোলার সময় জোঁকের রক্ত চুষে খাওয়ার প্রতীকে এই গল্পে আবু ইসহাক এক অসামান্য কুশলতায় শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজের শোষণের চিত্রটি এঁকেছেন। গল্পটিতে পাটচাষের বিভিন্ন পর্যায়ের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা আছে, সেটা একমাত্র একজন অভিজ্ঞ কৃষকের পক্ষেই দেয়া সম্ভব। আবু ইসহাক কত গভীরভাবে ওই জীবনকে চিনতেন, এই একটি গল্পেই তার সাক্ষ্য রয়েছে।

আবু রুশদ আমাদের প্রথম গল্পকার যিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে বিষয়বস্তু করেছিলেন। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম দুটো গল্পগ্রন্থ *রাজধানীতে ঝড়* ও *প্রথম যৌবন*-এর গল্পগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পগুলোর পাত্রপাত্রীরা বাঙালি মুসলমান এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত। এইসব গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলোর প্রায় সবাই মোটামুটি উচ্চশিক্ষিত, কোলকাতাবাসী, চাকরিজীবী, স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আধুনিক তরুণ। শুধু তাই নয় নারীচরিত্রেরাও শিক্ষিত, স্মার্ট, আধুনিক, আত্মসচেতন, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা তরুণী। নারী-পুরুষের সম্পর্কও সহজ, মুক্ত। যে সময়ে এসব গল্প রচিত হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই মুসলমান মধ্যবিত্তের গড়পড়তা চেহারা এমন ছিল না, তবে এসব চরিত্রের মধ্যে লেখকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে। তিনি হয়তো মুসলমান নাগরিক মধ্যবিত্তকে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর পরিণত বয়সের লেখা গল্পগুলোতে এসবের দেখা মেলে না, বরং অনেক বেশি শিল্পিত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পগুলো। *পিথাগোরাস, রদবদল, খালাস, বেড়া, বিকল্প বেহেস্ত, পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস, দাহন, শাড়ী বাড়ী গাড়ী* কিংবা *ছিনতাই* প্রভৃতি গল্প তাঁর উজ্জ্বল শিল্পকুশলতার নিদর্শন হয়ে আছে।

এই সময়ের আরেকটি সফল গল্পের কথা পাঠকদের মনে পড়বে— শাহেদ আলীর *জিবরাইলের ডানা*। এই একটি গল্পের জন্যই শাহেদ আলীর নামটি বারবার উচ্চারিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, গল্পটি অত্যন্ত উঁচুমানের, তবে এই গল্পটির আগে-পরে আরো বেশ কিছু গল্প লিখলেও তেমন সফল গল্প আর নেই তাঁর। শওকত ওসমানও এই সময়েরই লেখক, প্রাথমিক পর্বের সাহিত্যচর্চায় তিনিও পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর *জননী* উপন্যাসটিও '৪০ দশকে রচিত ও প্রকাশিত। *ক্রীতদাসের হাসি* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তবে তাঁর শিল্পসফল গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বয়সের দিক থেকে উপরোক্তদের চেয়ে একটু অগ্রজ আবু জাফর শামসুদ্দিনও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্বন্ধে, জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর উদার-অসাম্প্রদায়িক-স্বচ্ছ-মুক্ত-প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর প্রবন্ধের মতো গল্পেও রেখেছেন তিনি। *রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা* তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। আরেক অগ্রজ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর গল্পে নিয়ে এসেছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-কৌতুক। *হুযুর কেবলা, নায়েবে নবী* ইত্যাদি গল্পে তিনি যেমন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি *ফুড কনফারেন্স, লঙ্গরখানা, রিলিফ ওয়ার্ক, জনসেবা য়ুনিভার্সিটি* ইত্যাদি গল্পে রাজনীতির নামে ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ওই সময়ে একমাত্র তিনিই এই ধারায় চমৎকার সাফল্য দেখাতে পেরেছিলেন। এই সময়ের আরো দুয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পের কথা বলা যায়— ফজলুল হকের *মাছধরা*, সরদার জয়েনউদ্দিনের *নয়ান ঢুলি, ক্রুশে বিদ্ধ যীশুদের প্রার্থনা*, শামসুদ্দিন আবুল কালামের *পথ জানা নেই* ইত্যাদি। এঁদের সকলে হয়তো প্রতিভাবান গল্পকার নন, তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এঁদের সবারই দু-একটি করে উঁচুমানের গল্প আছে। এবং আমাদের প্রাথমিক পর্বের এই বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে— যাঁরাই গল্প লিখেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই অন্তত একটি-দুটি ভালো গল্প লিখেছেন।

বাংলাদেশের গল্প প্রাথমিক পর্ব পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখল পঞ্চাশের দশকে। সময়টি ছিল নানা দিক থেকেই বিহ্বলতার। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত তখনো শুকোয়নি, রয়েছে দেশবিভাগজনিত আবেগ-বিহ্বলতা ও হাহাকার। দু-বাংলার শেকড়হীন মানুষ— উদ্বাস্তু, অসহায়। নতুন দেশে বসবাসের জন্য যাদের চোখ— স্বপ্নে নয়— বেদনায় ম্লান। যে অদ্ভুত সময়ে পঞ্চাশের লেখকরা লিখতে শুরু করেছিলেন, সহজ ছিল না সময়টিকে সাহিত্যে ধারণ করার! তাঁদের দায়িত্বও ছিল অনেক। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং পাকিস্তান নামক অতি-অদ্ভুত একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় তথাকথিত ইসলামি জাতীয়তাবাদের কবল থেকে নিজস্ব সঠিক পরিচয়টা উদ্ধার ও রক্ষা করার সুকঠিন দায়িত্ব। আর এরকম একটি কঠিন সময়েই এলেন সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ সাবের, মিরজা আবদুল হাই, আহমদ মীর,

আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, সুচরিত চৌধুরী, আল মাহমুদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ, শওকত আলী প্রমুখ কথাশিল্পী।

এটা বললে নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবে না যে, পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিভাবান গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন নানামাত্রিক নতুন, অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি— সৃষ্টি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, গড়ে উঠছে নগর। সৈয়দ হকই প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট-সম্ভাবনা, হতাশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করলেন। তিনি অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি— ছুটে বেড়িয়েছেন জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সন্ধানে, ক্রমাগত নিজেকে ভেঙেচুরে নিজেকেই অতিক্রম করে গেছেন ঈর্ষণীয়ভাবে। যদিও গল্প দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন সৈয়দ হক কিন্তু থেমে থাকেননি সেখানেই। একে একে তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায়— কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে। যেখানেই হাত দিয়েছেন, সফল হয়েছেন তিনি। তাঁর গল্পে চিত্রিত হয় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সমগ্র জীবনচিত্র— একদিকে মানুষের প্রেম, কাম, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক চেতনা, তার ভালোবাসা, মমতা ও মহত্ত্ব। বহু ধরনের গল্প লিখেছেন তিনি, বিষয় আর প্রকরণের বৈচিত্র্যে ভরা এসব গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস, তার বিপ্লব-বিদ্রোহ ও বেঁচে থাকার যুদ্ধ। *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান, ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে, জমিরউদ্দিনের মৃত্যুবিবরণ, আরো একজন* প্রভৃতি এই ধরনের গল্প। তাঁর অনেকগুলো গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক মানুষ ও তাদের জীবন। নাগরিক মানুষ যেন আর স্বাভাবিক নেই। যে নিষ্পাপ সরলতা-সহজতা নিয়ে মানুষের জন্ম হয়, নগরের সংস্পর্শে তা ক্ষয়ে যেতে থাকে। যান্ত্রিকতা, জীবনের দুর্মর জটিলতা, অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা— এসবই দখল করে নেয় মানুষের যাবতীয় শুভ সম্পর্ক, তার বিশ্বাস ও মানবিক অনুভূতি, সর্বোপরি তার সমস্ত আশ্রয়। মানুষ হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। গতানুগতিকতা আর পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত এক আনন্দহীন ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন লাভ করে সে। সৈয়দ হকের এ ধরনের গল্পগুলোতে এসবেরই প্রতীকী চিত্রায়ণ দেখতে পাই। *আনন্দের মৃত্যু, মানুষ, পূর্ণিমায় বেচাকেনা, স্বপ্নের ভেতর বসবাস* প্রভৃতি গল্পে এর প্রমাণ রেখেছেন তিনি। সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য গল্পের মতোই প্রেমের গল্পগুলোও পাঠকের কাছে ভিন্নমাত্রা নিয়ে হাজির হয়। *ফিরে আসে, রুটি ও গোলাপ, গাধা জোৎস্নার পূর্বাপর* প্রভৃতি তাঁর সফল প্রেমের গল্পের উদাহরণ। শুধু বিষয়েই নয় ভাষা, আঙ্গিক, উপস্থাপনা প্রভৃতি নানা দিক থেকেও নিজেকে বারবার বদলে ফেলেছেন তিনি। ধীরে-ধীরে তৈরি করেছেন নিজস্ব লেখার একটি ভঙ্গি— কী ভাষায়, কী প্রকরণে— তাঁর লেখাটি যে সৈয়দ হকেরই লেখা, সেটি চিহ্নিত করতে পাঠককে কোনোরকম কষ্টই করতে হয় না। তাঁর গল্পগুলোতে রচনাকাল দেয়া নেই কিন্তু গল্প

থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সময়কে নির্ণয় করা সম্ভব এবং পাঠক লক্ষ না করে পারেন না যে, তাঁর প্রথমদিককার গল্পগুলোর চেয়ে সাম্প্রতিককালের গল্পগুলোর ভাষা ও আঙ্গিক কী অসাধারণ কুশলতায় বদলে গেছে। *ফিরে আসে* বা *রুটি ও গোলাপ* গল্পের যে ভাষা ও উপস্থাপনা *গাধা জ্যোৎস্নার পূর্বাপর* গল্পের ভাষা ও উপস্থাপনা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যদিকে প্রথমদিকের গল্পগুলোতে তিনি আখ্যান-বর্ণনার দিকে যতটা মনোযোগী ছিলেন, পরবর্তীকালে সেটিও পাল্টে ফেলেছেন। বিশেষ করে আঙ্গিকে এমন এক পরিবর্তন এনেছেন যে, মনে হয়, লেখক কেবল গল্পটিই বলছেন না, বরং পাঠকদের সঙ্গেও কথা বলছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন, আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলার জন্য পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করছেন, যেন পাঠক নিজে কেবল শ্রোতা দর্শকের অবস্থানে না থেকে নিজেও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ধারার গল্পগুলোতে তাঁর এই কৌশল বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এসব গল্পকে অবশ্য তিনি নিজে শুধুমাত্র 'গল্প' না বলে 'গল্পপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এগুলো পাঠ করে একটি 'গল্প' পাঠেরই আনন্দ হয়। গল্পকে তিনি স্রেফ ঘটনা-বর্ণনার দায় থেকে মুক্ত রেখেছেন বটে, কিন্তু 'গল্পহীনতা'র দায়ও নেননি, আবার একটি মেসেজ দিতে গিয়ে সেটিকে শ্লোগানসর্বস্বও করে তোলেননি— শিল্পমানের ব্যাপারে এই আপোসহীন অবস্থান তাঁর গল্পকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। এবং এই সবকিছু এবং আরো অনেককিছু নিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের প্রধান লেখকদের একজন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর লেখালেখির শুরুর দিকে ছিলেন শ্রেণি-সচেতন, সমাজবাদী লেখক। বাংলাদেশে আজাদই এই ধারার পথিকৃৎ। উপরিকাঠামোর চেয়ে সমাজের অন্তর্কাঠামো চিত্রায়ণে তাঁর ঝোঁক স্পষ্ট। তবে 'শ্রেণি-সচেতন' লেখক হিসেবে খ্যাতি পেলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসে তথাকথিত বিপ্লবী উপাদান নেই, বরং অতলপ্রবাহী এক রোমান্টিকতা তাঁর রচনার ছত্রে-ছত্রে ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা তাঁকে খ্যাতিমান করে তুলেছিল। তাঁর সফল গল্পের (এবং উপন্যাসেরও) সংখ্যা খুব বেশি নয়। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, আর *বৃষ্টি* গল্পটি বাংলা গল্পের ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত মাইলফলক হয়ে আছে। *ছাতা, কমলালেবু* প্রভৃতিও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

আবু বকর সিদ্দিক এবং শওকত আলীর গল্পে প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষ পরম মমতায় চিত্রিত হয়েছে। দুজনের গল্পেই শ্রেণিসচেতনতা তীব্রভাবে প্রকাশিত, শওকত আলীর গল্পে আরেকধাপ এগিয়ে সেটি শ্রেণিসংগ্রামে গিয়ে পৌছায়— মানুষের পরাজয়ের কথা জেনেও পরাজয় নয় বরং তার ক্রোধ, ক্ষোভ ও সংগ্রামকেই বড় করে দেখেন ও দেখান। কখনো-কখনো এই সংগ্রাম আরোপিত বলেও মনে হয়। গল্প-উপন্যাসে জোতদারের আড়তে আগুন লাগিয়ে দেয়া যায় বটে, কেউ তাতে আপত্তি করবে না— কিন্তু বাস্তব খুব নির্মম, সেখানে নিপীড়িতরা নিপীড়িতই থাকে, লেখকের কলমে পুবের আকাশে লাল সূর্য উঠলেও তাদের জীবন জুড়ে থাকে প্রগাঢ়

অন্ধকার। শওকত আলীর গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষ। বিশেষ করে আদিবাসী (সাঁওতাল) জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন-আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার-বিশ্বাস প্রভৃতি কুশলতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যৌনতার খোলামেলা বর্ণনা। *শুন হে লখিন্দর, কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ, লেলিহান সাধ* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

জহির রায়হান গল্পকার হিসেবে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বিশেষ করে তাঁর গল্প বলার কৌশলটি এখনো পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর গল্প যেন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। একেকটি শব্দ দিয়েই একেকটি চিত্র নির্মাণ করেন তিনি— এই একটি শব্দেই একটি বাক্য, একটি সম্পূর্ণ অনুভূতি, একটি বর্ণিল দৃশ্য। তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের সাহিত্যকে কিছু অভিনব গল্পের যোগান থেকে বঞ্চিত করেছে। শহীদুল্লাহ কায়সার উপন্যাসে যতটা স্বচ্ছন্দ, গল্পে তা নন। আল মাহমুদ প্রচুর লিখেছেন, যদিও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পের সংখ্যা সামান্য। তবে একটি কারণে তিনি একটু বিশেষভাবেই দৃষ্টি কেড়েছেন, সেটি তাঁর গল্পের যৌনচেতনা। তাঁর বিখ্যাত গল্প *পানকৌড়ির রক্ত, জলবেশ্যা* বা *কালো নৌকা* পড়লে মনে হয়— এসব গল্পের চরিত্রগুলোর জীবনে যৌনতা ছাড়া আর কিছু নেই। এ রকম প্রখর যৌনচেতনা যে-কোনো কথাশিল্পীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, তিনি সেটি করতে সক্ষম হয়েছেন। আরেকজন গল্পশিল্পীর কথা না বললে পঞ্চাশের গল্পচর্চার বিষয়টি সম্পূর্ণ হয় না। তিনি— সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। যদিও তাঁর পরিচিতি কবি হিসেবেই এবং দীর্ঘকাল তিনি গল্পচর্চা থেকে বিরত ছিলেন, তবু তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ *বুধবার রাতে* আজও পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। তাঁর রাজনীতি-সচেতনতা সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ 'পশুর মতো তীক্ষ্ণ' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। এত তীক্ষ্ণ সমাজ ও রাজনীতি-সচেতনতা, প্রতীকের এমন অসামান্য কুশলী ব্যবহার তাঁর আগে আর কোনো গল্পকারের মধ্যে দেখা যায়নি।

পঞ্চাশের অধিকাংশ গল্পকারই নানা কারণে তাদের গল্পচর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। এর একটি প্রধান কারণ হয়তো এই যে, তাঁরা শুধুমাত্র গল্পকারই ছিলেন না, আরো বহু কাজ তাঁদেরকে করতে হয়েছে। নতুন দেশে পাকিস্তানি প্রভুদের আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিচিন্তার বিপরীতে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সবটুকু শক্তি নিয়ে। শুধুমাত্র কথাসাহিত্য রচনা করে সেই কাজ হয়তো করা সম্ভব ছিল না। ফলে দেখা যায়, এই সময়ের অনেক লেখকেরই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। সরদার ফজলুল করিম, শহীদ সাবের, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ সহ আরো অনেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এঁদের সবাই অবশ্য কথাশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু যে শাখায়ই কাজ করুন না কেন, সাহিত্যই যে তাঁদের কর্মকাণ্ডের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না— এই রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা তা প্রমাণ করে দেয়। জহির রায়হান কথাসাহিত্য চর্চায় বিরতি

দিয়ে চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকেছেন, নির্মাণ করেছেন 'জীবন থেকে নেয়া'র মতো অসামান্য চলচ্চিত্র। আইয়ুব শাহীর সামরিক শাসনামলে এইরকম রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত প্রতীকী চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর মূল প্রবণতার পরিচয় দেয়। শহীদ সাবের জেলবন্দি হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, মুনীর, সরদার বা আজাদও জেলবন্দি ছিলেন অনেকদিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ সাবের, শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদ হয়েছেন, জহির রায়হানও সদ্য-স্বাধীন দেশে রহস্যময়ভাবে নিহত হয়েছেন। মিরজা আবদুল হাই মাত্র দুটো গল্পগ্রন্থেই গল্পচর্চার সমাপ্তি টেনেছেন, টিপু সুলতানও মাত্র একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পর আর গল্প লেখেননি, হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা, মুক্তিযুদ্ধের দলিল সম্পাদনায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রবাসজীবন বেছে নিয়েছেন এবং কলামলেখকে পরিণত হয়েছেন— এই সব নানাবিধ কারণে পঞ্চাশের গল্প তেমন এগোয়নি।

তবে একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এই সময়ের লেখকরা অনেকটা নীরবেই একটি যুদ্ধ করে গেছেন— রাষ্ট্রের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল উপেক্ষা করে নিজ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার, নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার এবং এর একটি মানসম্মত রূপদান করার যুদ্ধ। আমরা, উত্তরপ্রজন্ম, তাঁদের এই নীরব অথচ কার্যকরী যুদ্ধের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য বোধ করব না।

পুনশ্চ : সংকলন সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বললেই নয়! পৃথিবীর কোনো সংকলনই সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ সংকলন নয়, বিতর্কাতীতও নয়। এই সংকলনটিকেও পূর্ণাঙ্গ বলে দাবি করা যাবে না। এমনকি এই ভূমিকায় আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি বা যাদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের সবার গল্প নেয়াও সম্ভব হয়নি। সম্পাদকের নানারকম সীমাবদ্ধতা থাকে, তার মধ্যে প্রধানটি হল— গ্রন্থের কলেবরের সীমাবদ্ধতা। পাঠকরা নিশ্চয়ই বিষয়টি অনুধাবন করবেন!

ভূমিকায় লেখকদের নিয়ে একটা দশক-ওয়ারি আলোচনা হাজির করেছি, সেটি আলোচনার সুবিধার্থে। যে দশকে এসে একজন লেখকের বিকাশ ঘটেছে বা লেখক হিসেবে তিনি বা তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, সেটিকেই তাঁর বা তাঁদের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে সংকলনে সূচিবদ্ধ করার সময় তাদের জন্মসালকে সামনে রেখে খণ্ড-পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১৯৪০ সালের আগ পর্যন্ত যেসব লেখক জন্ম নিয়েছেন তাঁরা সূচিবদ্ধ হয়েছেন প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে সূচিবদ্ধ হয়েছেন ১৯৪০-১৯৫৯ সময়কালে জন্ম-নেয়া লেখকরা।

আহমাদ মোস্তফা কামাল

ডিসেম্বর ২০০৯

সূচি

আবুল মনসুর আহমদ	হুজুর কেবলা	১৯
আবু জাফর শামসুদ্দীন	রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা	৩২
শওকত ওসমান	ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী	৩৯
আবু রুশদ	ছিনতাই	৪৯
সোমেন চন্দ	ইঁদুর	৫৫
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	একটি তুলসীগাছের কাহিনী	৬৯
সরদার জয়েনউদ্‌দীন	নয়ান ঢুলি	৭৭
শাহেদ আলী	জিবরাইলের ডানা	৮৪
আবু ইসহাক	বনমানুষ	৯৭
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	পথ জানা নাই	১০৪
আবদুল গাফফার চৌধুরী	সম্রাটের ছবি	১১১
আলাউদ্দিন আল আজাদ	বৃষ্টি	১১৯
জহির রায়হান	সময়ের প্রয়োজনে	১৩১
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ	বুধবার রাতে	১৪১
সৈয়দ শামসুল হক	নেপেন দারোগার দায়ভার	১৪৬
আল মাহমুদ	জলবেশ্যা	১৫৭
শওকত আলী	কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ	১৭৪
হাসান আজিজুল হক	আত্মজা ও একটি করবী গাছ	১৯০
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	পুনরুদ্ধার	১৯৭
রিজিয়া রহমান	ইজ্জত	২০২

আবুল মনসুর আহমদ

হুজুর কেবলা

এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্প্‌শুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশ্‌মা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর স্ট্রপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রিম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া-চুল-কাটা মাথায় গোল নেকড়ার মতো টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশ্‌তা, ওহি, হজরতের মেরাজ লইয়া সর্বদা হাসি-ঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোমতের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামাজ পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গাল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজ হাতে একছড়া তসবিহ তৈরি করল। সেই তসবিহ'র উপর দিয়া অষ্টপ্রহর অঙ্গুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এমদাদ টলিল না। সে নিজের নশ্বর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল : হে দেহ! তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে! কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তসবিহ চালাইতে লাগিল।

দুই

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এমদাদ একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে তেমন নিষ্ঠা আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জতের নামাজ তরক্ করিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

অগত্যা সে নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনোমতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকাল-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা মওলবি সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারত আক্রমণের কতদিন বাকি আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয় লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও জর্দা এবং সময়-সময় নাশ্তা খাইতেন।

ইহাদের একজনের সুফি বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পির সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এলহু' 'এলহু' করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এস্তেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সুফি সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

সুফি সাহেব দাড়িতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজি-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন : হকিকতান যদি আপনি রুহের তরক্কি হাসেল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা; মাস্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এমদাদ অপ্রতিভভাবে বলিল : আমি তো কারো মুরিদ হই নাই।

সুফি সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন : হ-ম্, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পির না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসেল করিতে পারে? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : [এইখানে সুফি সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবি আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে মতলব বয়ান করিয়া অবশেষে বাংলায় বলিলেন] : জয্বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজ্যুব পিরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনি ও রুহের তরক্কি হাসেল করিতে পারে না।

হাদিসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল।

সে ধরা-গলায় বলিল : কী হইবে আমার তাহা হইলে সুফি সাহেব?

সুফি সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন : ঘাবড়াইবার কোনো কারণ নাই। কামেল পিরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এমদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফি সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : কোথায় পাইব কামেল পির? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফি সাহেব সুর করিয়া একটি ফারসি বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন : জওহরের তালাসে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কেহ জওহরের খবর দিতে পারে? হাজার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফি সাহেবের হাত তখনও এমদাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তাহা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল : আমাকে লইয়া যাইবেন না সেখানে?

সুফি সাহেব বলিলেন : কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (আরবি ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আসিতে চায়, তাহার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফি সাহেবের সঙ্গে পির-জিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন

এমদাদ দেখিল : পির সাহেবের একতলা পাকা বাড়ি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব ক'খানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফি সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল : ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি-বিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ লোক তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন।

এমদাদ বুঝিল : ইনিই পির সাহেব।

'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া সুফি সাহেব সোজা পির সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পির সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফি সাহেব সেই পায়ে হাত ঘষিয়া নিজের চোখে-মুখে ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পির সাহেব তাঁর হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফি সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছুদূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পির সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন : কিরে বেটা, খবর কী? তুই কি এরই মধ্যে দায়েরায়ে হকিকতে মহব্বত ও জয্বায়েযাতি-বনাম হোব্বে এশ্‌ক হাসেল করিয়া ফেললি নাকি?

পির সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফি সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন; হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন!

পির সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন : তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসিলে কেন? কই তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে।

এই বলিয়া পির সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিট কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন : সে এই ঘরেই হাজির আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পির সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়া পির সাহেবের মুখ হইতে একপ্রকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফি সাহেব এমদাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফি সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদমবুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পির সাহেব "বস বেটা, তোর ভালো হইবে। আহা, বড় গরিব!" বলিয়া আলবোলার নলে দম কষিলেন।

সুফি সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : হযরত এর অবস্থা তত গরিব নয়। বেশ ভালো তালুক সম্পত্তি—

পির সাহেব নলে খুব লম্বা টান কষিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন : বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলত দিয়া ধনী-গরিব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরিব কথায় দুনিয়াবি গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এন্‌সানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন করো। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটানো কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দিই না। তোদের অনেকেই এখন যেকেরের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। যেকরে জলি ও যেকরে খফি— এই দুই দরজার যেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পৌঁছিতে হয়। ফেকের হইতে যহুর এবং যহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফজলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি— অনেক—

— বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন : কুদরতে-ইয়্দানি, কুদরতে-ইয়্দানি। মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন : আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?

জনৈক মুরিদ বলিলেন : হযরত, বৎসর কোথায়? এই-না কয়েক ঘণ্টা হইল।

পির সাহেব হাসিলেন। বলিলেন : অনেক দেরি— অনেক দেরি। আহা বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন : হুজুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পির সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন : অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর্‌, চেষ্টা কর্‌।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন : না কেবলা, আমাদিগকে বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?

পির সাহেব বলিলেন : ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন। এই যে সাদুল্লাহ (সুফি সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কী করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেসবতে বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আল্‌গরয ইহাও খোদার এক শানে-আযিম। সাদুল্লাহ যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ সাদুল্লাহর রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাদুল্লাহর রুহ আর একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহু আযিমুশ্‌শান।

পির সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

মুরিদ হুক্কার মাথা হইতে চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পির সাহেব বলিলেন : তোমরা আমার নিজের নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোমরা সে-সমস্ত বাতেনি কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লি তাতে ঢালিয়া দিলে তাতে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এলমে-লাদুন্নি হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মাওফুযে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে-হকিকতে-লাতা আইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-নাযাবির ফয়েজ তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে-ইয়্দানি দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জেসমের মধ্যে আমার রুহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবলা— তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ— লওহে-মাহফুজ হইতে আমার রুহ আনিয়া আমার জেসমের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহ্‌ করেন। কাজেই দেখিতেছিস, কাবেলিয়ত হাসেল না করিয়া কোনো কাজে হাত দিতে নাই।

খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি? শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলি। কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরো তাজ্জব হইয়া যাইবি। সে জন্যই সে কথা-বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তোরা শিখবি কোথা হইতে? তাই সে কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাজার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেসমে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সাত হাজার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেস্‌মার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফ এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পির সাহেব নল হাতে লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন।

সভা নিস্তব্ধ রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এমদাদ পির সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইহার কাছে মুরিদ হইবে।

চার

পির সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন : বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারবে না, তাসাউওয়াফ বড় কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এমদাদ তাওয়াজ্জোহ লইল।

পির সাহেব নিজের লতিফায় যেকের জারি করিয়া সেই যেকের এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

সে দিবানিশি দুই চোখ বুজিয়া পির সাহেবের নির্দেশমতো 'এলহু এলহু' করিতে লাগিল।

পির সাহেব বলিয়াছিলেন : খেলওয়াৎ-দর-অঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিলে তার কলবে যাতে-আহাদিগয়াতের ফয়েজ হাসেল হইবে এবং তার রুহ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে।

কিন্তু এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পির সাহেবের মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি ও তাঁর রুপা-বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিয়া লাগিল।

ফলে তার কলবে যাতে-আহাদিগয়তের ফয়েজ হাসেল হইয়া তার রুহকে ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁপাইবার পরিবর্তে ফুফু-আম্মার স্মৃতি বাড়ি যাইবার জন্য তার মনকে উচাটন করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল।

অনাহারে অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দু'টি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল, এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে তার রুহ বস্তুতই জেস্‌ম হইতে আযাদ হইয়া আলমে-আমরে চলিয়া যাইবে।

সে স্থির করিল : পির সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া সে একদিন বিদায় হইবে।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না।

একটা নূতন ঘটনায় সে বিদায়ের কথাটা আপাতত চাপিয়া গেল! দূরবর্তী এক স্থানে মুরিদগণ পির সাহেবকে দাওয়াত করিল।

প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগি, সাতসের অম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ লইয়া পির সাহেব 'মুরিদানে' রওয়ানা হইলেন।

পির সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংরেজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে লওয়া হইল। নদীর সৌন্দর্য, নদীপারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এমদাদের কাছে বেশ লাগিল।

পির সাহেব গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুরিদগণের নিকট যে অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহা দেখিলে অনেক রাজা-বাদশাহ রাজত্ব ছাড়িয়া মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসিতেন।

পির সাহেব গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা করিলেন।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট ভোজ চলিতে লাগিল।

পির সাহেবের একটু দূরে বসিয়া গুরুভোজন করিয়া এমদাদ এত দিনের কৃচ্ছ্র সাধনার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। ইহাতে প্রথম-প্রথম তার একটু পেটে পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই সে সামলাইয়া উঠিল এবং তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

পির সাহেবের ভাত ভাঙিবার কসরত দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে এমদাদের হয় নাই। এইবার সে ভাগ্যলাভ করিয়া এমদাদ বুঝিল : পির সাহেবের রুহানীশক্তি যত বেশিই থাকুক-না কেন, তাঁর হজমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিশ বসিত।

রাতে এশার নামাজের পর অন্দরমহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হইত। কারণ অন্য সময় মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকথা বুঝাইতে একটু দেরি হইত। কারণ মেয়েলোকদের বুদ্ধিসুদ্ধি বড় কম— তারা নাকেল-আকেল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে পির সাহেবের ধারণা ছিল অন্যরকম। মেয়ে-মজলিশে ওয়াজ করিবার সময় তিনি ইহারই দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন।

তিনি অনেক সময় বলিতেন : তাসাউওয়াফের বাতেনি কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভালো করিয়া তওয়াজ্জোহ্ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এশার নামাজের পর দাড়ি, চিরুনি ও কাপড়ে আতর লাগানো সুন্নত এবং পির সাহেব সুন্নতের একজন বড় মো'তেকাদ ছিলেন।

ওয়াজ করিবার সময় পির সাহেবের প্রায়ই জযবা আসিত।

সে জযবাকে মুরিদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত।

এই ফানাফিল্লাহর সময় পির সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। এই সময় পির সাহেবের রুহ আলমে-খালক হইতে আলমে-আমরে পৌঁছিয়া রুহে ইয়াদানির সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে ইয়াদানি তাঁর চোখের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু সে নূরের জলওয়া পির সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরূপ চিৎকার করিতেন।

তাই জযবার সময় একখণ্ড কালো মখমল দিয়া পির সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।

এইরূপ জযবা পির সাহেবের প্রায়ই হইত।

— এবং মেয়েদের সামনে ওয়াজ করিবার সময়েই একটু বেশি হইত।

এইসব ব্যাপারে এমদাদের মনে একটু খটকার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে চেষ্টায় সফল হইবার আগেই কিন্তু ও-পথে বাধা পড়িল। প্রধান খলিফা সুফি বদরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পির সাহেবকে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া এমদাদের মনের খটকা বাড়িয়া গেল। তার মনে পির সাহেবের প্রতি একটু দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় পির সাহেব অত্যন্ত অকস্মাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন : তিনি আর দু'এক দিনের বেশি সে অঞ্চলে তশরিফ রাখিবেন না।

এই গভীর শোকসংবাদে শাগরেদ-মুরিদগণের সকলেই নিতান্ত গম্‌গিন হইয়া পড়িল।

জনৈক শাগরেদ সুফি সাহেবের ইশারায় বলিলেন : হুজুর কেবলা, আপনি একদিন বলিয়াছিলেন; এবার এ-অঞ্চলের মুসলমানগণকে কেরামতে-নেসবতে বায়নান্নাস দেখাইবেন? তা না দেখাইয়াই কি হুজুর এখান হইতে তশরিফ লইয়া যাইবেন? এখানকার মুরিদগণের অনেকেই বলিতেছেন : হুজুর মাঝে মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মি মুরিদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছেন। মাওলানা লকবধারী ওই ভণ্ডটা ও-পাড়ার অনেক মুরিদকে ভাগাইয়া নিতেছে; সে নাকি বৎসর-বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যায়।

পির সাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন : (আরবি ও উর্দু) আল্লাহই কেরামতের একমাত্র মালিক, মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়? ও-সব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না। তবে হ্যাঁ, মোরাকেবায়ে-নেসবতে বায়নান্নাস-এর তরকিব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার আর সময় কোথায়?

সমস্ত সাগরেদ ও মুরিদগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন : না হুজুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না দেখিয়া ছাড়িব না।

অগত্যা পির সাহেব রাজি হইলেন।

স্থির হইল, সেই রাতেই মোরাকেবা বসিবে।

সারাদিন আয়োজন চলিল।

রাত্রে মৌলুদের মহফেল বসিল। হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক অনেক মোওয়াজেযাত বর্ণিত হইল।

মৌলুদ শেষে খাওয়া-দাওয়া হইল এবং তৎপর মোরাকেবার বৈঠক বসিল।

পাঁচ

পির সাহেব বলিলেন : আজ তোমাদের আমি যে মোরাকেবার তরকিব দেখাইব, ইহা দ্বারা যে-কোনো লোকের রুহের সঙ্গে কথা বলিতে পারি। আমি যদি নিজে মোরাকেবায় বসি, তবে সেই রুহ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে একজন মোরাকেবায় বস, আমি তার রুহের দিকে তোমরা যার কথা বলিবে তার রুহে তাওয়াজ্জোহ দেখাইয়া তার রুহের ফয়েজ হাসিল করিব। তৎপর তোমরা যে-কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে কে মোরাকেবায় বসিবে?

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

কেহই কোনো কথা বলিল না, মোরাকেবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল : আমি বসিব।

পির সাহেব একটু হাসিলেন।

বলিলেন : বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও যেকরে খফা-আম করিস নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?

— বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল। সে বসিয়া পড়িল।

পির সাহেব আবার বলিলেন : কি, আমার মুরিদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানি তরক্কি হাসেল হয় নাই, যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?

বলিয়া তিনি শাগরেদদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

প্রধান খলিফা সুফি সাহেব উঠিয়া বলিলেন : হুজুর কেবলা কি তবে বান্দাকে হুকুম করিতেছেন? আমি তো আপনার আদেশে কতবার মোরাকেবায়-নেসবতে-বায়নান্নাসে বসিয়াছি। কোনো নূতন লোককে বসাইলে হইত না?

সুফি সাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরিদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল।

তারা সকলে সমস্বরে বলিল : আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।

অগত্যা পির সাহেবের আদেশে সুফি সাহেব মোরাকেবায় বসিলেন।

পির সাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : কার রুহের ফয়েজ হাসিল করিব?

মুরিদগণের মুখের কথা যোগাইবার আগেই জনৈক সাগরেদ বলিলেন : এইমাত্র মৌলুদ-শরিফ হইয়াছে; হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোয়াজেযা বয়ান হইয়াছে। তাঁরই রুহ আনা হোক।

সকলেই খুশি হইয়া বলিলেন : তাই হউক, তাই হউক।

তাই হইল।

সুফি সাহেব আতর-সিক্ত মুখমণ্ডলের গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। মেশক যাফরান ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

পির সাহেব তাঁর প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের রুহ-মোবারক নাযেল করিবার জন্যে ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন।

শাগরেদরা চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত-কণ্ঠে সুর করিয়া দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পির সাহেব কখনও জোরে কখনও-বা আস্তে নানা প্রকার দোওয়া কালাম পড়িয়া সুফি সাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর শাগরেদগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পির সাহেব বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে সুফি সাহেবের বুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুফি সাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তাঁর বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পির সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুফি সাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফি সাহেব ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত-পা ছুড়িতে ছুড়িতে মূর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পির সাহেব মুরিদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন : বদর বাবাজির একটু তগ্‌লিফ হইল! কী করিব? পরের রুহের উপর অন্য রুহের ফয়েজ হাসেল আসানির সঙ্গে করা বেল্‌কুল না-মোমকেন। যা হউক, হযরতের রুহ তশরিফ আনিয়াছেন। তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।

— বলিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া সমস্বরে পড়িতে লাগিল : ইয়া নবি সালাম আলায় কা ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরুদ শেষ হইলে অভ্যাসমতো অনেকেই বসিয়া পড়িল।

পির সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন : হযরতের রুহে পাক এখনও এই মজলিসে হাজির আছেন, তোমরা কেহ বসিতে পারিবে না। কার কী সওয়াল করিবার আছে করিতে পার।

এমদাদ একটা বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

— মাথায় এক ফন্দি আঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল : কেবলা, আমি কোনো সওয়াল করিতে পারি?

পির সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন : যাও না, জিজ্ঞাসা করো না গিয়া!

— বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন : বাবা সকলের কথাই যদি রুহে পাকের কাছে পৌঁছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

এমদাদ তথাপি সুফি সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ-সালাম জানিবেন।

হযরতের রুহ কোনো জবাব দিল না।

পির সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন : অধিকক্ষণ রুহে পাকে রাখা বে-আদবি হইবে। তোমাদের যদি কাহারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে-কোনো সওয়াল করিতে পার।

— বলিতেই পির সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা বেলায়েতপুরি সাহেব অগ্রসর হইয়া 'আসসালামো আলায়কুম ইয়া রসূলুল্লাহ' বলিয়া সুফি সাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল, সুফি-সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল : ওয়া আলায়কুমস্ সালাম, ইয়া উম্মতি।

মওলানা সাহেব বলিলেন : হে রেসালাত-পনা, সৈয়দুল কাওনায়েন, আমি আপনার খেদমতে একটা আরজ করিতে চাই।

আওয়াজ হইল : শিগগির বল, আমার আর দেরি করিবার উপায় নাই।

মওলানা : আমাদের পির দস্তগির কেবলা সাহেব নূরে-ইয-দানির জওয়াশা সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কী? তাঁর আমলে কি কোনো গলৎ আছে?

কঠোর সুরে উত্তর হইল : হাঁ আছে।

পির সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদো কাঁদো সুরে নিজেই বলিলেন : কী গলৎ আছে, ইয়া রসূলুল্লাহ? আমার পঞ্চাশ বৎসরের রঞ্জ-কশি কি তবে সব পণ্ড হইয়াছে?

— বলিয়া পির সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফি সহেবের অচেতন দেহের মধ্যে হইতে আওয়াজ হইল : হে আমার পিয়ারা উম্মৎ, ঘাবড়াইও না। তোমার উপর আল্লাহর রহমৎ হইবে। তুমি মারফৎ খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফৎ হয়?

পির সাহেব হাত কচলাইয়া বলিলেন : হুজুর, আমি কবে শরিয়ত অবহেলা করিলাম?

উত্তর হইল : অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ তাদের এক বিবি হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানি ফয়েজ হাসিল করিতে

চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই! আমি চার বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ? চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চারদিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চার চিজ দিয়া খোদাতা'লা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কেতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এইভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতা'লা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে-আমরে-নূরে-ইযদানিতে ফানা হইতে হইবে, দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।

পির সাহেব সকলকে শুনাইয়া হযরতের রুহের দিকে চাহিয়া বলিলেন : এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব?

— তুমি বৃদ্ধ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।

পির সাহেব মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন : না রেসালাত-পনা আমি আর বিবাহ করিব না।

— না করো, ভালোই। কিন্তু তোমার রুহানি কামালিয়ত হাসেল হইবে না, তুমি নূরে-ইযদানির জলওয়া বরদাশত করিতে পারিবে না। তোমার মুরিদানের কেহই নফসানিয়তের হাত এড়াইতে পারিবে না।

পির সাহেব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন : আমি নিজের জন্য ভাবি না ইয়া রসূলুল্লাহ; কিন্তু যখন আমার মুরিদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাজি হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়িকে বিবাহ করিব।

— তুমি তওবা আসতাগফার পড়। তুমি খোদার কলম রদ করিতে চাও? তোমার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে। বেহেশতে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।

— সে কে, ইয়া রসূলুল্লাহ?

— এই বাড়ির তোমার মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।

— ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি মুরিদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব? সে যে আমার বেটার বউ-এর শামিল।

— ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ করিতে পারিবে না?

— ইয়া রসূলুল্লাহ, সে যে সধবা।

— রজবকে বলো স্ত্রীকে তালাক দিতে। কলিমন তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না। আমি আর থাকিতে পারি না। চলিলাম। অররহমাতুল্লাহ আলায়কুম, ইয়া উম্মতি।

মূর্ছিত সুফিসাহেব একটা বিকট চিৎকার করিলেন। পির সাহেবের অপর-অপর শাগরেদরা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মুরিদগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পির সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন: চাই না আমি রুহানি কামালিয়ত। আমি মুরিদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।

গ্রাম্য মুরিদগণ আখেরাতের ভয়ে পির সাহেবের অনেক হাত-পায়ে ধরিল। পির সাহেব অটল।

এই সময় প্রধান খলিফা সুফি সাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন : এই নিকাহ না করিলে কেবল পির সাহেবের একারই রুহানি লোকসান হইবে না, তাঁর মুরিদগণের সকলের রুহের উপরও বহুত মুসিবত পড়িবে।

তখন পির সাহেব অগত্যা নিজের রেজামন্দি জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন : ছোবহান আল্লাহ! এ সবই কুদরতে এলাহি! তাঁরই শানে-আজিম! আল্লাহ পাক নিজেই কোরান-মজিদ ফরমাইয়াছেন : (আরবি ও উর্দু)...।

বাপ-চাচা পাড়া-পড়শির অনুরোধে, আদেশে, তিরস্কারে ও অবশেষে উৎপীড়নে তিষ্টিতে না পারিয়া রজব তার এক বছর আগে বিয়া-করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিলো এবং কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

কলিমনের ঘন-ঘন মূর্ছার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকার্য সমাধান হইয়া গেল।

এমদাদ স্তম্ভিত হইয়া বর বেশে সজ্জিত পির সাহেবের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার তার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে এক লাফে বরাসনে-উপবিষ্ট পির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি ধরিয়া হেচকা টান মারিয়া বলিল : রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

আর বলিতে পারিল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে মার্ মার্ করিয়া আসিয়া এমদাদকে ধরিয়া ফেলিল এবং চড়-চাপড় মারিতে লাগিল।

এমদাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজে শখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাসা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও।

পির সাহেবের প্রতি এমদাদের বেয়াদবিতে মুরিদরা ইতিপূর্বে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ছিল। এবার তার মস্তিষ্কবিকৃতি সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হইল। মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন : এই পাগলটা আমাদের হুজুর কেবলার অপমান করিতেছে। তোমরা কয়েকজন ইহাকে কান ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আসো।

ভূলুণ্ঠিত পির সাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আসতাগফেরুল্লাহ' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙুল দিয়া চিরুনি করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন : দেখিস বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিজ দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। খোদা যাকে সাফা না দেন, তাকে কে ভালো করিতে পারে? (আরবি ও উর্দু)।

আবু জাফর শামসুদ্দীন
রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা

পশ্চিমটা লাল হয়ে উঠল, যেদিন কৃষ্ণচূড়ার বনে হাঁটছিলাম সেদিনের মতো। কেউ আগুন লাগায়নি তবু প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধ্যে অগ্নিশিখা ছিল। তাই দেখে দূর থেকে ভাবছিলাম, সামনে বুঝি-বা দাবানল। চোখ তুলে চেয়ে দেখি রবি ডুবছে কিন্তু আকাশের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল। আমাদের পথ কি এখনও শেষ হয়নি ঠাকুর?

সত্তরোর্ধ্ব রাজেন্দ্র ঠাকুর মোটা আসামি বেতের লাঠি ভর দিয়ে আগে আগে, পশ্চাতে দোভাঁজ করা পুরনো শাড়িতে বাঁধা গাঁঠরি হাতে সাবিত্রী। পুঁটলিটির মধ্যে উভয়ের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি— বাড়তি বস্ত্র, রন্ধনের তৈজসপত্র, গাড়ু ইত্যাদি। বয়সের ভারে কিঞ্চিৎ কুঁজো সাবিত্রী অগ্রগামীকে অনুসরণ করছিল। ওরা প্রভাতে যাত্রা শুরু করেছে। সাবিত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে পশ্চিম দিগন্তে কিছু মেঘ করেছিল। তাতে সূর্যালোক পড়ে আকাশ অগ্নিবর্ণ হয়েছিল। সাবিত্রী সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এবং অগ্রযাত্রীকে প্রশ্ন করে : পথ কি এখনও শেষ হয়নি ঠাকুর?

না সাবিত্রী, আমাদের আরো আরো অনেক পথ চলতে হবে। রাজেন ঠাকুর উত্তর দেয়।

আর কতদূর?

তুমি কি চৈতার বউ হলে সাবিত্রী?

চৈতার বউ! সেটা কী ঠাকুর?

দেখোনি কোনোদিন?

না তো।

তোমার দেশে বুঝি নেই ও পাখি?

পাখির নাম চৈতার বউ, তাই বলো। কী করে সে?

ফাগুনের দুপুরে আকাশে একা একা ওড়ে এবং ডাকে : আর কত দূর? ও চৈতার বউ, আর কত দূর?

ও বুঝেছি, 'বউ কথা কও' পাখির কথা বলছ?

তোমাদের দেশে ওই বুঝি ওর নাম?

হ্যাঁ, পাখিটা 'বউ কথা কও', 'বউ কথা কও' বলে কি না তাই।

একই কথা সাবিত্রী, 'আর কত দূর' বলাও যা 'বউ কথা কও' বলাও তাই।

কেমন করে, বুঝিয়ে বলো না ঠাকুর।

দূর থেকে প্রিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সে যেন বলছে, এসো, এসো! বিরহী পাখি সে কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে ছুটছে আর শুধোচ্ছে আর কত দূর? আর কত দূর? বউ মান করে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে, পাখি বার বার অনুরোধ করছে, বউ কথা কও। কুহকিনী আশা বেগ প্রদান করছে পাখির পাখায়। তবু সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই জিজ্ঞাসা করছে, আর কত দূর? আর কত দূর প্রিয়ে?

আমিও যে বড্ড ক্লান্ত ঠাকুর। আর পারছি না। ওখানে ওই বিটপীর ছায়ায় একটু বসবে? উঃ! কী গরম! আকাশটা কড়াই, দিনটা চুলো, রবিদেব ইন্ধন। ঝিম মেরে নিঃশব্দে লোহা গলাচ্ছিল, কিন্তু আমরাও লোহা নই ঠাকুর, তার আগেই যে গলে গেলাম। বসো ঠাকুর, বিটপীর ছায়ায় একটু বসো। কারা যেন ঝেড়ে মুছে লেপে সিঁদুর লাগিয়ে গেছে মূলে। কিন্তু নৈবেদ্যের পুষ্প, অনির্দিষ্ট দেবতাকে উৎসর্গীকৃত ভোগের কিছু ভুক্তাবশেষ এখনও পড়ে আছে। আহা কারা না-জানি কী মনস্কামনা নিয়ে এসেছিল এখানে, এই বৃক্ষমূলে! সাবিত্রী কতকটা যেন নিজেকেই নিজে বলতে থাকে।

সংসারী মানুষের হরেক রকমের মনস্কামনা থাকে সাবিত্রী। কী কামনা নিয়ে এসেছিল কে জানে? রাজেন ঠাকুর উদাসভাবে উত্তর দেয়।

ধন মান যশ ক্ষমতা পুত্রসন্তান বিপন্মুক্তি সাফল্য এবং পরিশেষে স্বর্গ, এ ক'টিই তো সংসারী মানুষের কাম্য— তাই-না ঠাকুর? তুমি রকমারি বলছ কেন? বসো লক্ষ্মীটি, একটু বসো, জিরিয়ে নি-ই। সমাগত সন্ধ্যার নির্জনতায় বড্ড ভালো লাগছে স্থানটা। ওই ওই দেখ রাখাল ধেনুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাছুরেরা মায়ের পিছু পিছু নেচে নেচে ছুটছে। প্রকৃতি মধুর সম্ভাষণে বলছে : আর নয়, আর নয়, এবার বিশ্রামের সময় হয়েছে। আমাদের কি এখনও সময় হয়নি ঠাকুর?

পুঁটলিটা বিটপীমূলে রক্ষা করে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে সাবিত্রী— রাজেন ঠাকুরের সম্মতির অপেক্ষা করে না। পরমাত্মীয়ের মতো মনে হয় বটের নিচের ধুলোবালি। অগত্যা রাজেন ঠাকুরও পাশের উঁচু শিকড়টার উপরে দেহের ভার স্থাপন করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বড্ড একা একা লাগছে ঠাকুর— বড্ড নিঃসঙ্গ। সাবিত্রী দীর্ঘ নিশ্বাসের সাথে সহসা মন্তব্য করে। নিঃসারিত শ্বাসের উষ্ণ বায়ু ঠাকুরের গালে এসে ছ্যাঁৎ করে লাগে। ঠাকুর চমকে ওঠে। নিঃসহায় চোখ দুটো পল্লব প্রসারিত করে তাকায়।

নিঃসঙ্গ একা! কী বলছ সাবিত্রী? আমরা দু'জন। দু'জন তো একা হয় না— একা মানে একা, কখনও দু'জন নয়। রাজেন ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করে।

সাবিত্রী প্রবোধ মানে না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করে : দু'জন কি কখনও একা হয় না ঠাকুর? এমনকি একটা জনতাও?

হেঁয়ালি! হেঁয়ালি রাখো প্রিয়ে, কী বলতে চাও খুলে বলো।

দু'জন একা হওয়ার কথাই বলছি। কিছুই কি বোঝ না ঠাকুর? ন্যায়শাস্ত্রে নাকি তোমার অগাধ জ্ঞান!

দু'জন কেমন করে একা হয়, এমনকি একটা জনতাও, ন্যায়শাস্ত্রে তার ব্যাখ্যা নেই সাবিত্রী। তুমিই বরং বলো। ওই দেখ, বকগুলো কেমন ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। কে জানে কোথায় ওদের রাত্রির আশ্রয়স্থল! অনেক অনেক দূরে বোধ করি। দেখ কেমন গতিসামঞ্জস্য রক্ষা করে উড়ছে। ওরা তো একা নয় সাবিত্রী।

হয়তো, হয়তো নয়। কিন্তু পাখির কি হৃদয় আছে ঠাকুর? কিংবা ভাবনা? কিংবা কল্পনা? এমন কল্পনা যা হাজার লোকের মাঝেও মানুষকে একা এবং নিঃসহায় করে? এমনকি হাজার লোকের প্রত্যেকটি লোক নিজেকে বোধ করে একা? পাখির কি সমান্তরাল দুটি চিত্তপ্রবাহ আছে, যার একটি কথা বলায়, অন্যটি হৃদয়ে নানা বিচিত্র এলোমেলো ভাবনার জাল বুনে যায়? মুখ বলে কান শোনে না, কান শোনে তো মুখ বলে না? এমন কি কখনও হয় পাখির জীবনে যে, সে পাশের পাখির সংগীত আদৌ শুনতে পায় না, অন্তঃশিলা ভাবনাস্রোত তার কানকে বধির করে দেয়? হয় কখনো পাখির জীবনে এমন? বলো-না ঠাকুর।

কী সব কথা যে আজ বলছ সাবিত্রী মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। পাখির মনমেজাজ কেমন করে জানব— পাখি তো মানুষ নয়, তার ভাষাও বুঝি না। তার কূজন ভাষা কিনা— তা-ও জানি না। ধ্বনিবৈচিত্র্য নেই তার কুহরণে।

কিন্তু মানুষ! মানুষকেও কি বোঝো না ঠাকুর?

বুঝি বৈ কি! সেদিন তোমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই তো তোমাকে আহ্বান করেছিলাম। সেদিন কি দোহে এক হইনি সাবিত্রী? দু'জনে মিলে এক কিন্তু একা তো ছিলাম না। তখনও ছিলাম দু'জন, আজও দু'জন। দু'জনে মিলে এক ও অভিন্ন কিন্তু কখনও একা নই।

সে তো অনেক অনেক দিন আগের কথা ঠাকুর। আমি বাল্যে বিধবা হয়েছিলাম কিন্তু যৌবন আমাকে ত্যাগ করেনি। প্রকৃতির কী আশ্চর্য শক্তি! সে লোহার ন্যায় শক্ত সামাজিক বিধানও মানে না। তাই বুঝি মানুষও বিধান উপেক্ষা করে, তাই-না ঠাকুর? প্রকৃতি ও মানুষের ধর্ম তাহলে এক ও অভিন্ন, কী বলো? কিন্তু সে যে বহু কালের কথা, তখন তোমার স্ত্রী ছিল।

কিন্তু তাকে আমি ভালোবাসিনি সাবিত্রী। তোমাকে দেখার পর শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।

আমি ব্রাহ্মণী ছিলাম না।

আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ করে নিলাম। মিলিয়ে দিলাম উচ্চবর্ণের সাথে নিম্নবর্ণ। দুধ এবং আলতায় মিলে দুধে-আলতা হল। নীচে আর নিচে রইল না।

তোমার স্ত্রী তোমাকে সন্তান দিয়েছিল।

একটু আগে তুমিই-না বললে প্রকৃতির ধর্মের কথা। সে ধর্ম পালন করেছিলাম, কিন্তু নিস্তারিণীকে ভালোবাসিনি। সন্তানদেরও নয়। তারা কর্মফল মাত্র— মানুষ কর্ম করতেই ভালোবাসে, কর্মফল ভালোবাসে না। নিষ্পন্ন কাজ অতীত। নির্মিত দ্রব্যও অতীত, তার দিকে নির্মাতা ফিরেও তাকায় না। ছেঁড়া বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করে সে

ওটা। অতীতকে পশ্চাৎ ফেলে সে নিত্যনতুন সৃজনের মোহে সামনে এগিয়ে যায়। আমি একমাত্র তোমাকেই ভালোবেসেছি সাবিত্রী।

হবেও-বা, কিন্তু সে যে অনেক পুরনো কাহিনী। সে-অতীতকে পশ্চাতে ফেলে এসেছি, নির্মাণের ক্ষমতাও হারিয়েছি। ওই দেখ পূর্ব আকাশে চাঁদটা কেমন রুপোর গোল থালা, কিন্তু ক্রমে তার আকৃতি সঙ্কুচিত হতে থাকবে— কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রেখাটিও থাকবে না। তুমি ওই পূর্ণ চাঁদটাকেই ভালোবেসেছিলে, কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতটাকে নয়।

ভুল সাবিত্রী, এ তোমার ভুল। চাঁদ লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে বটে, কিন্তু চাঁদ অক্ষয়, সদাজাগ্রত। প্রেমও চাঁদের ন্যায় চিরন্তন অক্ষয়।

রাজেন ঠাকুর জোরের সাথে উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে অনুভব করে, সে যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

শব্দের মায়াকে বাস্তব বস্তুরূপে চালিয়ে মিথ্যা সান্ত্বনা কেন পেতে চাও ঠাকুর? দৃষ্ট চাঁদকেই লোকে ভালোবাসে। চাঁদ যখন অদৃশ্য থাকে, তখন অমাবস্যার অন্ধকারই শুধু দেখা যায়। কী বললাম? দেখা যায়? ঠিক নয়, অন্ধকার এমন বস্তু যা দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। আমি অন্ধ। বেশ বলেছি, তাই-না ঠাকুর? সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি, চোখে পাণ্ডুর শূন্যতা।

কিন্তু চাঁদকে তো ভোলা যায় না সাবিত্রী, সে যে চিত্তে বিচিত্র থাকে। কখনও ভুলতে পারবে সে রাত্রির কথা, যে রাত্রিতে তুমি আমি-প্রথম মিলিত হলাম— দুই দেহ হল এক, দুই আত্মা হল একাত্মা। বিনিদ্র সে রজনীটি কি এখনও তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও না? আমি তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই সাবিত্রী। নিমীলিত চোখের দেখাই হল আসল দেখা। রাজেন ঠাকুর তবু হার মানে না।

স্বপ্ন ঠাকুর, স্বপ্ন! স্বপ্ন অচেতন অবস্থায় পুনর্জাগরিত কুয়াশাচ্ছন্ন অতীত এবং কল্পিত ভবিষ্যতের বিকৃত ছায়াছবি। জাগ্রত লোকের কাছে স্বপ্ন মূল্যহীন। সে স্বপ্ন-দ্বারা চালিত হয় না। রাত সমাগত। অদূরের বনানী ঘেরা বস্তি রুপালি আলোয় ঝলমল। সে-রাতটিও শুক্লা তিথির রাত ছিল। কিন্তু আজ কি সে রাতের ঘটনাগুলো হুবহু ঘটাতে পারো? পারো না। সম্ভব নয়। তুমিও ক্লান্ত। ধমনীতে রক্ত এখন আর নাচে না : মরা নদী : স্রোতহীন বদ্ধ জল : এখন নতুন কোনো ঘটনা নয়, ঘটানো যাবেও না। এখন একটিমাত্র একটানা ঘটনা সত্য— বিশ্রাম, শুধু বিশ্রাম। আমাকে বিশ্রাম করতে দাও ঠাকুর। সাবিত্রী ক্লিষ্ট ক্লান্ত স্বরে বলে।

বিশ্রাম! নাকি বিদায়? কোন্‌টা? রাজেন ঠাকুর সহসা হাসতে থাকে। আবছা আলোতে তার দাঁতগুলো দেখা যায়।

আশ্চর্য দীর্ঘায়ু তোমার দাঁত ঠাকুর— একটাও পড়েনি। পড়াই কিন্তু ভালো ছিল— বড় দুর্গন্ধ ঠাকুর, আর কথা বলো না। কিন্তু সে দিন তো দুর্গন্ধ ছিল না— হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই শুক্লা চতুর্দশীর রাত দশটা-এগারটায় যখন কুলে কালি দিয়ে, কী না ঠাকুর কীর্তনের সে পদটা— মনে কয় মনে কয় কুলে কালি দিয়া বাহিরিয়া যাই।

হ্যাঁ। মনে পড়ছে, মনে কয় কুলে কালি দিয়া বাহিরিয়া যাই, কিন্তু পূর্বাপর মনে পড়ছে না তো, সব ভুলে গেছি। অথচ দিনরাত গেয়েছি ও গীত। স্মরণশক্তি গেছে,

তবু রাতটা স্মরণ করতে পারছি— আগের কিছু কিছু ঘটনাও। তুমি রোজ বিকেলে আমাদের বাড়ি আসতে। পাস করে বেকার ছিলে। পূজারি গুরু ব্রাহ্মণের বংশ। তুমি আমাকে গান শেখাতে— ভজন, কীর্তন— বিদ্যাপতি কহে কয়ছে হরি বিনে কাটাই দিন রাতিয়া,— বাবা-মা ভক্তিগদগদ হয়ে চোখ বুজে শুনতেন। কিন্তু আমরা! প্রথমে কথা হত চোখে চোখে পরে পা'এ পা'এ। একদিন গাইতে গাইতে তুমি আমার গায়ে ঢলে পড়লে, পরদিন আমি ঢলে পড়লাম। হাঁ! হাঁ! আচ্ছা ঠাকুর আমরা সেদিন কাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম বলতে পার?

ফাঁকি! না ফাঁকি দিইনি তো। যা বলার মুখে না বলে অঙ্গে অঙ্গে বলেছিলাম মাত্র। জান সাবিত্রী, মুখের ভাষার চেয়ে ইঙ্গিত ও অঙ্গের ভাষা অনেক বেশি ভাববাহী। রাজেন ঠাকুর নিশ্চয়তা দেয়। চোখ দুটোও মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করে। ওই সময়টুকুর মধ্যেই সেদিনের ঘটনাগুলো। তার সামনে একপাল হরিণ শিশুর ন্যায় বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু বাধা পায়।

সাবিত্রী বিরক্তি ও ঘৃণার সাথে বলে : ছি! আবার সেই দুর্গন্ধ ছড়ালে! ওয়াক থু! তুমি কথা বলো না-তো। যা বলার আমি বলব। আমার দাঁত নেই : সারাদিন অভুক্ত আমি। আমার পেটে পচনশীল খাদ্য নেই, নিঃশেষে নিঃসৃত সবকিছু। বহুবার বমি করেছি সে তো জানই, যা কিছু পেয়েছিলাম সব তুমি খেয়েছ, আমি খাইনি। তোমার ওই গহ্বরে পচনশীল কর্দম। হাঃ! হাঃ! পাচ্ছ কিছু দুর্গন্ধ? পাবে না। কেননা তোমার দাঁত আছে। আমার একটি দাঁতও নেই এবং বড় কথা কিছু খাইনি। হ্যাঁ, কী বললে? অঙ্গে অঙ্গে কথা হয়েছিল। ভজন কীর্তন সব ছিল তাহলে ধোঁকাবাজি। ধোঁকাবাজি নয়ত কী? হিংস্র কামনার উপর পোশাক, কৃমিকীটের সজ্জা, পিতলের উপর রাং, মাটির মূর্তির গায়ে জড়োয়া গহনা-বেনারসি জরি শাড়ি! মেকি, সব মেকি! কিন্তু কেন? কেন মেকির পিছু ছুটলাম ঠাকুর।

সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর ভারি হয়। রোরুদ্যমানা সাবিত্রী বিলাপবিলাসী হয়ে ওঠে।

আহা, থামো! আবোল তাবোল কী সব যে বকছ সাবিত্রী! তোমার দেহ আমার দেহ, এর মধ্যে মেকি কী দেখছ? আদি ও অকৃত্রিম মানবদেহ— যা কিছু করেছি, সবই বাস্তব ঘটনা— সার্থক তোমার আমার জীবন। নয় কি সাবিত্রী? যাকে তুমি পোশাক বলছ সে যে পোশাক নয় সাবিত্রী— আভরণ, অলঙ্কার। অলঙ্কার রূপ বৃদ্ধি করে। অলঙ্কার পরা অন্যায় নয় সাবিত্রী।

অলঙ্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে রাজেন ঠাকুর আরো কী বলতে চায়, কিন্তু সাবিত্রী তাকে কিছুটা ধমকের সুরে থামায় :

আবার বকছ? ওই গন্ধটা আমার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ঠেলে বাইরে নিয়ে আসছে। চুপ করো, ঈশ্বরের দোহাই চুপ করো। কিছু ভালো লাগছে না, আমার কথা আমাকে বলতে দাও। কী বলেছিলে তুমি! ঘটনা! হাঃ! হাঃ! বুদ্বুদকে ঘটনা নাম দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাও? সব ভুলে গেছি, সব... ভুলে... গেছি ঠাকুর। কই একটি উষ্ণ আশ্লেষের কথাও তো মনে পড়ে না। সব কল্পনা— মিথ্যা! মিথ্যা! সে-দিনের একটি ঘটনা এখন ঘটাও তো দেখি ঠাকুর? পারছ না, পারবেও না। রাধাকৃষ্ণ এক শুধু মানসলোকে। রাধা

এবং কৃষ্ণ আজন্ম আলাদা— মৃত্যুতেও আলাদা। যার সেতু নেই সে নদীর দু-তীরের মধ্যে যোগসূত্রও নেই। নাকি আছে? বলো। কই সে সেতু, সাঁকো? সেতু কই?

সেতু? কিসের সেতু? তুমি কি পাগল হলে সাবিত্রী?

আবার কথা বলে কেন পচা গন্ধটা ছড়াচ্ছ? ঘৃণ্য আবর্জনা, আঁস্তাকুড়। হতে পারতে— অনায়াসেই একটি পুষ্প হতে পারতে যদি সেতু থাকত, যদি তোমার আমার মাঝে সেতু থাকত। যদি সেতু থাকত। কিন্তু সুযোগ হারিয়েছি, কুলে কালি দিয়েও কুল রক্ষা করতে গিয়ে সেতু নির্মাণ করিনি, তুমি আমাকে বিরত করেছ, তুমি বারবার আমার মাধ্যমে পিতৃত্ব অস্বীকার করেছ। তুমি তোমার কুল রক্ষা করেছ, ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করেছ, যজমান রক্ষা করেছ, উত্তরাধিকারী রক্ষা করেছ, আমি তোমাকে ভ্রমর হওয়ার সুযোগ দিয়েছি আমার পুষ্পোদ্যানে। তুমি বর্গি, দস্যু, চোর, যাযাবর, লুটেরা। তুমি নির্মম, পাষণ্ড, কাপুরুষ। তুমি ঘৃণ্য, তুমি ক্লীব, তুমি তুমি।... উত্তেজনায় সাবিত্রী উপযুক্ত আর কোনো শব্দ খুঁজে পায় না।

এই সুযোগে রাজেন ঠাকুর প্রতিবাদ করে :

চোর! কী বলছ সাবিত্রী! তুমি কি সংবিৎ হারালে? আমি চোর! চোর কি কখনও চোরাই মাল দিবালোকে কাঁধে নিয়ে বেড়ায়? তোমাকে কি আমি অন্ধকার থেকে দিবালোকে তুলে আনিনি? অর্থহীন বিলুপ্তির বিবর থেকে উদ্ধার করে জীবন দান করিনি? তোমার জন্যে ত্যাগ করিনি কি সংসার? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ আমি যাযাবর। কিন্তু জীবন থেকে যাযাবরত্ব বাদ দিলে তার থাকে কী? কিছু না কিছু না... প্রকৃতিস্থ হও সাবিত্রী।

ছি! ছি! আবার সেই বিশ্রী দুর্গন্ধটা ছড়াচ্ছ। কথা নয় ঠাকুর, আমাকে ঘুমোতে দাও। আমি ঘুমোব। কিছু স্মরণ করতে পারছি না। কোথায়-বা মধু, কোথায়-বা মক্ষিকা। শূন্য ভাণ্ড, মক্ষিকা মৃত। তুমি মৃত ঠাকুর— আমি বলছি তুমি মৃত। ডাকো, লোকজন ডাকো, তোমার শবটা শ্মশানে নিয়ে যাবে। আমাকে ঘুমোতে দাও। সাবিত্রী কোনো কথা শোনে না, নিজের মতো বকে চলে।

তোমার কি অসুখ করেছে সাবিত্রী? রাজেন ঠাকুর প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায়।

অসুখ! কই না তো। বেশ ভালো আছি। সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি রাত দেখতে পাচ্ছি— বুদ্বুদের মতো আলিঙ্গনগুলো, ওষ্ঠচুম্বনগুলো... এবং... পরবর্তী অত্যাবশ্যক ক্রিয়া এবং পরিশেষে ঘুম, প্রশান্তি ও তৃপ্তির নিদ্রা। সব একসাথে ভিড় করে জাগছে আবার সাথে সাথেই ডুবছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই ... এই তো সব ডুবে গেল ঠাকুর, স্বখাত সলিলে ডুবে গেল, কিছু অবশিষ্ট থাকল না, একটি ছত্রাকও নয়, ব্যাঙের ছাতাও নয় : সবকিছু শূন্য, আবছায়া। না, আবছায়াও নয় অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। সমস্ত অতীত মসিলিপ্ত আদি অন্তহীন একটা কালো পর্দা, পর্দাও নয় শুধু কালো, স্পর্শগ্রাহ্য বস্তু নয়, একটা অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব, হাতড়ালে কিছু ধরা যায় না, তবু হাতড়াতে ইচ্ছে করে। এই বিরাট কালোর মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় শুধু উত্তেজিত স্নায়ুর আকর্ষণে বিকৃত মুখভঙ্গিগুলো। ছি! ছি! ডাকো ঠাকুর, তোমার বংশধর ডাকো, পাড়া-প্রতিবেশীদের ডাকো, তোমার শবটা শ্মশানে নিয়ে যাক : আগুন জ্বালুক, চন্দনে ঘি ঢেলে আগুন জ্বালুক, তুমি তার মধ্যে দগ্ধ হও; তোমার মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাক, আমি চন্দন-গন্ধ গ্রহণ করি।

বিকারগ্রস্ত রোগী! উহ! সাবিত্রী, ওই দেখ এখনও দেখা যাচ্ছে লোকালয়। ঘরে ঘরে জ্বলছে সন্ধ্যার প্রদীপ। প্রদীপের কাছে চল। ওঠো, তোমার চিকিৎসা আবশ্যক। পল্লিতে নিশ্চয়ই চিকিৎসক পাওয়া যাবে। রাজেন ঠাকুর মিনতির সুরে অনুরোধ জানায়।

কী বললে ঠাকুর! কত মানা করলাম তবু মুখ বন্ধ করলে না? কে রোগী? কার চিকিৎসা? পোড়ালেই শুধু ব্যাধিমুক্ত হবে ঠাকুর। ডাকো, ওদের ডাকো, আগুন জ্বালুক। ওই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আগুন জ্বলছে, তুমি দগ্ধ হচ্ছ। গৃধিনীরা অপেক্ষা করছে। অগ্নিদহনে তোমার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠছে। দণ্ডায়মান, ঋজু উলঙ্গ... আহা, কী চমৎকার দগ্ধ হচ্ছ তুমি। শত শত পুষ্পে মুকুলিত হচ্ছে অগ্নিশিখাগুলো। হে ঈশ্বর, শিখাগুলোকে আরো আরো ঊর্ধ্বগতি দাও, শিখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মহাদিগন্তে বিলীন হয়ে যাক আমাদের অস্তিত্বের বুদ্বুদগুলো, ঠাকুর তুমি দগ্ধ হও। আমাকে নিরীক্ষণ করতে দাও সে-অগ্নিশিখা— আমার গাঁঠরি ওর মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, পুড়ে গেছে, মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কোনো চিহ্ন নেই। আমি গ্রন্থিমুক্ত হয়েছি। সেতুর বন্ধন ছিল না, পুঁটলিটা ছিল তা-ও নিঃশেষ করেছি। ঠাকুর চুপ করো। আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। আমি শ্রান্ত, আমাকে ঘুমোতে দাও— দেবালয়ে নয়, লোকালয়ে নয়, প্রদীপের আলোতেও নয়— এখানে এই বিটপীতলে— আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। মনে আছে ঠাকুর সে দিনের কথা, শ্মশানঘাটের অশ্বত্থতলায় এমনি এক জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে যেদিন আমাদের প্রথম মিলন হল? গায়ে অসংখ্য আঁচড় লেগেছিল কিন্তু ব্যথা পাইনি : তোমার হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু যন্ত্রণা বোধ করনি— তাই না ঠাকুর? সাবিত্রী হাঁপাতে থাকে।

হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক বলেছ সাবিত্রী, যথার্থ বলেছ। এইতো প্রকৃতিস্থ হয়েছ। কিছুই মিলিয়ে যায়নি সাবিত্রী, স্মৃতির মধ্যে সব বেঁচে আছে। স্মৃতিই জীবন। স্মৃতি শান্তি। বলবে জাবর কাটা। জাবর কাটা-ই যে প্রশান্তি সাবিত্রী। তুমি সুস্থ হয়ে গেছ, ওঠো আবার পথ চলি।

জল! একটু জল! কোথায় জল! সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম কোথাও একবিন্দু জল দেখলাম না। এ কোথায় এলাম আমরা ঠাকুর? তৃষ্ণার্ত সাবিত্রী চোখ বিস্ফারিত করে।

জল খাবে সাবিত্রী? কমণ্ডলু ভরা জল থাকতে জল নেই বলছ কেন? এই নাও, জল খাও।

রাজেন ঠাকুর কমণ্ডলু কাত করে দেয় সাবিত্রীর মুখে। জলের ধারা ওষ্ঠসন্ধি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। সাবিত্রী তার যাত্রাপথ শেষ করেছে। সাবিত্রী বিশ্রাম নিচ্ছে। সে এখন আর জল খাবে না।

রাজেন ভট্টাজ কয়েকবার চেষ্টা করে সাবিত্রীর ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু সাবিত্রীর ঘুম ভাঙে না। সহসা একটা ভয়ানক ভীতি পাথর হয়ে চেপে বসতে চায় রাজেন ঠাকুরের দেহের ওপর। সে দ্রুত প্রদীপদীপ্তি লোকালয়ের দিকে পথ ধরে। পশ্চাৎদিকে ফিরেও তাকায় না।

সাবিত্রী ঠিকই বলেছিল, সেতু নেই। মনে মনে সেতুর কথা ভাবতে ভাবতে সে লাঠি ঠুকে পথ ধরে। পুঁটলিটা পড়ে থাকে সাবিত্রীর সিথানে।

শওকত ওসমান

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী

আমরা সহপাঠী ছিলাম। হৃদ্যতার বন্দি।

বলাবাহুল্য একই স্কুল। রূপচাঁদ ভুক্ত ছিলেন এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁরই বদান্যতায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের নাম নন্দনপুর। শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ উক্ত গ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। সুতরাং এখন উপলব্ধি করা যায়, বদান্যতার সঙ্গে বিশেষ মহানুভবতা ছিল। প্রতিষ্ঠাতা নিজের গ্রাম নয়, কেন্দ্রীয় একটি গ্রাম বেছে নেন যেন আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিদ্যার্থীরা স্কুলে আসতে পারে। পাশ দিয়েই চলে গিয়েছিল সেকালের সরকারি জেলা বোর্ডের সড়ক। পাড়াগাঁয়ে যাতায়াতের কথাও ভাবতে হয়। চষা ক্ষেত, মাঠের আল, খানাখোন্দল, এবড়োখেবড়ো জমি— বিদ্যার্জন এবং লোক-চলাচলের আদৌ অনুকূল নয়। শ্রীযুক্ত ভুক্ত তা জানতেন— সেদিক থেকেও তাঁর দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

আরো একটি কথা বলে রাখা যায়। ষাট বছর পূর্বে অর্থাৎ সে যুগে স্কুলের শ্রেণিবিভাগ আজকের মতো ছিল না। সপ্তম শ্রেণি থেকে উচ্চ-ইংরেজি স্কুল বা ইংলিশ হাই স্কুলের ক্লাস শুরু হোত। তারপর ষষ্ঠ শ্রেণি। এইভাবে ক্রমে ক্রমে কমে-কমে প্রথম শ্রেণি বা ফার্স্ট ক্লাস। বর্তমান যুগে গতি বিপরীত। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কোথাও কোথাও যায়। এইসব কথা বলা অতীতের কিছু আঁচ দেওয়ার জন্যে।

পল্লি অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা সে-যুগে ছিল খুব কম। চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে অনেককে বিদ্যাভ্যাসে আসতে হোত। শিক্ষাবিস্তারের কারো তাগিদ তাই কৃতজ্ঞতার তুলাদণ্ডে ওজন করা কঠিন ছিল ওই যুগে।

রূপচাঁদ ভুক্ত হাইস্কুলে মুরারি পাচাল ছিল আমার সহপাঠী— ষষ্ঠ শ্রেণিতে। পাচাল পদবিটি সচরাচর দেখা যায় না। আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম মুরারির মিষ্টি ব্যবহারে। তার চেহারাটিও ছিল আকর্ষণীয়। স্কুলে পণ্ডিতমশাই কবিতা মুখস্থ করতে দিতেন। মুরারি পাচালের আবৃত্তি হত সবচেয়ে শ্রুতিমধুর। কৈশোরকাল ভবিষ্যতের সূচনারূপে ধরা হয়। ক্লাসে মুরারি ফার্স্ট হত না বটে, কিন্তু উপরের দিকে— অর্থাৎ, প্রথম চার-পাঁচ জনের মধ্যে তার পজিশন ছিল বাঁধা।

ইংরেজি প্রবাদ: প্রত্যুষকাল দিনের সূচনা। কথাটা মুরারির ক্ষেত্রে মিথ্যে হয়ে গেল।

ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রমোশন পাওয়ার পরই মুরারির মাথার গণ্ডগোল দেখা দিল। খেয়ালের বশে কখন কী করে বসবে বলা দায়। হাফ-ইয়ার্লি বা ষান্মাসিক

পরীক্ষায় দেখা গেল সে ফার্স্ট হয়ে বসে আছে। সব বিষয়ে ফার্স্ট। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, বিকেলে 'ফিট' হয়ে পড়ে গেল স্কুলের কম্পাউন্ডে। মাইল-দুই দূরে গ্রাম। খবর পেয়ে বাড়ির লোকেরা ওকে তুলে নিয়ে যায়। পাঁচ দিন মুরারি বিছানায় পড়ে রইল। আশ্চর্য, এক জল ছাড়া আর কিছু আহার করল না। সাত দিনের মাথায় সে আবার স্বাভাবিক, যেন কিছুই ঘটেনি।

উদ্বিগ্ন মা-বাবা মুরারির চিকিৎসার দিকে মন দিলেন। সে যুগে মনোরোগের বৈজ্ঞানিক কেতায় চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। হাতুড়ে কবিরাজ, তুকতাক, ফুঁকফাক অথবা কোনো ঠাকুরের থানে মানত— এসবই ছিল দাওয়াই। কোনো মন্দির বা দরগায় 'হত্যে' দিয়ে পড়ে থাকারও রেওয়াজ ছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান বিপদে পড়ে এক গোয়ালের গরু। ঠাকুরের থান বা পিরের দরগার ক্ষেত্রে সেযুগে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

মুরারির বাবা-মা মুষড়ে পড়লেন। অমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে শেষে এমন ব্যাধির খপ্পরে পড়ল। তখন মুরারি স্কুলে আসত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে, গার্জেনদের সঙ্গে স্কুল-কর্তৃপক্ষের একটা অলিখিত চুক্তি ছিল। মুরারি স্কুলে যাক বা না যাক, বেতন দিয়ে যাবেন বাবা। তিনি উচ্চবিত্ত কৃষক। টাকাপয়সার তেমন অভাব ছিল না।

মুরারি স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক যে-কোনো অবস্থায় আমার কাছে এলে শান্ত হয়ে যেত, কথা বলত আমার সঙ্গে। তার বেশির ভাগ অবশ্যি অসংলগ্ন। কিন্তু তার আদব-কায়দার পরিধি এক চুল এদিক-ওদিক হত না। মুরারির বাবা তাই আমাকে তাঁদের বাড়ি যেতে বলতেন। আমার মা-বাবা আবার দু'মাইল রাস্তা একা একা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হতেন না। কাজেই সঙ্গী খুঁজতে হত। তবু মুরারি অসুস্থ হলে আমি তাদের বাড়ি যেতাম। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। আমারও তো লেখাপড়া আছে। তবু সব অবহেলায় পাশে ঠেলে মুরারিদের বাড়ি যেতে আমার ভালোই লাগত। কিন্তু কাছে গেলে মন হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিত ভেতরে ভেতরে— "পালাও, পালাও।" কারণ, অসংলগ্ন প্রলাপ মাঝে মাঝে শোনার ধৈর্য কতক্ষণ আর থাকে?

রেহাই পাওয়া যেত বৈকি। যখন সে স্বাভাবিক তখন তো সে বহু সুবোধ বালকের চেয়েও ঢের বেশি শিষ্টাচারী। মাঝে মাঝে সে ক্লাস করত। টিচার পড়া ধরলে জবাব দিত একদম ঠিক ঠিক। ছেলে তো খারাপ নয়। একদিক থেকে তুখখার (তীক্ষ্ণধার) বলা যায়। ক্লাসের ফার্স্ট বয় হয়তো নয়, তবে কাছাকাছি তো বটেই।

মুশকিল ওইখানে— কখন শ্রীমান মুরারি পাচালের মাথা বিগড়াবে, তার তো ঠাঁই-ঠিকানা নেই। বিগড়ে গেলে তো সে আর এক চিজ অথবা চিড়িয়া। হয়তো মাঠে মাঠে দৌড় মেরে শেষে কোনো পাড়ার কাছে এসে চিৎকার পাড়বে, 'আমি এই কলিযুগের ত্রাণকারী। পাপে ভরে গেছে পৃথিবী। পাপ ঘরের ভেতর পোকার মতো কিলবিল করছে। আমি ফুঁ দিলেই সব উড়ে যাবে। ফু-ফু-ফু...।' তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে ফুৎকার-ধ্বনি প্রদান চলবে বহুক্ষণ।

এসব কাণ্ড বিসদৃশ কিছু নয়। আশপাশে যারা থাকে তাদের কিছু হাসির খোরাক। কিন্তু আরো নানারকম ব্যাপার বাধিয়ে বসত মুরারি। কথায় বলে, পাগলের কাণ্ড। মাথা ভালো থাকলে সে সোজা স্কুলে চলে আসত। কামাই করত না। চুপচাপ বসে যেত পিছনের বেঞ্চিতে। অবিশ্যি মুরারির আবির্ভাবে ক্লাসের পরিবেশ সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক হয়ে উঠত। শিক্ষক ক্লাসে, তাই ছাত্ররা হল্লার সুযোগ পেত না। কিন্তু গা টেপাটেপি করত চাপা-হাসিতে।

একদিন ক্লাসে সত্যি এক কাণ্ড ঘটে গেল। বলাবাহুল্য, মুরারির বেহাল হালৎ। আগে ওর ব্লাডপ্রেসার ছিল না। সম্প্রতি তা-ও এসে জুটেছে। মুরারি ক্লাসে ঢুকেই সম্বোধনী বক্তৃতা জুড়ে দেয়, 'ভদ্রমহোদয় সঙ্গীগণ, আমি শ্রীমুরারি পাচাল, পিতা শ্রীঅমুকচন্দ্র পাচাল তস্য সন্তান আমি কোনো বদ্ধ পাগল নই। তবে আমি পাগল। তা-ও ঠিক। ডিগ্রির হেরফের। হ্যাঁ আমি, কাল থেকে নয়, পাঁচশ বছর আগে থেকে সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। সংসারত্যাগী। আমার ইহজগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি সন্ন্যাসী...

ভালো কথা। আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই উপেনবাবু তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাঁর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই মুরারি চার-পাঁচ মিনিট আরো উপদেশমূলক বক্তৃতা দিল। চমৎকার যুক্তির গাঁথুনি। কে বলে মুরারি পাগল। কিন্তু উপেনবাবু বোধহয় ভুল করে তাকে বাধা দিয়ে ফেললেন। না, বাধাও ঠিক নয়। তিনি কেশে উঠেছিলেন। তখনও মুরারি সকলকে সম্বোধন করে বলে চলে, 'বন্ধুগণ, আমি সন্ন্যাসী। ইহজগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নীল-ইংরেজি নীল-বাংলার নয়। আমি সন্ন্যাসী— ঠিকই।'

ঠিক এই সময়ে উপেনবাবু বলে ফেললেন, 'বেশ। তারপর?'

'তারপর?' পাল্টা মুরারির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তারপর।' শিক্ষকের সায়।

'এখানে একটা কিন্তু আছে।'

'বলে ফেলো।' শিক্ষকের তাগিদ।

'স্যার, আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। তা নির্ঘাত অতীব সত্য। কিন্তু, স্যার, আমার এখনও 'নাইট-পলিশান' হয়ে যায়।'

সেদিন উপেনবাবুর মতো রাশভারী শিক্ষক ক্লাসে না থাকলে আমরা যে কী নাদে চিৎকারে-হল্লায় হেসে উঠতাম তা ঈশ্বর জানেন। আমাদের মুখ চাপা হাতের তালুর ভেতর। উপেনবাবু গম্ভীর গলায় ছড়ি নাচিয়ে (তা ছাড়া তিনি ক্লাসে আসতেন না) প্রায় যুগপৎ ধমক ও চিৎকারের সংযোগ ঘটালেন। আমাদের কানে শুধু বাড়ি পড়তে থাকে, 'বেরো শুয়ার, বেরো।'

নিমেষে মুরারি হাওয়া।

ক্লাস শেষ হতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি।

উপেনবাবুর মতো নীতিপরায়ণ মানুষ, যিনি পুরো সময় ক্লাসে থাকেন, সেদিন আদেশের সুরেই বললেন, 'ক্লাস শেষ। চুপচাপ বসে থাকো, অন্য টিচার না-আসা পর্যন্ত। গোলমাল করো না।'

বলাবাহুল্য, তিনি চোখের আড়াল হওয়া মাত্র আমরা কিছু অকালপক্ক বালক (সংখ্যা শতকরা আশি) সশব্দে হো হো হেসে উঠলাম। কয়েকজন নিরীহ কিশোর মুরারি-উচ্চারিত ইংরেজি শব্দের মানে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল আশপাশের সহপাঠীদের কাছ থেকে। ফলে হাসির হররা আর সহজে থামতে চায় না, তাদের বিলম্বে যোগদান-হেতু।

এহেন মুরারি কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিল। দু-তিন বছর নষ্ট হল তার। কিন্তু সে ম্যাট্রিক পাস করে ফেলল এবং প্রথম বিভাগে। বাপ-মা তো তার ভবিষ্যতের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। তবু নসিব ফেরে। পাতা-চাপা আর পাথর-চাপা কপালে তফাত আছে।

এখানে দেখা গেল, কপাল প্রথম পর্যায়ে পড়ে। খুব ভালো রেজাল্ট, মুরারি আই-এ পাস করে ফেলল। বাপ-মা খাতিরজমা। দু-তিন বছর উপর্যুপরি কেটে গেছে। আর বোধহয়, মাথার গেরো নেই।

তাছাড়া ম্যাট্রিক পাসের পর যখন মুরারির মামা বিজয়বাবু ওকে শহরে কলেজে ভর্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মুরারির মা বেঁকে বসেছিল, 'দাদা, চাষিবাসির ছেলে অত 'নেকাপড়ায়' কাজ নেই। মুরারি আমার কাছে থাকবে। স্বাভাবিক হলে আলাদা কথা ছিল। ওকে শহরে পাঠাব না।'

বিজয়বাবু এই এলাকায় সকলের শ্রদ্ধাভাজন। কৃষক-পল্লি থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কেরানির চাকরি পেয়েছেন। তা কম গৌরবের কথা নয়। তাঁর কথার দাম আছে। বোন নিজের মতামত দিল। কিন্তু ভগ্নীপতির শ্যালকের মতে মত। শ্যালক বয়সে বড়। তদুপরি সরকারি চাকুরে। বোনের বায়না টিকল না। তাছাড়া, শহরে কলেজের পড়ার হাতছানি মুরারিকে বেশ উত্তেজিত রেখেছিল। মাকে সে নিজের রাস্তায় টেনে নিয়ে এল সহজে।

দু'বছর পর বিজয়বাবুর মর্যাদা প্রায় দেবতার পর্যায়ে পৌঁছায় আর কী। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সব অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে। যাকে সবাই বাতিল করে দিয়েছিল, সে পরীক্ষায় অমন ফল দেখাবে কেউ ভাবতে পারেনি।

মুরারি বি-এ ক্লাসে ভর্তি হল। শহরের পথঘাট চেনা হয়ে গেছে। চাল-চলন রপ্ত হতে বেশি দেরি লাগেনি। ফিটফাট থাকে সে। মাথার চুল বেশ পরিপাটি করে রাখে। কিন্তু টেরি কাটে না। তার বাবা বলেন, অমন টেরিকাটা ছেলেরা নাকি গোল্লায় যায় আর ওরা দুশ্চরিত্র হয়। মামা বিজয়বাবুও সেই পন্থী। মুরারি তা মেনে নিয়েছিল।

এক কথায়, শহরে দু-বছর বসবাসের ফলে মুরারি আদব-কায়দায় পিছিয়ে পড়ে থাকেনি। ছুটিতে গাঁয়ে ফিরলে বাবা খুব আনন্দিত হতেন। মা তো ঠাকুরের সিন্নি মানত, পুত্রের কল্যাণ-প্রার্থনায়। এক নয়, কত ঠাকুরের, তা তাঁরই জানা। বিজয়বাবু প্রায়ই বলতেন, 'তোমার এই ছেলে আখেরে কাজ দেবে।' ভগ্নীপতি এমন কথার জবাব দিতেন বৈকি, 'দাদা, আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন, ও যেন সুস্থ থাকে। নইলে ওর কাছে থেকে আমি কিছু পিত্যেশ করিনে।'

সবই ঠিকঠিক চলছিল। মুরারির বি-এ ক্লাসে কয়েক মাস কেটে গেল। প্রথম প্রথম কলেজের ডিবেটিং, অন্যান্য অনুষ্ঠানে সে যোগ দিত না। ইদানীং শুধু যোগ না, সে রীতিমতো শরিক হতে লাগল। ছড়িয়ে পড়ল মুরারির খ্যাতি ভালো ডিবেটার হিসেবে। আকর্ষণ-মুখর চেহারা। তেমনই কণ্ঠ। পূর্বে স্কুলে আবৃত্তির সময় তা বোঝা যেত। এখন তর্কস্থলে আর-এক রকমের খোলতাই রূপ দেখা গেল। শিক্ষকেরা খুব আশান্বিত। আন্তঃকলেজ তর্ক-প্রতিযোগিতায় তারা মুরারিকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাবেন। শুধু বাচনভঙ্গি নয়, মুরারির ধারালো যুক্তি সেই সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠত। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। প্রতিপক্ষ ঘায়েল বা ধরাশায়ী।

এ হেন মুরারি।

কিন্তু ঠিক পাঁচ-ছ'মাস পরে তার মাথার ব্যাধি আবার দেখা দিল। তখন সে আর নিয়মিত ক্লাস করত না। কলেজে গেলে একদিকে চুপচাপ বসে থাকত। ব্যক্তিত্বে, গুণে মুগ্ধ অনেকে মুরারির বন্ধুত্বলোভী। তারা মুরারির ভেতরগোঁজা ভাব দেখে ভাবলে, 'ব্যাটা ভালো ডিবেটার। সেই গুমোরে আর কারো সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক।' অনেকে ওর পরিবর্তন দেখে ক্ষুব্ধ। ডিবেটিং ক্লাবেও সে আর রীতিমতো যায় না। যেদিন যায়, প্রতিপক্ষকে প্রায় মেরে বসার উপক্রম করে। তর্ক আর তার কাছে বাক-যুদ্ধ নয়। সুযোগ পেলে সে অন্য দলের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে তবে শান্ত হবে। একদিন তো হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। এক অধ্যাপক মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা আর এগোতে দিলেন না। কলেজের আবহাওয়া সামান্য তেতে রইল। কারণ, দলাদলি। মুরারির সমর্থক অবশ্যি কম ছিল না। কিন্তু সে নিয়মিত কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিল। প্রথমদিকে তিন চার-দিন বাদ যেত হপ্তায়। পরে হপ্তায় সাত দিন এবং তা আরো গড়িয়ে যেতে লাগল।

মামা বিজয়বাবু ভাগ্নের পরিবর্তনের কোনো খোঁজ পাননি গোড়ার দিকে। মুরারি ভালো ছেলে, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস নেই। রেজাল্টই প্রমাণ।

মেসে থাকে মামা-ভাগ্নে। এক কামরায় ডবল সিট। মামা-ভাগ্নের অবশ্যি কথাবার্তা হয় কম। কিন্তু মুরারির হালেচালে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কথাবার্তা কম। তা গুরুজনের সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠের চিরাচরিত আদবের ব্যাপার। মুরারি কলেজে না গিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পার্কে, গাছতলায় শুয়ে আকাশ-পাতাল বিচরণ করে— মামা এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না।

একদিন আপিস যাওয়ার সময় বিজয়বাবুর চোখে পড়ল, ভাগ্নে নিজের সিটে শুয়ে আছে। একটা বই খোলা বুকের উপর। মামা ভাবলেন, হয়তো ক্লান্তির চোখে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। আপিস থেকে ফিরে এসে তিনি মুরারিকে যে-অবস্থায় দেখেছিলেন হয়তো ঠিক সেই অবস্থায় পড়া শুরু করেছিল। ফলে ক্লান্তির চোটে ওই দশা। কিন্তু টেবিলের উপর ভাত-তরকারি চাপা রয়েছে। বামনঠাকুরকে বলা আছে, মেসে কারো আবশ্যক পড়লে টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবে— সময়মতো যার যখন খুশি খাবে। ঢাকনি তুলে বিজয়বাবু দেখেন, মুরারি কিছু স্পর্শ করেনি।

মামা বিচলিত হয়ে পড়লেন। গোয়ালপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ-দর্শন। আপিস-ফেরত তিনি নিজেও ক্লান্ত। হাতমুখ ধুয়ে টিফিন সেরে অকুস্থলে পৌঁছলেন।

মুরারি তখনও নির্বিকার, গভীর ঘুমে মগ্ন। মামার অস্তিত্ব কি গতিবিধির খোঁজ তার কাছে ছিল না।

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ ভাগ্নের দিকে অপলক তাকিয়ে ডাক দিলেন, "মুরারি—মুরারি।" বেশ কয়েকবার।

মুরারি আচমকা উঠে বসে এবং ঘুম-ভাঙা উচ্চারণ করে, "মামা—!"

— এ কী? তুই এখনও খাসনি? শরীর খারাপ?

— না।

— তবে?

— ক্ষিধে নেই।

— তাহলে শরীর খারাপ।

— না।

কথোপকথনের ভেতর মুরারি এক সময় বলে বসে, "মামা, আমি মুখহাত ধুয়ে আসি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

— জলদি আয়। খাবিনে?

— না। অবেলা অসময়ে না-খাওয়াই শরীরের জন্যে ভালো।

বিজয়বাবু কিছু আশ্বস্ত হন। মনের চতুর্দিকে নানা আশঙ্কা। আবার কি পুরাতন ব্যাধি ফিরে এল? অবেলায় আহার স্বাস্থ্যপ্রদ নয় এতটুকু যার চেতনায় স্বাক্ষর আছে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা অনর্থক।

মেসের উঠানে চৌবাচ্চা। সেখানেই বারোয়ারি স্নানের ব্যবস্থা। একটু পরে মুরারি ফিরে এল গামছায় মাথা মুছতে মুছতে। সে কেবল মুখহাত ধোয়নি, মাথায়ও প্রচুর জল ঢেলেছে। তা মামার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

কে বলবে, ওই ব্যক্তির ভেতর অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার কোনো লক্ষণ আছে? এমনকি মুরারি ঠাকুরকে চা দিয়ে যেতে বললে। এক টিনে মামা-ভাগ্নের বিস্কুট থাকে এজমালি। মুরারি তা খেতে খেতে মামাকে জানায় যে, তার মাথায় কয়েকমাস থেকে একটা প্রশ্ন জেগেছে। এখন মাতুলের সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষ।

বিজয়বাবু অমন কথায় মনে মনে খুব খুশি হলেন। তাঁর পূর্বাশঙ্কা তাহলে অমূলক। হয়তো শারীরিক কারণে মুরারি এতক্ষণ ঘুমিয়েছে এবং কিছু খায়নি।

জলখাবার শেষে মাতুল-ভাগ্নের সংলাপ শুরু হল।

মুরারি। ক'মাস থেকে আমার মনে হচ্ছে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। মানুষও তা হতে পারে।

বিজয়। তা কী করে সম্ভব?

মুরারি। সম্ভব। কেউ কোনোদিন চেষ্টা করে দেখেছে কি?

বিজয়। তা দেখেনি।

মুরারি। তাহলে কী করে আপনি বলতে পারেন মানুষের পক্ষে সর্বত্র বিরাজমান হওয়া অসম্ভব?

বিজয়। খামকা চেষ্টা করে লাভ কী?

মুরারি। খামকা না। চেষ্টা করে দেখা যাক। যদি সফল না হই, তখন বলা যাবে অসম্ভব।

বিজয়। যদি কেউ বলে আমি প্রশান্ত মহাসাগর এক গণ্ডূষে শুষে নেব, তা কি সম্ভব, না বিশ্বাস-যোগ্য?

মুরারি। তা আলাদা ব্যাপার। বিরাজমানতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। আমার মতে চেষ্টা করে দেখা উচিত।

বিজয়। অনর্থক চেষ্টা। সম্ভব নয়। সব জায়গায় যাবি কী করে? তোর কাছে মোটর আছে, এরোপ্লেন আছে, না ট্রেন আছে?

মুরারি। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়ে যাবে।

বিজয়। অনর্থক চেষ্টা।

মুরারি। চেষ্টার পর অনর্থক বলতে পারেন। কেউ চেষ্টা করেনি। আমি মানুষের ইতিহাসে পথিকৃৎ হতে চাই। জনপ্রিয়তার একটি লক্ষ্য; মানুষের মধ্যে সর্বত্র বিরাজমানতা। প্রকৃতি বাদ যায়। তা যাক। মানুষের দিক থেকে জনপ্রিয়তার মধ্যে ঐশ্বরিক বিভূতি আছে। তাই মানুষ জনপ্রিয় হতে চায়।

বিজয়। কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার। তার পক্ষে সর্বত্র বিরাজমানতা সম্ভব। মানুষের আকার আছে। সে একই সময়ে সর্বত্র কীভাবে বিরাজমান হবে?

মামাও সেদিন সহজে ভাগ্নের নিকট হার মানতে রাজি ছিলেন না।

মুরারি। চেষ্টা করলে হবে।

বিজয়। চেষ্টা—?

মুরারি। হ্যাঁ। কেউ কখনও তা করেনি। আমি বলছি, আমি চেষ্টা করব। সফল হব না কেন? একবার ফেল করলে আবার তেড়ে ধরব। এইভাবে সফল না হলে বুঝব অসম্ভব।

বিজয়। খোকা, তোর মাথায় এই খেয়াল কেন চেপে বসল?

কোনো জবাব দিল না মুরারি। মামা নিজের মনে বলে উঠল, "সব জায়গায় যেতে টিকেট লাগে, তা বুঝি তোর হিসেবে নেই?"

ভাগ্নে তারও কোনো উত্তর দিল না। বরং সেই মুহূর্তে মেস থেকে বেরিয়ে পড়ল সর্বত্র বিরাজমানতার সাধনায়।

মুরারি রিপোর্ট দিল ওইদিন রাত্রি এগারোটার সময় বাসায় ফেরে। তার প্রথম পরিকল্পনা: সে শহরের এক ইঞ্চি জায়গা বাদ দেবে না যেখানে তার পা বা হাত পড়বে না। বিকেলে বেরিয়ে সে প্রচুর হেঁটেছে। প্রত্যেক জায়গায় তার উপস্থিতি সে এইভাবে জানান দেবে।

মামা বাধা দিলেন না বা কোনো তর্কে গেলেন না। তিনি ভাবলেন, পুরাতন ব্যাধি, বোধ হয় আবার নতুন আকারে দেখা দিয়েছে।

মুরারির বাড়িতে এসব খবর পৌঁছাল না।

মামার জিদেই সে শহরে পড়াশুনা শুরু করে। এখন সব অপরাধের বোঝা তার মাথার ওপর পড়বে। তাই তিনি স্থির করলেন, কী ঘটে দেখা যাক আরো কিছুদিন। নেহাত বেগতিক কিছু হলে ওকে আবার গাঁয়ে ফিরিয়ে নেয়া যাবে।

তেমন কোনো গোলমাল বাধায় না মুরারি। খেয়ালমতো সে বেরিয়ে যায় আবার আস্তানায় ফিরে আসে। মেসে বিজয়বাবুকে সকলে শ্রদ্ধা করে। তিনি তাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো ভায়োলেন্ট, উগ্র পাগল নয়। মাথায় কিছু ছিট আছে। তাই আচরণ অস্বাভাবিক। নচেৎ মেসে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা নেই তার।

মুরারির লেখাপড়া সিকেয় উঠেছে, তা বলা চলে না। মাঝে মাঝে সে কলেজে যায়, ক্লাস করে। তখন তার মধ্যে পাগলামির সামান্য রেশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বিজয়বাবু তাই ভাগ্নে সম্বন্ধে আশান্বিত। এসব একদিন কেটে যাবে।

কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

মেসে খবরের কাগজ নেওয়া হয়— একখানা ইংরেজি ও একখানা বাংলা দৈনিক। মুরারি প্রথমে সভাসমিতির কলামে নজর রাখে। বড় বড় মিটিং হলে তো আর কথা নেই। সে ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাবে। কিন্তু সভায় কিছু শোনার প্রয়োজন নেই তার। সে এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে! রামঃ, রামঃ! তেমন বান্দা নয় মুরারি। সে সভায় একপ্রান্ত থেকে উজিয়ে আর এক প্রান্তে গিয়ে ঠেকবে। ভিড় থাকলে তা ঠেলে ঠেলেই এগোবে। সভা-শেষে মেসে ফিরে সে মামাকে দেবে রিপোর্ট। মিটিংয়ের নয়, তার নিজের। "যদ্দূর পারা যায় আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা।" এমনধারা মন্তব্য করত মুরারি মামার কাছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাঁ-হুঁ করে তিনি সেরে দিতেন। আবার মাঝে মাঝে সতর্কবাণী শোনাতেন।

— শোনো বাপু, ঈশ্বরের সঙ্গে খামাখা লড়তে চাও কেন?

— কেউ লড়ে না, আমি লড়ে দেখতে চাই!

— অসম প্রতিযোগিতা। কোথায় দুনিয়ার স্রষ্টা আর কোথায় তুমি! কোথায় রাজাভোজ আর...। বাক্য অসমাপ্ত থাকে।

— তবু চেষ্টা ভালো।

— অসম প্রতিযোগিতা আখেরে সব্বনাশ টেনে আনে।

— মামা, ওসব বস্তা-পচা বুলি রেখে দিন।

এমন অবজ্ঞার সুরে মুরারি কোনোদিন গুরুজনের সঙ্গে কোনো কথা উচ্চারণ করেনি।

মামা তো ভাগ্নের সব খবর রাখতেন না। তিনি ছাপোষা কেরানি মানুষ। নিজের চাকরি এবং ঝামেলা নিয়ে মানসিকভাবে ক্লান্ত। কাজেই মুরারির সব হালচালের খবর রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

একদিন মুরারি শহরের জলের ট্যাংকের ছাদের কাছাকাছি পৌঁছে বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছিল। পথচারীরা বিস্মিত, যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা তারা

করছিল। লোক জমে গেল তামাসা দেখতে। শেষে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হল। তারা সে সিঁড়ি বেয়ে মুরারির কাছাকাছি পৌছে নানা আর্জি-মিনতি করে। পরে সুবোধ বালকের মতো মুরারি নেমে আসে। নামাও তো কম বিপজ্জনক নয়। খুব গালাগাল খেয়েছিল সেদিন মুরারি পুলিশের কাছে।

বিজয়বাবু ভাগ্নের এসব কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কারণ, খবর পৌছত না তাঁর কাছে। উপরিউক্ত খবর তিনি কাগজে পড়েছিলেন, "খামখেয়ালি যুবকের কাণ্ড" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে। তিনি ভাবতে পারেননি গুণধর যুবক তাঁর ভাগ্নে। রিপোর্টে নামের উল্লেখ ছিল না।

আর একবার টেলিফোনের তারগুচ্ছের উপর বসে গান গাইতে শুরু করেছিল মুরারি। ইলেকট্রিক তার হলে তো চরম একটা কিছু ঘটে যেত।

বিজয়বাবুর জবাবদিহি ছিল নিজের বিবেকের কাছে। তার পরামর্শেই তো ভাগ্নে আজ শহরে। তবে তখনও তিনি হাল ছাড়ার বান্দা নন। ভাবতেন, ব্যাধি সাময়িক এবং পূর্বের মতো একদিন সেরে যাবে।

কলেজের ছুটিতে বাড়ি যায়নি মুরারি। বাবার চিঠি আসে। মামা উত্তর দেন। বাহানার অভাব হয় না। পরীক্ষা-প্রস্তুতি বা ওই-জাতীয় আর কিছু। গাঁয়ে গেলে ঘুরে বেড়াবে, পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

কিন্তু পরিস্থিতি কূলে ওঠে না। মামা-ভাগ্নের সংলাপ তিক্ত হতে থাকে।

— খোকা, ঈশ্বরের সঙ্গে কী মানুষ পারে?

— হয়তো পারে না। কিন্তু চেষ্টা করে দেখা উচিত। জানো, মামা—।

মামা ভাগ্নের মুখের দিকে তাকায়। ওদিকে বাক্যস্রোত যথা-প্রবাহিত, "আমি আজকাল কোনো বড় মিটিং বাদ দিইনে। সব জায়গায় যাই। সর্বত্র বিরাজমানতার এই এক উপায়।"

কীভাবে? কৌতূহলে মাতুলের প্রশ্ন।

মিটিংয়ে হাজার হাজার লোক জমে। সেখানে তাদের নিশ্বাস মিশে যাচ্ছে। তুমি এক জায়গায় থেকেও আর একই জায়গায় নেই। তোমার নিশ্বাস তখন প্রবাহপথ পেয়েছে, ধেয়ে চলেছে ওই জোয়ারে।

ভাগিনা থামে। সে ফিলজফির ছাত্র এবং ভালো ছাত্র। মামা আর তর্কে প্রবৃত্ত হন না। আপন দুর্বলতা-সচেতন মামা তাই কথার মোড় ফেরাতে বলেন, "খোকা, অসম প্রতিযোগিতা আসলে ভালো নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে বেয়াদবি পাপ। তা আখেরে সর্বনাশ ডেকে আনে।"

— বাজে কথা। আমি কোনো বেয়াদবি করছি না। আমি মানুষ হিসেবে চেষ্টা করছি।

মামা হটে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে বেশি দেরি লাগল না।

সাধারণত যেখানেই যাক, মুরারি রাত্রি দশটা কি এগারোটার মধ্যে ফিরে আসত। মামা নিশ্চিন্ত থাকতেন। অন্তত নিরাপত্তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি তাঁর ভগিনীপুত্র।

শীতের এক রাত্রে মুরারি বিছানা ছেড়ে বাইরে পা বাড়িয়েছিল। মামা আদৌ টের পাননি। মুরারির সেই রাত্রির অ্যাডভেঞ্চার পুলিশ ও অন্যান্য সূত্র ধরে পরে রিপোর্টের আকারে পাওয়া যায়।

মুরারির গায়ে ছিল শুধু সুতি চাদর আর ভেতরে গেঞ্জি। পৌষের শেষ। কিন্তু শীতের প্রকোপ কিছু কম ছিল না। মুরারি পাড়া থেকে বেরিয়ে শহরের রাস্তায় পয়লা দফা না হেঁটে গড়িয়ে-গড়িয়ে গায়ে ধুলো মেখেছিল। পরে চাদর খুলে বগলে তুলে নেয় সে। অত রাত্রে পথে কোনো লোক ছিল না। তবু এক বিরল পথচারী তাকে পাগল ভেবে আর কাছে যায়নি বটে, তবে মুরারির প্রলাপ তথা চিৎকার তার কানে পড়েছিল : "তিনি সর্বত্র আছেন। জনপ্রিয়তার মধ্যে সেই লক্ষণ মেলে, যা সর্বত্র বিরাজমানতার মধ্যেও পাওয়া যায়। আমিও তেমন সর্বত্র থাকব। কেন থাকব না?" পথিক-জন গায়ে গরম কোট চাপিয়েও শীতের জুলুমে কাঁপছিল। তখন তার চোখে পড়েছিল, মুরারির উদোম গা, ধুতি মালকোঁচা-মারা আর চাদর বগলে। পাগলের কাণ্ড দেখার ধৈর্য ছিল না পথিকের। এই রিপোর্টটুকু পুলিশের সংগ্রহ।

শীতের রাত্রি গভীর এবং বিস্তৃত। মুরারি অতক্ষণ কী করছিল, তার সব হদিস তো জানার উপায় নেই। তবে পরিণাম দেখে কিছু কিছু অনুমান করা যায়।

সে মাটির উপর গড়াগড়ি ছেড়ে কোনো এক পর্যায়ে হেঁটেছিল বা দৌড় দিয়েছিল— অথবা এই-জাতীয় কিছু করেছিল, যার ফলে সে তিন মাইল দূরে শহরতলীতে পৌঁছায়। বর্ধিষ্ণু শহরের শিং ষাঁড়ের মতো মাটি গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে এগোয়। শিঙের আগায় ধুলোবালি-ময়লা, অন্যান্য আবর্জনা লেগে থাকা স্বাভাবিক। নগর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। এই এলাকায় বাস করে সমাজেও যারা আবর্জনাবিশেষ— মেথর, মুদ্দাফরাস, দীনদরিদ্র, ছিন্নমূল মানুষ। বস্তি তারাই জাঁকিয়ে তোলে। সেখানে নর্দমা এবং আকাশের মুখোমুখি অবস্থান ঘটে।

মুরারিকে এমন নর্দমায় পাওয়া যায় পরদিন ভোরে। তখন সে মৃত। মেথরপট্টির পালিত শুয়োরের লীলাভূমি এইসব নর্দমা। মুরারির আশেপাশে শুয়োর চরছিল। পোস্টমর্টেম থেকে জানা যায়, ওর শরীর থেকে অনেক রক্ত ঝরেছিল। দেহের কয়েক জায়গায় জখম। অনুমান করা যায়, পুলিশেরও তাই ধারণা, কোনো দাঁতাল শুয়োরের চারণভূমিতে মুরারি অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়েছিল। জন্তু তাকে আদৌ শ্রদ্ধা দেখায়নি।

মুরারির জীবনের শেষ অঙ্ক এমনই অনুমানের ব্যাপার হয়ে রইল। ছোট মানিব্যাগে-রক্ষিত চিরকুট থেকে ঠিকানা পাওয়া যায়। ভোর থেকে উৎকণ্ঠিত বিজয়বাবুর কাছে সব খবর পৌঁছায় সন্ধ্যায়— পুলিশের কল্যাণে।

অনেককাল পূর্বের ঘটনা।

অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার কথা।

কেবল আজও মুরারি আমার স্মৃতির রাজ্যে সর্বত্র বিরাজমান।

আবু রুশদ

ছিনতাই

শুক্রবার বিকেলের এলিফ্যান্ট রোড। চলমান পথিকের সংখ্যা কম। তবে মোটরগাড়ির বেহায়া বিজ্ঞাপন নূতন-বিজ্ঞানের প্রকোপ প্রকট করে তুলেছে। ক্রিম রঙের ২০০ মার্সিডিজ-এ উৎকট হলুদ রঙের পর্দা ভেতরের আব্রু রক্ষা করবার জন্য যেন কোনো অনাচার-ক্লিষ্ট মনের উদ্ভাবন। সদ্য-আমদানি করা এক চকোলেট রঙের টয়োটায় রেডিওর অস্তিত্ব বাইরে লতার মতো হেলানো নূতন কালো এরিয়ালে অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট।

চালক, দেখা যায়, বেশির ভাগই নবীন যুবা। তবে কোন বেকুবে বলবে বাঙালি তরুণের নম্রতা বা সৌজন্য তাদের চেহারায় বা দৃষ্টিতে। পরিপুষ্ট মুখে এক বেলুচি কাঠিন্য; হিপি জুলপি ও আকস্মিক ভল্লুক-গুম্ফে এক আন্তর্জাতিক চমক ও আরণ্যক সংকল্প তাদের সহজেই দৃষ্টি-গ্রাহ্য করে তুলেছে।

বিপণির নামকরণে কিন্তু বাঙালি উচ্ছ্বাস। যদিও বিদেশি সওদা তাদের মালিকের সমকালীন বৈষয়িক ধূর্ততার নমুনা। কী চান আপনি, বলেন? মুদ্রাবান হলে প্রায় সবকিছুই পাবেন। 'বুটিক'-এর শার্ট, অভিজাত টাই, ইয়ার্ডলি সাবান, রেভলনের লিপস্টিক, নিখুঁত এক আধুনিক ডিজাইনের আরামকেদারা, টেলিভিশন ক্যামেরা, রেকর্ড প্লেয়ার, থ্রিইন ওয়ান, জর্জেট শিফন মাদ্রাজি শাড়ি।

আর আপনার সচ্ছল সংসারে যদি কঠিন অসুখে পড়ে কেউ রুচি-বিকৃতির পরিচয় দিয়ে থাকেন, ঘাবড়াবেন না। দুর্লভতম ওষুধটাও পেয়ে যাবেন। সব দোকানে নয়। দু-একজন কেমিস্টের নাক এখনও একটু উঁচু রয়ে গেছে। তারা দামের ব্যাপারে বেশি এদিক-ওদিক করতে পারে না। তবে বাঘাটে কেমিস্টও পাবেন যিনি সে-ওষুধটা সহাস্যে আপনাকে দেবেন যদি আপনি হাসিখুশি ধরনের দাম দিতে রাজি হন আর কথা বেশি না বলেন।

মাঝখানের আশেপাশের বস্তিগুলোই বিপাক বাধায়। বদ্ধ নর্দমায় কীট-কলোনির মতো তারা কিলবিল করে। কোনোই সুঠাম ভাব নেই বা আলাদা এক আকৃতি। ইত্যাদি ও প্রভৃতির মতো চুলকানি ও পাঁচড়া ও উকুন ও ন্যাকাটি পেটের ঝোলায় তারা নামহারা। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'ও তারা বোধ হয় চোখ তুলে কখনও দেখে না।

পি.জি হাসপাতালের দালানে নূতন বিপণি-বিতান পটুভাবে পট বদলায়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ কোনো বিদেশি আগন্তুকের কক্ষে কিছু আমোদিত প্রহর কাটিয়ে অষ্টাদশী রাহেলা বা সালেহা বা জমিলা বিলাসী পণ্যের দিকে নূতন সম্ভাবনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেউ-বা সাহস করে ভিতরে ঢুকে দু-একটা পছন্দসই সওদার দাম করে— গ্রামীণ কলহাস্য ও বিদেশি আগন্তুক-অভিনন্দিত পাছার দোলানি বাইরের পথচারীকে উপহার দিয়ে।

তবে কেন্দ্রীয় এক ঘটনার মতো পথের বাঁকটা প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পরে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। শাহবাগ অ্যাভিনিউর মাঝখানের ফোয়ারাটা বিকল হয়ে পড়েছে। ভরা-পানি যা আছে তা সন্ধ্যার বিজলিবাতির বিজুরিতে খোলতাই হবে, তবে বিকেলের রোদে একটু গদ্য-গদ্য ভাব। অধিকাংশ যানবাহন কোনো কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লোমহর্ষক দ্রুততার চলন অব্যাহত রেখেছে, তবে ডানদিকের একশ গজ জুড়ে মোটরগাড়ি, বাস, বেবিট্যাক্সি, রিকশা এক অস্বাভাবিক ব্যাসের সৃষ্টি করেছে। তাদের আরোহী ও চালক প্রত্যেকের মুখে আশু এক কর্মতৎপরতার কঠিন সংকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে জটলা করে পথচারীরা এসে জড়ো হয়ে সে ব্যাসের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলছে ও আসন্ন নাটকের পটভূমি তৈরি করছে।

— না! এর একটা বিহিত করতেই হবে, এটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। পুরু কালো ফ্রেমের চশমা পরা মাস্টারি চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক চোখের ঈষৎ-রক্ত তারাকে রাগের দ্যোতনায় নেকড়ে-কুটিল করে বলে।

সর্দির তাড়নায় নাক থেকে অবিরত পড়া নোনতা পানিকে কিছুটা জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে কিছুটা হাত দিয়ে মুছে এক মিশকালো রিকশা-চালক অনির্দেশ্য এক লোকের দিকে অব্যবহৃত বাঁ হাতটা বাড়িয়ে কী এক কল্পিত তামাসায় হাসতে থাকে আর হেঁক হেঁক করে কেশে শিক্ষিত বাংলায় বলে : ধর শালাদের ধর, পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে দে, শালারা হাইজ্যাক করার তালে আছ, হারামির পোলা।

ততক্ষণ বেশ প্রশংসনীয় তৎপরতা ও নিপুণ পন্থায় ছিনতাইয়ের কাজটা সম্পন্ন হচ্ছিল। এক ছোট্ট ছাই রঙের ফিয়াট থেকে নেমে তিনজন তরুণ মিলিটারি ধরনে গুরুত্বপূর্ণ কোণগুলো দখল করে এক ল্যান্ডরোভারকে থামায়। তারপর দরজাটা অনুশীলিত দ্রুততার সঙ্গে খুলে ড্রাইভারকে মস্ত এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে পাশের আরোহীর হাত থেকে মাঝারি ধরনের এক সুটকেশ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে পেছনের আরোহীর কাছ থেকে আচানক বাধা পায়। পূর্বপরিকল্পিত ক্রিয়া সম্পাদনার আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি এমন এক বাধা পাওয়ায় তরুণটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায়, যেন দৈনন্দিন এক অনুত্তেজিত কাজ করছে, স্টেনগান উঠিয়ে পেছনের আরোহীকে তাৎক্ষণিক পটুতায় গুলিবিদ্ধ করে সুটকেসটা পেশাগত স্বাচ্ছন্দ্যে ছিনিয়ে নেয় : তার লোম-ধনী হাতটা সুটকেসবহনকারী জিন্দা আরোহীর হাতে লাগলে কাপুরুষ নাগরিক খরগোশের মতো কাঁপতে থাকে। তিন মিনিটে নিজেদের কাজ

সেরে তিনজনই চারপাশে জমা পথচারীদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ফিয়াটে চড়ে ঢাকা ক্লাবের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে সবেগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের দিকে ধাওয়া করে, কিন্তু হঠাৎ একটা টায়ার ফেটে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গাড়ি ফেলে রেখে দুজন রমনা পার্কের দিকে আর একজন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে দৌড় দেয়।

এদিকে ল্যান্ডরোভারের পেছনের সিট নিহত আরোহীর রক্তে কালচে লাল হয়ে ওঠে আর ড্রাইভার ও তার পাশে-বসা আরোহী কেমন উদভ্রান্ত চোখে কৌতূহলী ও ক্ষিপ্ত জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

কে একজন জিগ্যেস করে,— সুটকেসে ছিল কী সাহেব?

— টাকা। ড্রাইভারের পাশে-বসা আরোহীটা ঘোলা চোখে বিশেষ কারুর দিকে না চেয়েই বলে।

— টাকা নয়তো কি মার্বেল ছিনতাই করতে এসেছিল? টাকা ছিল কত?

— তিন লাখ।

— কী মজা, শালা আমি পেয়ে গেলে ধানমণ্ডিতে একটা বাড়ি কিনে ফেলতাম। তারপর আমার ঠাট দেখে কে!

কোনো এক কোনা থেকে ছুড়ে মারা এই বিদগ্ধ মন্তব্যে সমবেত জনতার মধ্যে আমোদের এক সাময়িক হিল্লোল খেয়ে যায়।

দূর থেকে একজন চিৎকার করে বলে; সুটকেস হাতে ছোকরাটাকে দেখতে পাচ্ছি। রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি চললাম শালাকে ধরতে। আপনারাও আসুন।

আর নিমেষে ওলটপালট কাণ্ড। জনতার প্রায় সকলে লোকটার দিকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়। শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না, চলন্ত এক মোটর প্রচণ্ড আকস্মিকতায় ব্রেক কষে বিকট এক শব্দ করে থেমে পড়ে, ঠেলাঠেলিতে কয়েকজন রাস্তা থেকে ছিটকিয়ে ফুটপাথে নিক্ষিপ্ত হয়। হাঁচিতে গর্জনে হাসিতে ও ত্বরিত বেগে জনতা নিজেদের সম্মিলিত বাড়ন্ত রাগকে এক মানবীয় মুখোশ পরতে দেয়।

— কোথায়, কোথায় লোকটা?

— ওই যে। হাতে সুটকেস দেখছেন না।

— সুটকেস দেখছি, তবে লোকটার তাড়া আছে বলে মনে হয় না। স্থির গতিতে চলেছে।

— হারামজাদার হাতে স্টেনগান আছে, তাই অত সাহস। ওরই স্টেনগান দিয়ে এবার ওকে মারব। এবার দেখি তুমি কোথায় পালাও।

বর্ণালি সব হাওয়াই শার্ট আলোতে চমকায়। মাথার চুল ঝুলপি গোঁফ, পায়ের বিবিধ আকৃতি, দৌড়াবার বিভিন্ন ধরন, পায়জামা প্যান্ট ও লুঙ্গির উঠতি পড়তি হাঁপানি ও হিক্কা বিকেলের বিশেষ নম্রতায় ও স্মিত প্রাঙ্গণের বিস্তারে তামাটে শালগাছের পশ্চাদভূমিতে ও সামনের মন্দিরের চূড়ার আশ্বাসে সহসা এক কেন্দ্রীয় অর্থে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

জনতা সামনের দিকে প্রচণ্ড ভাবে-উত্থিত এক সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো এগুতে থাকে। তার বিস্তারিত ও বলবান বাহুতে যেই আটকা পড়ুক না কেন ভয়াল ক্ষিপ্রতায় সে অমোঘভাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

— ধর শালাকে ধর, এবার দৌড়াতে আরম্ভ করেছে। দেখি কত দৌড়াতে পারে।

হঠাৎ তাকে কেন্দ্র করে নিত্যবাড়ন্ত এক জনতার মারমুখী অভিযান দেখে যুবকটা একেবারে হকচকিয়ে যায় আর নিজের স্বাভাবিকত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে উন্মাদের মতো দৌড়াতে থাকে। আচানক ভয়ে তার নাড়ি পর্যন্ত ক্রিয়ারহিত হয়ে যায়, সম্বিত তো সম্ভ্রান্তভাবে আলাদা।

কিসের জন্য জনতা তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে খেঁচিয়ে মারমুখী হিংস্রতায় এগিয়ে আসছে। সে করল কী! তার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। তার মাছুম চোখ অব্যক্ত এক আশঙ্কায় ভরে গিয়ে তাকে সাময়িকভাবে ব্যক্তিত্বহীন এক ত্রাসে রূপান্তরিত করে। তার বুকের লৌহপিঞ্জরে তার তড়পড়ানো হৃদয় কিছুটা স্বস্তি পাবার জন্য কেমন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে।

তাকে কী ঠাহর করেছে জনতা? চোর, পকেটমার! তাকে মারবার জন্য, ছিঁড়বার জন্য ক্ষিপ্ত জনতা হাজারে হাজারে তার পেছনে ধাওয়া করা আরম্ভ করে দিল কিসের প্ররোচনায়? যুবকের স্বাভাবিক চিন্তা-ক্ষমতায় কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। পা-টা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আসতে চায়। আক্রমণের কারণ একেবারে জানা না-থাকায় বোধহীন আতঙ্কে যুবকের উচ্চকিত চেতনা ভরে যায়।

— আপনারা সকলে আমাকে তাড়া করছেন কেন? আমি তো কিছু করি নাই।

জাগ্রত আশার মন্ত্রণায় যুবক জনতার ন্যায়বোধের কাছে আবেদন করা মনস্থ করে।

— কিছু করে নাই! কিছু করে নাই! শুধু একটা লোককে খুন করেছে আর সুটকেসে তিন লাখ টাকা নিয়ে পালাচ্ছে।

— স্বাধীনতা পেয়েছ বলে শালা লোক খুন করবে, বাহনচোদ টাকা ছিনতাই করবে। তোমাকে মেরে একদম গুড়গুড়িয়ে দেব-না!

— অনেক সয়েছি, আর না। কেউ যখন কিছু করবে না, আমরাই এর বিহিত করব।

বাড়ন্ত রোষের তাড়নায় জনতা দ্রুততর গতিতে ধেয়ে যুবককে প্রায় ধরেই ফেলেছিল যদি মাঝখানে জনতার একাগ্রতায় আকস্মিক এক ছেদ না পড়ত।

রমনা পার্কের কাছ থেকে কোলাহল ও গুঞ্জন এই পর্যন্ত ভেসে আসে আর তামাটে শালগাছ হঠাৎ আগুনের হলকায় সাময়িক এক রোশনাই ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য আগুনের তাপে কিছুটা জ্বলতে থাকে।

দূর থেকেও জনতা দেখতে পায় পরিত্যক্ত মোটরগাড়িটা আশেপাশে আগুনের লেবাশ পরে মাঝখানে একেবারে পোড়া কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। সে দৃশ্যই জনতার একাংশের কাছে বেশি নয়নাভিরাম মনে হয়। হল্লা করতে করতে তারা সে-দিকে ছুট দেয়। কিন্তু জনতার সামনের সারি নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় না। কলগুঞ্জনে ও পরিত্যক্ত মোটরটাকে আগুনে পুড়তে দেখে তারাও অবশ্য কিছুক্ষণের

জন্য পেছন ঘুরে চেয়েছিল তবে মানুষ-শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরায়। সেই অবসরে যুবকটা প্রায় পাঁচশ' গজ দূরত্বের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধান রচনা করতে পেরেছিল। তা দেখে ধাবমান জনতা আরও দৃঢ়সঙ্কল্প ও ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকের দিকে বিপুল বিক্রম ও বেগে এগুতে থাকে।

জনতার আকস্মিক নীরবতা ও পাগলা ঢেউ-এর মতো উল্লসিত অগ্রগতি যুবককে আবার নূতন করে তার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সন্ত্রাসের সঙ্গে সচেতন করে তোলে। তার মাথার চুল বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে তার ধাবমান ও ত্রাসপিষ্ট শরীরের স্পন্দিত মীড় হয়ে; তার ছানাবড়া চোখদুটা আসমানের অঙ্গনের দিকে চেয়ে খামাখাই কার যেন করুণা ভিক্ষা করছে।

আর ঠিক সে সময় ঘুঘু দেয় এক ডাক। বড় উদাস মধুর। ভেতরের কোনো খবর যেন দিতে চায় অতীতের অনেক বিচ্যুতির ডাকহরকরা হয়ে।

যুবক তখন নিশ্চিত বোঝে তার আর পরিত্রাণ নেই। উদ্যত বন্যতায় মরণছোবল মারবার জন্য ভুল নিশানার দিকে তারা ধাওয়া করেছে, ওই যুক্তির কথা বলে জনতাকে এখন নিরস্ত করা যাবে না। পুরো দম দেওয়া এক যন্ত্রের মতো ছাড়া পেয়ে তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কোনো মাস্টারি হাত কোথাও দেখা যায় না।

তবু যুবক একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। উচ্চলম্ফনে অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব দেখিয়ে যুবক বেড়াটা এক ফুট ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যায়। বাঙলা একাডেমি এখন প্রায় মুখোমুখি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশেই শিল্প ও চারুকলার মহাবিদ্যালয় তার অস্তিত্বকে মৃদুভাবে জাহির করছে। সেখানেই সে যাচ্ছিল নাসিমার সদ্য-সমাপ্ত প্রতিকৃতি নিয়ে। সস্তা বাদামি রঙের প্লাস্টিকের ব্রিফকেসটা এখনও হাতে রয়ে গেছে। সেটা পালাবার এক অতিরিক্ত কারণ। প্রতিকৃতিটা যেমন করেই হোক একবার নাসিমাকে দেখাতে হবে। একই মহাবিদ্যালয়ে নিচু ক্লাসে পড়া এই মেয়েটিকে যুবকটি কোনো গণিতের ধারায় না গিয়েই হৃদয়মন দিয়ে বসে আছে। বড় জনপ্রিয় নাসিমা। প্রায় সব ছাত্র আর দু-একজন মাস্টারও তার পেছনে হরদম ধাওয়া করছে। কিন্তু গত সপ্তাহে নাসিমা যুবকের হাতে এক গোলাপফুল উপহার দিয়েছিল। আজকে তার প্রতিকৃতি নাসিমাকে দিয়ে চমকে দেবে বলে যুবকের বড় সাধ ছিল।

নাসিমা বলেছিল প্রায় প্রতি ভোরে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ধানমণ্ডি লেকের দিকে বেড়াতে যায়। তাই একদিন ভোরের আজানের পর পরই তাদের টিনের বাসা থেকে বেরিয়ে যুবকটি ধানমণ্ডি লেকের দিকে পুরো পথ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হেঁটে এসেছিল।

দেখাও হয়েছিল। নাসিমার বান্ধবীটি সুলোচনা বটে তবে কালচে পাড়ের হালকা পীতরঙের এক শাড়িতে নাসিমাকে জবর দেখাচ্ছিল। ভোরের হাওয়া তখন আবার একটু ইয়ারকি দেওয়া আরম্ভ করেছে। আর এক কোকিল মুখ খুলবার পরে অন্য এক বেল্লিক কোকিল তার সঙ্গে তাল রেখে ভোরের বাড়তি-আলোর আসমানকে অঢেল

সুধায় ভরে দিয়েছিল। আর সম্রাট-সূর্য পুরন্ত লালিমায় আসমানের এক কোণকে একেবারে বশ করে ফেলেছিল।

নীরব ছোবলানিতে দলিত মর্দিত হয়ে জনতা অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে। শরীর আর যুত পায় না, পা আর উঠতে চায় না। শুধু নাসিমার পরিপুষ্ট স্তন চোখের সামনে পরিষ্কার রেখায় ভেসে ওঠে। যেন তাতে সমস্ত পিপাসার সমাধান, মোক্ষম এক শান্তি।

পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। চালককে ভদ্র ও সদাশয় মনে হয়। মরিয়া হয়ে তার সামনে শেষ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে যুবকটি গাড়িটাকে থামায়। চালককে আশু আবেদনের সমস্ত আর্তি দিয়ে বলে : আমাকে একটু উঠতে দেন, নইলে ও লোকরা আমাকে খামাখাই মেরে ফেলবে। বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে না বাঁচালে আমার মা-বাপ বড় কষ্ট পাবে।

হুঙ্কার দিয়ে জনতা ছুটে আসছে।

চালকের পাশে বসা তরুণী সহোদরার মমতায় বলে— নাও না তুলে, দোষ যদি কিছু করে থাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হবে।

— পাগল হয়েছ! তাহলে ওরা আমাদেরকেও পিটিয়ে শেষ করে দেবে।

যুবকটি গাড়িটা দ্রুত চলে যেতে দেখে আর এই প্রথমবারের মতো পিঠে কার যেন স্পর্শ লাগে। তার পরেই জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে।

যখন তার শরীরের উপর দিয়ে এক এক করে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটে যায় তখন যুবকটি চরম বোধনের অপ্রাসঙ্গিকতায় ভাবে...

ব্রিফসেকটা ছিঁড়ে তচনছ হয়ে গেছে, যুবকের মগজের কিছুটা কিন্তু নাসিমার দুমড়ানো প্রতিকৃতির সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব পেয়েছে।

— এ যে দেখছি মেয়ের এক ছবি, টাকা কই? জনতার একজনের আর্ত জিজ্ঞাসা। আর একজন অনেকটা অনিশ্চিত ধরনে মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে : শালা কারে পাকড়াও করলাম কে জানে। শালার বিচিটা যখন ছিঁড়ে দিচ্ছিলাম বাবু বলে কী : ছেড়ে দাও ভাই, বড় ব্যথা লাগে। আরে আমি শালা ওর ভাই হলে তার ওই জিনিসটা ছিঁড়তে যাই নাকি? বেটা অগারাম কোথাকার!

সোমেন চন্দ

ইঁদুর

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর-তর করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনো বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোনো বাক্স বা কোনো ভারি জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ংকর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুটখুট টুংটাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে, এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্ত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনও কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হব না, না-ও থাকতে পারে।

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটি ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি ভয়ে চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন; আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম, তখন প্রায়ই মামাবাড়ি যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে এসে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাপলাফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনও

উপুড় হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনই আবার কেবলই মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড়ে দিল! আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে দিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণির নয় বলে আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না, অন্তত সেরকম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনও জাগেনি!

সেই ছেলেবেলার বন্ধুরা মাঠে গরু চরাত। তাদের মাথার চুলগুলো জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রং বাদামি, চোখের রংও তাই, পাগুলো অস্বাভাবিক সরু-সরু, মাঝখান দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরনে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলো লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণির সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না! তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, আমার মুখ লাল হয়ে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ভীম, সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটি প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'সুকু, তোমার গায়ে ছুড়ে মারব?'

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম, ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল, আস্তে-আস্তে বুদ্ধিমানের মতো দূরে সরে গিয়ে বললাম, 'দ্যাখ ভীম, ভালো হবে না বলছি, ভালো হবে না! ইয়ার্কি, না?'

ভীম হি-হি করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, 'এই দিলাম, দিলাম—'

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজও অবাক লাগে। অনেকের এমন স্বভাব থাকে— যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটোখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোনো প্রভাব আছে কিনা বলতে পারিনে।

একথা আগেই বলেছি যে আবার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশি। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নিচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিল। সে থেকে থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিল, ছড়ানো কাপড়ের উপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে গিয়ে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললেন,

— 'সুকু, সুকু।'

প্রথম ডাকে উত্তর না-দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

— 'সুকু? সুকু?'

এবার উত্তর দিলাম, 'কেন?'

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড়ো করে বললেন,— 'ওই দ্যাখ্!'

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কী। এত ইঁদুর কেন? পরম শত্রু কি কেবল আমরাই। আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি, অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আহা, ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।'

— 'খেয়ে ফেলবে না তো!'

— 'আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই।'

— 'মা, তুমি যা ভিতু!'— ইঁদুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিল। বললাম, 'আচ্ছা মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পার না? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে।'

— 'আহা, মেরে কী হবে? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো। আর কল আনতে পয়সাই-বা পাবেন কোথায়?' মা-র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হল না, কোনো বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তা হলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরনের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নিচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশপাশে ছড়িয়ে আছে, তারা ফিস ফিস করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি এ নিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু আবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনও বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, দুই-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়োলোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের 'পরশ-পাথর' কবিতা পড়ে ভেবেছি : ইস, একটা পরশমণি যদি পেতুম! সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে সত্যিই জিগ্যেস করে বসেছি, 'আচ্ছা, পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায়? কোথায় পাওয়া যায় বলবে?'

আমি যখন ছোট ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলোর নির্মল দেহে তখনও অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনও ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে, তখনও অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সেসব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করব না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ইনি, বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধে হয়েছে এই যে, পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অকটোপাস থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায়? ইঁদুররা আমায় পাগল করে তুলবে না? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স বা ভাঙা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুং-টাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা বিশ্রী সংগীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন, অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা বিশ্রী সংগীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না-হয়ে যায় না! ইঁদুরগুলোর কার্যকলাপও আমার কাছে সেরকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, 'সুকু! সুকু!'

বলেছি তো, প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, 'সুকু!'

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না-করে নিজেকে মা-র কাছে যথারীতি স্থাপন করে তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকে তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম, আমাদের কৃচিৎ-আনা দুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটা সাদা পথ তৈরি করে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোনো বিশেষ খবর শুনে কোনো বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম, আমার মা-র পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টলটল করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন।

দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনও দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোনো কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। মা-র ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিল, আরও গভীর করে তুলল। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচুর অগ্নিবর্ষণ করছে, নিচে পৃথিবীর ধূলিকা আরও বেশি অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতও পুড়ে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকাও দেখা যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকাও দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলি অমূল্য। সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণব্রতী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। (তখনও ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনও শুরু হবে!) আমার মুখভঙ্গি

চিন্তাকুল হয়ে এল, হাঁটু দুটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম— ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে— ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন— যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়,— 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!'

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারি জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃত-প্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম এই ভেবে যে, ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা যার কোনো পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে, তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শিগগির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন : 'তোমরা পেলে কী? কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি? আমি কি মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফুর্তিতে মেতে আছ! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও? নইলে টিকে থাকাই দায় হবে!'

আমার কাছে বাবার এই ধরনের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরনের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে বলে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায়নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝখানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, 'আর তর্ক কোরো না বলছি! এখান থেকে যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!'

মা বললেন, 'অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে!'

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়ল— 'তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগি'...। বাবা বিড়বিড় করে আরও কত কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম অসাড় মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুল, বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোনো কথা লেখা ছিল না। মনে হল যেন আজ

এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলো চরম প্রহরী সেজে আমার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনিনি। তবু আমার অনুভূতির এই শিক্ষা কোত্থেকে এল? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি চুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রস গ্রহণ করেছে যাতে টুঁ শব্দও হয়নি। ফুলের সুবাস যেমন নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখের পাখাদুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়েনি। আরও বলতে পারি, আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজকাল দিলে কই? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হল, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিল জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কানা করে দিল। আমি কী করব? আমার কিছু করবার আছে কি?

— 'শয়তান মাগি, বেরিয়ে যা!'

আবার ভেসে এল অদ্ভুত কথাগুলো। এসব আমি শুনতে চাইনে, তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কানের ভিতর ঢুকবে; আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

— 'যা বলছি!'

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল।

কিছু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, 'সুকু! সুকু!'

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হল, ভয় করল, তবু আস্তে বললাম, 'বলো?'

মা বললেন, 'দরজা খোল্।'

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হল এই ভেবে যে, এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে।

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হল না। মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের উপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করল। কেমন অসহায় দেখাল ওঁকে। ছোটবেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনও শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ; রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশির দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মতো ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কত শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারত, আজ লন্ডনের কোনো ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোনো খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাচনা করছে! এমন তো হতে পারত, তার সোনালি চুল, দীর্ঘ পক্ষ্মাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ— আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? সে এখন কই... আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ওই ঠাণ্ডা মেঝের উপর সামান্য কাপড়

বিছিয়ে শুয়ে! এখান থেকে কত ছোট আর কত অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মা-র দিকে তাকালুম।

ডাকলুম 'মা? ও মা?'

কোনো উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনো ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করল না। ঘুমিয়ে পড়েননি তো?

পরদিনও আবহাওয়ার গভীরতা কিছুমাত্র দূর হল না। মা-র এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আশকারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। স্কুলহীন ছোটবোনটি তার নিত্যকার অভ্যাসমতো প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে চাইবারও সময় নেই।

সেদিন অনেক রাতে সারা বাড়ি গভীর ধোঁয়ায় ভেসে গেল, সকলের নাক-মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে এল। ছোট ভাইবোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে জিগ্যেস করলুম, 'এখনও রান্না হয়নি, মা?'

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বললেন, 'না। এখন চড়াচ্ছি।'

— 'এত দেরি হল কেন?'

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিস সহজে এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,— ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোনোরকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি তবে সারাজীবন লিখেও শেষ করতে পারব না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলো একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর শৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণি কারা? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছু লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন— প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশায় করেন— ঘরে অতি শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েকে অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন— শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনও পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এছাড়া আর উপায় কী? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে, দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে

থাকে তবে তা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম : 'এরা কে জান? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে এরাই তাই। এরা তৈরি করেছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখে না! পেটের ভিতর সুচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নেই। পরিহাস! পরিহাস!...'

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা তাদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংবাদযাত্রার পথ বেয়ে বেয়ে কোনো রকমে কালাতিপাত করছেন, তাদের জন্য করুণা যেমন হল, মনে-মনে পুজো করতে লাগলুম আরও বেশি।

কিন্তু সেসব ক্ষণিকের ব্যাপার! শরতের মেঘের মতো যেমনি এসেছিল তেমনি মিশে গেল। মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিল, বেশিদিন থাকবার ঠাঁই হল না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকত, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জরিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলাম। সেই দুপুরটিকে যা ভালো লেগেছিল কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হল যে, চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে দিল। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়ে-পুরুষের মিলিত চিৎকারধ্বনি পৃথিবীর পথে পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাকটর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে— অবাধ্য জমিকে ভেঙেচুরে দলে-মুচড়ে সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি হল। একদা যে বাতাস মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায় পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শোনে তাদের নমস্কার।— তাই অলস মধ্যাহ্নকে মধুরতর মনে হল। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইটের টুকরো নিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে। কোনো বাড়ি থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, সংগীত-পিপাসুর বেসুরো গলায় গান শোনা যাচ্ছে, হারমোনিয়াম সহযোগে এই অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও-বাড়ির এক বধূ রাস্তার কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ির ভিতর ঢুকল, দুটি মজুর কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লামলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ দৃশ্য বড়ো মধুর লেগেছে— অবশ্য কোনো

বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র বলে নয়। এ চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভালো লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছি বলে। চমৎকার! চমৎকার!

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার শুরু হল। ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি শুরু করে দিল, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করে দারুণ উপহাস করতে লাগল।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, 'ওরে মন্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ্ বাবা, ওঠ্!'

মন্টু উঠেই প্রাণপণে চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপন্যাসের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল, এখন বই-টই ফেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

— 'ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয়!'

বারবার ডাকেও ছবি টুঁ শব্দটি করে না।

মা ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'আমার কী দোষ বল? আমার ওপর রাগ করিস কেন? গরিব হয়ে জন্মালে...'

মা-র চোখ ছলছল করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ করে বললুম, 'আহা, ও না খেলে না-খাবে, তুমি ওদের দাও না?'

মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, 'কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছ?'

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে! ভারী চমৎকার মনে হল, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বউকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সংগীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

— 'কনক? ও কনক?'

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না, কোনোবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনোবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটল।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক সাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরি কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তার এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও-বাড়ির ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙল, তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে

ভালোভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালনে যে সংগীতের সৃষ্টি হয়, সেই সংগীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি লক্ষ করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুন গুন সুরে গান গাইতে লাগলেন; চমৎকার মিষ্টি গলা বেহালার মতো শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলো আরও সাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষরাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক রোজকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধুর ও গভীর আর কখনও শুনিনি। তাঁর মৃদু-গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে গেল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন কার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ির ইটগুলিও কাঁপছে।

বাবা বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই, উঠুন। আর কত ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কি? উঠুন।

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে! বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনও হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে খুলতে বাবা বললেন, 'পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছ, সকলের ভোরে ওঠবার অভ্যেস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যেস ছিল! আমরা যত ভোরেই উঠি-না কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমি-জমা অত টাকা-পয়সা করে যেতে পারেন! তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিতমশাই, যারা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কক্ষনও উন্নতি করতে পারে না।'

অতটা মাতব্বরি সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়ি-সুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন!

সমস্ত বাড়িটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল।

ওদিকে মন্টু সেলুনে চুল ছাঁটাবার জন্য পয়সা চাইতে শুরু করেছে, ঘণ্টাখানেক পরেও পয়সা না-পেয়ে মেঝেতে আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পক্ক-পক্ক বাক্য বর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে! ছবি এইমাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়নঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠেছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর-ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছে এসে বললেন, 'তোমরা থিয়োরিটা বার করেছ ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওসব ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হল লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিতমশাই?'

আমি মনে-মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমনভাবে বলেন যে মনে মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কী জানি কেন ধারণা হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল। নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ-আবিষ্কারে মত্ত!

আবার বললেন : 'তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয়নি, কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড়ো সাধু ছিলেন, যেমনি টলস্টয় ছিলেন। কিন্তু ওঁরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি? কক্ষনও নয়!'

বলতে ইচ্ছে হয়, চমৎকার! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। কিন্তু একবার যা বললেন তা ভুল হলেও তা থেকে একচুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বঙ্গসন্তান ভূভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে, এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সিরিয়াস নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের উপর দুই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার উপর দিয়েই ঘন ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা-দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত বিশীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, 'নারু, বাবা, তোমার কী চাই বলো?'

নারু তার ছোট-ছোট ভাঙা দাঁতগুলো বের করে অনায়াসে বলে ফেলল, 'একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভট ভট করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা?'

কিন্তু মন্টুর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছনে ফিরে মুখটা নিচের দিকে নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, 'বাবা, এই দ্যাখো।'

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বাঃ বেশ তো হয়েছে, মন্টুবাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানালা হয়ে গেল, বেশ তো হল। এবার থেকে হু হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না?'

মন্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হেসে উঠল; নারু তার ভাঙা দাঁত বের করে আরও বেশি করে হাসতে লাগল, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠল, গুম গুম করতে লাগল।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম আনন্দের এই নির্মল মুহূর্তগুলো যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হল রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, 'আজ কী রাঁধবে গো?'

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেসে মা বললেন, 'তুমি যা বলবে!'

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল— 'আমি যা বলব, ঠিক তো? বলি, রাঁধবে মাংস, পোলাও, দই সন্দেশ? রাঁধবে চাটনি, চচ্চড়ি, রুই মাছের মুড়ো? রাঁধবে? রাঁধবে আরও আমি যা বলব?'

— 'ও মাগো, থাক থাক, আর বলতে হবে না।' মা দুইহাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল-খিল করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচকি হাসতে দেখে বললে, 'মাগো, কী হয়েছে? অমন করে হাসছ কেন? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে?'

— 'আরে, নারে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেলগে যা—' বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, 'আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে?'

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, 'আমার ওসব মনে-টনে নেই।'

— 'আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গরু চরাচ্ছিলে?'

মা-র চোখ বড় হয়ে গেল— 'ওমা, আমি কী ভদ্দরলোক নই গো যে মেয়েলোক হয়েও মাঠে-মাঠে গরু চরাব?'

— 'গরু চরানোটা কি অপরাধ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দোষ হয়? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে, ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছ।'

— 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে।'

মৃদু মৃদু হেসে বাবা বললেন, 'নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে একটি মাত্র দীপশিখার মতো; নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ির দিকে উঠে চলে যাচ্ছে না, বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে, মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে। কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।'

বাবা হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে বললেন, 'তোমার কী চাই— বললে না?'

— 'আমার জন্যে একখানা রান্নার কাপড় এনো।'

— 'লাল রঙের।'

— 'হ্যাঁ।'

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখিনি, কিন্তু নিজের জন্যে ছ-আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ-আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া বলে কুকুরের আশঙ্কাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানিনে, তবে কয়েকদিন পরেই জুতো জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য!

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে-ইয়ার্ডের উপর দিয়ে যেতে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার, হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিল এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গম্ভীরভাবে শশধর বলেছিল, 'দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিল।'

— 'কেন?'

— 'শালা বলে কিনা, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুশকিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম।' আসবার ভঙ্গিটা দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এল।

আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটা চমৎকার লেগেছিল। আমার এই মধ্যাহ্নের ট্রাকটর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন!

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, 'উঠুন।'

সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিল। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, 'খান, সুকুমারবাবু।'

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করবার কথা ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েন্টস্‌ম্যান-গানারদের চিৎকার আর হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, 'ওরা কী বলছিল জানেন?'

হেসে বললুম, 'কী?'

— 'বলছিল আপনি একটা ব্যারিস্টার হলেন না কেন?'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, আমিও হাসতে লাগলুম।

মেট সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, 'তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমায় ইস্কুলে পড়াতে চাই!'

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, 'বাঃ বাঃ বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, না? চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে— না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?'

— একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে।

গল্পটি হচ্ছে এই : সে এবার বাড়ি গিয়ে তার গাঁয়ের চাষিদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। সেই বৈঠকে যে লোকটা বক্তৃতা করেছিল সে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললে,— ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবত আছে! এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকপকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিল। লোকটি তখন ভয়ানক খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিল।— 'দুনিয়ার সবাই এরকম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকব, না? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না?' বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক ঠক শব্দ করে কাজ করতে লাগল।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির ঝির বাতাসের সঙ্গে শেডঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের উপর অনেকগুলো এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন! আমার কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হল। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কত রকমের হাড়, কত কলকব্‌জা, মাথার ওপর ওই একটিমাত্র চোখ, কিন্তু কত উজ্জ্বল। মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী-পুরুষ আর আছে! সত্যকথা বলতে কী, এত কলকব্‌জার মাঝে, এতগুলো এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হল। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

তারপর সন্ধ্যায় অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

কয়েকদিন পর কোনো গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মন্টুও দুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরে আরও অনেক ছেলেপেলে এসে জুটল। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়ো বড়ো ইট নিয়ে বসল রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

একটি তুলসীগাছের কাহিনী

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা-আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন, তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হত?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজপর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিত। যত্ন করে লাগাত মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ, বকুল, হাসনাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসত। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হালকা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিত। তারপর গা ঢেলে বসে গল্পগুজব করত। আমজাদের হুঁকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না-হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিত। কাদের গল্পপ্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠত। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জোছনারাতে গল্প না-করলেই-বা কী এসে যেত? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করত তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে-থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই। তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর-দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নেই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা।

সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। অবশ্য সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা

ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি-বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার উপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে : কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুটের চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে :

আপনাদের তকলিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সে-ই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা-ভরা উক্তিতে।

ওই ঘরটা?

নিচের তলায় রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে শতরঞ্চিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাপত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টাদুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিপ্পণতা যদি করতে চায়—

অবশ্য এসব পরাহত বাড়িসন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়িদখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুল্লুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে : পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে কথা বিশ্বাস হয় না। দুদিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময়মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য

অধিকার-স্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত তো মনে হয়ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্রঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইনকানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর-রব তোলে। যাব কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি?

সদলবলে সাব-ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না-বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল-চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়িদখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে : সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার একরকম আত্মীয়া। বোলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটি গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উসকানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে : কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে-আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না— শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেনে খালাসিপট্টিতে, বৈঠকখানায়, দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেনে অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশনে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান— এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো এক-একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনিতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দু-হাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জলুশ আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনাভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই

নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁতস্যাঁতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকত যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছত না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে-পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকত, থেকে থেকে শেষরাতে কাশির দমক উঠত। তবু পাড়াটি ছাড়েনি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিত। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মোঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানীর হাতে শেখা বিশেষ ধরনের পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষপর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ-প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোনো কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অব্যক্তব্য সংগীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ-হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের উপর তুলসীগাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠানে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার?

চোখ খুলে দ্যাখো!

কী? কী দেখব?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসীগাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখছ না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসীগাছটা দেখতে পাচ্ছ না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসীগাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গায় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

কী দেখছ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফ্যালো!

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা

হাতে লেখা ক'টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছ কী অত? উপড়ে ফ্যালো বলছি!

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসীগাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ-দেওয়া-অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন একসময়ে রেলওয়েতে কাজ করত। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে : হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে পট্টিতে সে মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্নভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে :

থাক্-না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসীগাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলবি ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কোরান তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসীগাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে সেটি রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পরমুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয়, তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছপা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাকবিতণ্ডার স্রোতে মনের সে দুর্বলতা-অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যদিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

— ওরাই তো সবকিছুর মূলে।— মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বাল্‌ব-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। — তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হল।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে : বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

মোদাব্বেরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে—

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডানদিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসীগাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে আগাছা জন্মেছিল সে-আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে পাতাগুলো কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে।

মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি শাঁ করে কচুকাটার কায়দায় সে তুলসীগাছের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু উপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসীগাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসীপাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানি দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় পরিণত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন সময় বাইরের সিঁড়িতে ভারি জুতার মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার।— সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্যকথাটা স্বীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্যে?

পুলিশদলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগপড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল-দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোনে। উপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর-দুটিকেই দ্যাখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশুপক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে : কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে।— পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট্‌ করে উত্তর দেয়। আপনারা বেআইনিভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে : কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনস্টেবল-দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দ্যাখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা?— না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশদলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে? গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার আর হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়।

আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনস্টেবল-দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাত দিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেও সে ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকে খবর-কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।

কেন পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন

নয়ান ঢুলি

ঠুক— ঠুক— ঠুক।

ঢোল সারে নয়ান ঢুলি। ছোট হাতুড়ি দিয়ে পেটে, আর একগাছা করে তোঁয়াল টানে খুব সতর্কতার সাথে। পাঞ্জার চারটি আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে তাল ঠোকে, কান পেতে শোনে, ঠিক আওয়াজ উঠছে কিনা।

ডুং— ডুং— ডগ— ডুং।

অনেক দিন পর নয়ানের কাছে একটা ঢোল মেরামতের বায়না এসেছে। হাতে কাজ না থাকলে নয়ানের হাত নিশপিশ করে, কী যে করবে তা ও টের পায় না। মাঝে মাঝে সুপারিগাছের খোল থেকে ও খেলার ঢোল বানায়, সে ঢোল ছেলেদের দিয়ে বলে : বাজা, খুব করে বাজা— তাতেই ওর আনন্দ। আজ হাতে একটা কাজ পেয়ে নয়ান তাই উঠেপড়ে লেগেছে, আচ্ছা করে এটা না সারলেই নয়। তাছাড়া এটা কাচারিবাড়ির ঢোল, সেরে দিলে বখশিশও আছে পুরোপুরি চার গণ্ডার পয়সা।

আগে কিন্তু নয়ানের খুব কাজ আসত, বারোয়ারি মন্দিরের কাজ, চৈত্রসংক্রান্তির কাজ, গাঁয়ের যাত্রাপার্টির কাজ; তা ছাড়া ভাসান, গাজির গানের সব দল থেকেও অনেক কাজ আসত। এখন সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। কালে কস্মিনে তিন্নাথের মেলা কি রামনাম আসর বসে, তাদের আর ঢোল-তবলার তেমন দরকার হয় না। হলেও ওই পুরনো ছেঁড়াটা ফাটাটা দিয়েই কোনোমতে চালিয়ে দেয়। মুসলমানদের গানের দল তো এখন নাই-ই।

পির ও মৌলবি সাবরা বলেন— গান-বাজনা করা হারাম। তাই ওরা— ছবু কর্মকার, গহের গায়ানি, মেহের বয়াতি সব গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছে। না দিয়ে তো উপায় ছিল না। সমাজে একঘরে হয়ে থাকা যায় কতদিন। তা-ও ওরা জিদ করে ছিল অনেক দিন। বলত : একঘরে কেন আরও যা পার তাই করো, আমরা গান-বাজনা করবই। সে কথা নিয়ে মেহের বয়াতি ধুয়া বেঁধেছিল—

আমরা কয়জন একঘরে আয়
ঘর বাঁধি এক সাথে...।

সত্যি ওরা গাজির গান, ভাসান গান ও জারির গান নিয়ে রাতদিন মত্ত থাকত। তারপর দিনকালও যেমন খারাপ হয়ে গেল, সাথে সাথে মানুষের সুখও গেল। পেটে

ভাত নাই, পরনে কাপড় নেই— কার গান কে করে। তারপর এখন তো শরিয়ত মোতাবেক চলতে হবে, এখানে গান-বাজনার ঠাঁই নাই। তাই ওদের মুখ চিরদিনের জন্য গেছে বন্ধ হয়ে। ওদের গান-বাজনা যাবার সাথে সাথে নয়ানের কাজকামও গেছে। আজকাল একটা কাজকাম পেলে নয়ান যেন হাতে সোনার তাল পায়। একে কাজের অভাব, তাতে দুর্ভিক্ষের বাজার।

এক ঘরের এক বাড়ি। ঘর তো নয় ঝুপরি। পাটশোলার বেড়া, কোনো জায়গায় আছে, কোনো জায়গায় নাই। নয়ান বলে উইয়ের জ্বালায় কিছু রাখা যায় না। বাড়ির চারদিক বেড়ার বেশি দরকারও করে না। নয়ান কোনোদিন তা দেয়ও না। নানান আগাছা, ঝোপজঙ্গলেই ঘেরা, বেড়ার কাজ ওতেই হয়ে যায়। এখানে ওখানে আমের গাছ, বেড়ার মাটি সবসময় স্যাঁতসেঁতে পিচপিচে ভিজে থাকেই। ঘরখানার চালায় বিশেষ ছাউনি নেই। কেউ কেউ মজা করে বলে : নয়ান ঢুলির আকাশ-কুলকুলি ঘর। মানে, ঘরে শুয়ে আসমানের তারা গোনা যায়। একপাশে ছোট্ট একটি বারান্দা, তার আবার এক কোনা ঘিরে একটি খোপ তৈরি করা। তার মাঝে থাকে নয়ানের সাধের টেপী— একটা ছাগল। বারান্দার খোলা দিকে বসেই নয়ান কাজকর্ম করে আর হুককুর হুককুর কাশে। ওটুকু ও বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করে। লোকজন এলে ওখানেই ডেকে বসায়, বলে— বোসো, বোসো।

সেখানে বসেই নয়ান ঢোলে চাম সাঁটবার কছরৎ করছিল সেই সকাল থেকে।

পচা দাই এসে দাঁড়াল, কী ওস্তাদ, কী করছ বসে। নয়ান মাথা তুলে না চেয়েই জবাব দেয়— আরে ভাই, হাতে বড় একটা জরুরি কাজ এসে পড়েছে। তা বসো, পিঁড়িখানা টান দিয়ে পাছা এঁটে বসো।

রাখ তোমার কাজকাম, তামুকটামুক খাওয়াও।

তামুক! তামুক পাব কোথায়? শালার চিটে-গুড় কি দেশে আছে? সে-না বাঘের চোখের চাইতেও দুর্মূল্য হয়ে গেছে, সাপের মণিও বলতে পার। গিরিস্তের গুড়ের দাম দেড় টাকা সের আর চিটের দাম চার টাকা, আজব কারখানা, তা-ও মেলে না। চেষ্টা করলে বেলাকে পাওয়া যায়, তা দাম আরো বেশি। বেলাকেরই তো বাজার এখন। সব জিনিসই বেলাক। তামুক খাওয়া ছেড়ে দিলাম পচাই সে জন্যে।

তামুক খাওয়া তো ছাড়লে, ভাত ছাড়তে পারলে তো বুঝতাম তুমি একটা কাজের মতো কাজ করেছ।

ভাতও তো প্রায় ছেড়েছি পচাই, চাল কেনার পয়সা কোথায়? আজ দুদিন তো চুলোর মাথায় হাঁড়ি বসেই না। এইতো একটা কাজ পালাম— একেবারে ভাঙা ঢোল, তালা নাই দুটোর একটাতেও। তা বছির প্যায়দা এসে বলে গেল পাঁচ টাকা আট আনার মধ্যেই সব সেরে দিতে হবে, নায়েব বাবুর হুকুম।

অনেক আপত্তি করলাম, বছির ভাই! পাঁচ টাকা আট আনার তো চামড়াই লাগবে— আরো আরো জিনিসপত্তরও তো আছে। তা বলে কি না আচ্ছা আচ্ছা সার্ তো। যদি সন্ধ্যার মধ্যে সেরে কাচারিবাড়ি দিয়ে আসিস তবে আরো চার গণ্ডার

পয়সা বকশিশ পাবি। মনে রাখিস ব্যাটা, কাচারিবাড়ির ঢোল। ভালো যেন হয়, আর আজই যেন হয়, কাল সকালে ক্রোক পরওয়ানা জারি হবে ওই ঢোল দিয়ে।

সারাদিন তাই সেই কাম নিয়ে পড়ে আছে নয়ান। ঠুক ঠুক করছে আর কাশছে। কেমন হল পচাই— আওয়াজটা একবার শোনো— বলেই হাত মারে নয়ান, কেমন হে? শালার ঢোল যেন কথা বলে।

তা তোমার হাত যখন পড়েছে কথা না বলে যায় কোথায়! পচাই উত্তর দেয়।

আরে আমি কী? ঢোল সারাত আমার ওস্তাদ বুঝলে হে পচাই! যার নিকট আমি হাতেখড়ি নিই এ কামে, সে সেই জেলের মধ্যে। আমার কথা ছেড়ে দাও— আমি আর কী জানি? সে ছিল জাত ঢুলি— নয়ান বলে চলে : আমার তো জাতব্যবসা এ না— আমি হলাম ঘরামির ছেলে, ঘর-সারা ছিল আমার কাজ। যাকগে, সে সব পুরান কথা,— সে সব তো তোমাদের কাছে অনেকই বলেছি। তাছাড়া তোমরা তো তা জানই। এখন এ অসময় কী মনে করে গরিবের বাড়িতে পা দিলে তাই বল?

সব কথা খুলে বলা যায় না ওস্তাদ! কয়েকদিন ধরেই ভাবছি— তোমার সাথে একবার দেখা করে মনের কথা সব খুলে বলব। কী দুঃখে যে দিন কাটছে। তা সাহসও হয় না, কী জানি তোমার মতিগতি-বা এখন কেমন!

পচাই তুমি দেখি তাজ্জব করলে, তুমি কি আজ আমায় নতুন দেখলে— না চেন না আমায় যে, অত সংকোচ?

না ওস্তাদ, তা নয়। যেমন দিনকাল পড়েছে তাতে কারো কাছে কইতেও সাহস হয় না।

তা যাক, এখন বল তোমার কথা কী? জিজ্ঞাসা করে নয়ান ঢুলি।

কথা আর কী, দিন যে আর চলে না ওস্তাদ।

দিন তো চলেই পচাই! আল্লাহর দিন বসে থাকে না, তবে কারো যায় সুখে কারো যায় কষ্টে।

কিন্তু কষ্টের তো একটা সীমা আছে ওস্তাদ।

সেই জন্যেই তো ১৩৫০ সনে অমন ঘটনাটা ঘটে গেল, নইলে শিকার কি আমি কোনোদিন করতাম। ঘর সারতাম, দু পয়সা পেতামও বেশ। সুখে-দুঃখে কোনোমতে ওতেই চলত। নয়ান ঘরামির ওপর টেক্কা দিয়ে ভালো ঘর বেঁধে যায় এমন লোক এ দেশে কি ছিল? তোমরাই বলতে হাঁ ওস্তাদ বটে,— নয়ান একটু মুচকি হাসে। আর গালের দুদিকের গর্ত দুটো খানিক গভীর হয়। সহসা গম্ভীর হয়েও আবার বলে— কিন্তু ১৩৫০ সনে সে ঘর বাঁধায়ও পেট চলে নাই। অতি দায়ঠেকেই হারান পরামানিকের বাড়ির খোঁজ দিই শীতেল চোরের। ওদের ঘর সারতে গিয়ে দেখলাম হারান কাঁড়িখানেক টাকা এনে মাচার নিচের বাক্সে বন্ধ করে রাখল অথচ আমার মজুরি দেবার সময় বলল— আজ টাকা নাই, কাল নিও।

বললাম, পরামানিক ভাই, বাড়িতে চাল একেবারেই নাই।

উত্তর দিল, আরে যা— যা ভ্যানর ভ্যানর করিস না।

চার-পাঁচ দিন আমার মতো লোকের মজুরি আটকে রাখলে কী হাল হয় বল? মনটা বড় ছোট করে বড় ভাবনা নিয়ে ফিরে আলাম বাড়ি। এসে দেখি— আমার জড়িপোশ, ক্ষিধের জ্বালায় বড় কাঁদছে,— ওর মা জ্বরের তাপে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তার মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না, মুখখানা পোড়া কয়লার মতো হয়ে গেছে! আর শরীর? তা কিছু নাই,— কাঁচা কয়খানা কঞ্চি যেন শুকিয়ে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর। পানি ঢাললাম, অনেক পানি। অতি কষ্টে সে চোখের পাতা একবার টেনে তুললে, চোখের মণিদুটো যেন হাঁড়ির ভেতরে আঙড়া আগুনের দুটো গোলা জ্বলছে। শুধালাম, কিছু বলবে? ধীরে মাথা নাড়ল, ইশারায় জড়িকে দেখিয়ে।

উঠে গিয়ে জড়িকে বললাম, কাঁদিসনে মা— গায়ে হাতে দিয়ে দেখি তার গায়ে জ্বর, ধান দিলে খই ফোটে, এত তাপ।

কী ওস্তাদ, তোমার ওসব দুঃখের কথা কে শোনে? পচাই নয়ানের কথার তাল কেটে দেয়— যা হবার হয়ে গেছে। এখন আফসোস করলে আর তারা ফিরে আসবে না। নিজেরা বাঁচা যায় কী করে সেই ভাবনাটা এখন ভাবো, ও সব কথা রাখো।

রাখব তো পচাই, মন যে মানে না। জীবনে ভালো কাজ অনেক করেছি পচাই! কিন্তু জীবনভর যা পালাম সে শুধু বদনাম— আর লাথি গুড়ি। আমার দুঃখের কথা বনের গাছপালার কাছে কইলেও বোধ হয় তারা কেঁদে জারেজার হয়ে যেত কিন্তু মানুষে তো শুনল না, কারো কাছে বলার সুযোগও পালাম না। লোকে শুধু জানলে নয়ান ঢুলি চোর বদমাইশ। নয়ান ঢুলিরও যে ভালোমানুষের মতো একটা মন ছিল তা এ দুনিয়ার কেউ জানল না।

না জানলে, না জানল, তাতে কার কী আসে-যাবে ওস্তাদ! খোদায় দেখবে, তা নিয়ে আফসোস করে লাভ কী?

লাভ তুমি বুঝবে না পচাই! নয়ান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কথাকয়টি উচ্চারণ করে— বুকের শুকনো হাড় ক'খানা আরো একটু উঁচিয়ে উঠে আবার দেবে যায়। ফুলে ওঠে কচ্ছপের পিঠের মতো মুখের চোয়ালের দুখানা হাড়। ঢোলের গায় একটা দুটো টোকা দিয়ে আবার তোঁয়াল টানে আর বলে যায়, সত্যি লাভ নাই পচাই— তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তবু মনে যেন কেন খটকা বাঁধে— ওরে লোকজন, আমার এ অবস্থার জন্যে তোমরাই দায়ী, আমাকে দায়ী করলে শুধু মুখের জোরে আর আমার কথা না শুনে।

জড়িপোশ— জড়িপোশের মা, ওদেরকে বাঁচানোর জন্যে কত কষ্টই-না সে করেছিল। বিনা পয়সায় ডাক্তার আসে নাই— এক পয়সার বার্লি কেনাবার সামর্থ্য তার হয় নাই। পরামানিকের কাছে বলেছিল, দেন পরামানিক সাব একটা টাকা, অন্তত আট গণ্ডা পয়সা। বাড়িতে মেয়ে, বউ অসুখ, তাদের পথ্য কিনব। পরামানিক বলেছিল, আজ না, হাতে টাকা নাই, পরে দেখা যাবে।

তারপর ও গিয়েছিল শীতেলের কাছে। সবাই জানত শীতেল— জেলের ঘুঘু শীতেল, তা হলেও গরিবের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যের তার অন্ত নাই। বড়লোকেরা বলত ওটা শীতেলের একটা আলগা ভাঁজ,— আসলে শীতেল চোর। শীতেল কিন্তু নিজের মনের কথা কোনোদিনই কাউকে বোঝাতে চেষ্টা করে নাই। কেন না, ও জানত গরিবের কথা কোনোদিন কেউ শোনে না। নয়ান বলেছিল, শীতেল ভাই, আর তো বাঁচি না।

কেন, কী হয়েছে? জবাব দিয়েছিল শীতেল।

নয়ান ওর দুঃখের কাহিনী উল্লেখ করে বলেছিল, আজ চারদিন ধরে পরামানিকের ঘর বাঁধছি, একটা পয়সা এখন পর্যন্ত দিল না, বলে সে দিব— পয়সা হাতে নাই— নিস একদিন। তোদের কি একদিন পয়সা না পেলে পেট ভেঙে বেরিয়ে যায়? অথচ আমার অবস্থা পরামাণিক জানে, দিন আনি দিন খাই। তাছাড়া, বাড়িতে বউ-মেয়ে জ্বরে জ্বরে ফিট হচ্ছে, তাদের মুখে একটা পয়সার বার্লি, কি একটু ওষুধ দিতে পারছি না। ডাক্তারের কত পায়ে ধরে বললাম শীতেল ভাই, চলেন ডাক্তারবাবু দেখে একটু ওষুধ দেন, পয়সা আমি দিয়ে দেব। আপনার দেনা ঘাড়ে নিয়ে আমি মরতেও পারব না, এমনি না পারি গতর খাটিয়ে নিবেন ডাক্তারবাবু।

তার উত্তরে ডাক্তার কী বলল নয়ান? শীতেল ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শুন-না, শুন-না শীতেল ভাই, সে কথা মানুষ মানুষকে বলে না—

তবু শুনি?

যা— চিরদিন ওরা গরিবকে বলে থাকে তাই বলল— ব্যাটা বেশি ফটর ফটর করিস না— টাকা পয়সা নাই, ওষুধ ওষুধ করছিস, ওষুধ এত সস্তা না।

ফিরে গিয়ে বলেছিলে সে কথা পারমানিককে?

বলব কী শীতেল ভাই! তখন আমার মনে হল, তখন কেন এখনো তাই মনে হচ্ছে— পারমানিক কাঁড়িখানেক টাকা এনে আমার সামনে বাক্সে তুলে রাখল অথচ আমায় বলে কিনা টাকা নাই, আর একদিন নিস। ওর মাথায় বাড়ি দিয়ে টাকাগুলো লুট করে আনি, তা হলে আমার মনের জ্বালা যায়। তা কেন যেন সাহস হচ্ছে না।

সাহস হচ্ছে না? তা আমায় এতক্ষণ বলিস নাই কেন? চল্ দেখিয়ে দিবি, আজকেই আমি তার ও কর্ম করে দেব, যা নয়ান, ভাবিসনে কাঁদিসনে— একটা উপায় আজ করবই। তুই শুধু দেখিয়ে দিবি— আর কিছু না।

একথাও তোমার অনেকদিন শুনেছি, ওস্তাদ। আরে ওসব কথা শুনতে ভালো লাগে না— তুমি রাখ— রাখ, পচাই আবার ওর আত্মকাহিনীর মাঝখানে খাঁজ কাটে।

তোমাদের শুনতে তো ভালো লাগে না পচাই, কিন্তু বলতে আমার যে ভালো লাগে। তা গল্প থাক, তামুক খেতে চেয়েছিলে, খাওয়াতে পারলাম না। আজো মনে পড়ে বেশ তামুক খেত শীতেল, বড় মজার তামুক, গন্ধে বাতাস পর্যন্ত মো মো করত। বুঝলে পচাই; সে যে-সে তামুক না, আসল খাম্বুরে তামুক।

হাঁ শোন, সেই রাতেই শীতেলের সাথে আমি শিকার করি। সকালে সারা গাঁয় হুলুস্থুল কাণ্ড।

আমি গেছি ডাক্তারবাড়ি। সেখানে ডাক্তারকে দশটাকার একখানা চকচকে কোরা নোট দিয়ে বললাম— নেন ডাক্তারবাবু, এখন হল তো, এখন তো যেতে পারেন? সে কথা শুনে ডাক্তার বলে— টাকা পেলি কোথায় নয়ান, চুরি করেছিস নাকি? বড় রাগ হয়েছিল, তবু সহ্য করে বললাম, সে কথায় আপনার কাজ কী ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন নাকি চলেন। ডাক্তার বলেছিল, আচ্ছা যাওয়াচ্ছি দাঁড়াও।

তারপর সে কথা তো শুনেছ। সেখান থেকেই আমায় ধরে নিয়ে গেছল ওরা, পুলিশে দিয়েছিল। বিচারে শীতেলের আর আমার জেল হয়েছিল ছয় ছয় মাসের। ডাক্তার, আরো অনেকে দেখা সাক্ষী দিয়ে এল, কোর্টে হলপ করে— আমরা চুরি করেছি।

জেল থেকে ফিরে এসে জড়িপোশ আর তার মাকে আর দেখতে পাই নাই। শুনেছিলাম ওরা নাকি মরে গেছে। নয়ানের গলা ধরে আসে তবু ও বলতে চায় কত কথা, কত ইতিহাস যা ওর বুকভরা গাঁথা রয়েছে। আজো নয়ানের মনে আছে সব কথা, খুব ভালো করেই মনে আছে। ও বলেছিল : পরামানিক তুমি মানুষ না, একটা পশু।

আবার পচাই প্রশ্ন করে, তোমার সেদিনের সেই সব কাহিনী বললে কি পেট ভরবে ওস্তাদ? আমারও যে তোমার মতো দিন হল। এখন কী করব বল?

কী করবি— মাথা দুলিয়ে বলে নয়ান। দেখ পচাই, পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছেড়েছি কম দুঃখে না। নইলে নয়ান ছিল ঘরামি, আজ সে ঢুলি কেন?

শুনতেই কেমন বেখাপ্পা শোনায় কথাটা, কদম ঘরামির ছেলে নয়ান ঢুলি। নয়ানের চোখ বেয়ে আসে দরদর পানি। ও চুপ করে থাকে, কোনও কথা আর উচ্চারণ করতে পারে না।

পচা বলে, ওস্তাদ, কাঁদলে কি এর প্রতিকার হবে?

জানি, কাঁদলে এর প্রতিকার হয় না পচাই। তাই তো বয়সের সময় কত ঝড়-বৃষ্টি-বাদল মাথায় কত আঁধাররাতের অন্ধকারেও ঠেলে ফেলে শিকারে বেরিয়ে যাতাম! কোনো শালাকে পরোয়া করি নাই। সেদিন গায়েও বল ছিল— বলেই নয়ান তার দুমড়ে পড়া শরীরটার দিকে একবার ফিরে তাকায়। আবার বলে— কত জায়গায় রাতবিরাতে হানা দিয়ে ফিরেছি। জঙ্গলের বাঘ আর বড়লোকের বন্দুক— ওতে নয়ানের বুক একটুও দমে নাই। আরে আজতো নয়ান মরা— সে নয়ান নাই।

না ওস্তাদ, তুমি একেবারে ভেঙে পড়ছ। তুমি শুধু সাথে থাক ওস্তাদ, শিকারের কাজ সব আমি নিজহাতে করব। তুমি আর একবার উঠে দাঁড়াও, নইলে আমরাও বাঁচব না, ওস্তাদ। সব কথাই তো তোমাকে খুলে বলেছি, আর চোখে দেখ সব। জীবনকে বঞ্চনা আর কতকাল করব। ওস্তাদ বলে তোমাকে মেনেছি, তুমি মাথার মণি। তুমি সাথে একটু সাহস জোগালে পচাইও কারো কেয়ার করে না।

ধীরস্থির হয়ে ভাঁটার মতো দুটো চোখ দিয়ে চেয়ে থাকে নয়ান পচাই'র আকুতি ভরা মুখের দিকে। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলে, হুঁ। আচ্ছা আসিস রাতে, ডাক দিস। এ রাতের দিকে নয়, মানুষ শেষরাতে ঘুমায় বেভোরে, সেই সময়, কেমন?

আচ্ছা, বলে চলে যায় পচাই! পচাই শুয়েছিল বিছানায় কিন্তু ঘুম আসে নাই। বারবার বাইরে বেরিয়ে দেখেছে, অনুমান করেছে রাত কতখানি হল তা জানতে। প্রহরে প্রহরে রাত এগিয়ে গেছে, ধীরে ধীরে পার হয়েছে দুপুর, চাঁদ ডুবে গেছে অন্ধকার হয়েছে ঘন, আরো ঘন নিঝঝুম আকাশ, পৃথিবী। তারাগুলো ড্যাবড্যাব চোখে চেয়ে রয়েছে মাটির পৃথিবীর দিকে। পচাই বলেছে— আল্লাহ মেঘ দাও, ঝড় দাও, আঁধার করে দাও দুনিয়া। তারপর নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে পড়েছে পচাই বালিসের নিচে রাখা লাঙলের ফালটা হাতে করে। মুখে বলেছে : বিসমিল্লাহ।

ধীরে ধীরে সেই আঁধার পথ কেটে এগিয়ে চলেছে পচাই, নয়ানের বাড়ির দিকে।

ওস্তাদ, ওস্তাদ। ফিসফিস করে ডাকে পচাই।

এসেছিস? ঘুমাইনি রে পচাই। দাঁড়া! বাস্তুখুঁটিটার নিচে টিপ করে একবার মাথাটা ঠোকে নয়ান আর মনে মনে ভাবে : তোর কাছে আবার যেন ফিরে আসতে পারি। তারপর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মাজার কাপড়টা কষে গিঁট দেয় মাজার সাথে, তারপর বিসমিল্লাহ বলে বেরিয়ে যায়।

বাইরে তখন গহন আঁধার সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে। এত আঁধার যে সে আঁধারের গভীরত্ব ভয় জমিয়ে তোলে মানুষের মনে। তবু ওরা দু'জন গায়ে গায়ে মিশে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে আঁধার ভেদ করে চলে এগিয়ে।

লোকজন জাগোও— মাঝে মাঝে চৌকিদারের হাঁক সে রাতের গভীর নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দূর হতে আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নয়ান আস্তে আস্তে পচাইকে সাহস দিয়ে বলে— ভয় পাসনে পচাই, ও গোপাল চৌকিদার ঘরে শুয়েই হাঁকছে।

শাহেদ আলী
জিবরাইলের ডানা

আজিমপুর হয়ে যে রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছপালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে দেয়ালগুলোর উপরিভাগ গলে গেছে অনেক দিন— রোদে-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরনো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আসমানের ছিটেফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিল নবীকে। আট বছর গিয়ে ন'বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইনতেকাল করেছে। একা হালিমা কী-ইবা করতে পারে তার জন্যে?— নিজের পেট পালতেই সাতবাড়ি ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধেবেলা গিয়ে বসতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান খয়রাত করে, তাদের কাছ থেকে দু'চার পয়সা হালিমার বরাতে জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানি শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে উঠেনি বিড়ির বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা করে পাবে দোকানির কাছ থেকে।

কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধে পর্যন্ত আর দেখাই মিলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে— আজ তাকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর,— অমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার।

সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিল হালিমা— ছেলে যদি কোনো কাজ না শেখে, তার কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, ছেলে এমনি মগড়া যে এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই-বা কেন?— মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষা করতে— বাঁদিগিরি করতে! সন্ধেয় নবী বাড়ি ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই হালিমা ধুম

ধুম করে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী?— জানতে পীড়াপীড়ি করেছিল হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিল, কিন্তু দু'এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে— তার পেটেও ভাত গেল না আজ! কত অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা,— কিন্তু তাতে মন গলল না অভিমানী শিশুর, শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের উপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আসমানের দিকে। একটা হাত তার নবীর উপর রাখা। নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না হালিমা,— কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়া ছেলের উপর হাত রেখেই তার মনটা হু-হু করে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতটুকু ছেলে, কী-ইবা বোঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মা'র যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। এ ভাবে যখন-তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়।— কিন্তু কাজ যদি কিছুই না শেখে, ও বাঁচবে কী করে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে।

হালিমার চোখ আঁসুতে ভরে আসে, আসমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে!

নবী আস্তে আস্তে চোখ মেলে চায়— আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে— মা, এইডা কে?

কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

উই যে গেল, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

— কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

— তুমি লুকাইবার চাও?— নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে— খুব ছুন্দর একটা মানুছ গেছে না? রাঙা ধবধবা— আর পিন্দনে সুন্দর কাপড়?

— ছুন্দর মানুছ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

— হ, চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে নবী বলে— মিঠাই লিয়া আইছিল— তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা?

— হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে হালিমা— তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী এখন তুই ঘুমা— বিহান বেলা খাবিনে মিঠাই।

লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল মা? নবী আবার প্রশ্ন করে— দুইটা পাখনা দেখছ পিঠে?

পাখনা?— হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে— হ, পাখনা।— মউরের পেখমের মতো ছুন্দর।

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে— ফিরিছতা আইছিল রে— ফিরিছতা। আজ ছবেবরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজখবর নিছে মানছের! ফিরিছতা গো আজ ছুটি!

ফেরেশতা এসেছিল! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। রাতটা কী চমৎকার! রুপা-গলা জোছনায় ধুয়ে ঢলঢল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধেয় ঘরে ফেরার সময় সে দেখেছে মসজিদে কোরান তেলাওয়াতরত ছেলেমেয়েদের। এখন রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ্ বাড়ির মসজিদ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো— গোরস্তান গমগম করছে মানুষে! আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশতার সঙ্গে, মৃতদের রুহের আজ মোলাকাত করবে সবাই, নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফেরেশতা মারফত জানাবে আল্লাহর কাছে। শুধু নবী আর হালিমাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহর ফেরেশতা, অথচ তাদের চাওয়ার কথা— জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি সে— কিছুই জানান হল না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে— কিরে তোর খিদা লাগছে খুব? ভাত খাকি এখন? নবী কোনো জবাব দেয় না তার, খিদের কথা ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশতারা খবর নিয়ে যায় আল্লার কাছে। তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশতা? সে কি গিয়ে বলবে না বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে।

— ফিরিশতারে কিছু কইয়া দিছ মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী। কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা।

— আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না,— ফিরিশতা আমাগো কতা ছুনবো ক্যান? বড়লোক গো খোঁজখবর করবার লাইগা আইছে! আমাগো দুয়ারের কাছ দে তাগো বাড়িই হে গেছে।

নবী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে— তুমি নামাজ পড় না ক্যান মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

— কী অইব নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

— কী, অইব কী? এতটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে তাগো বাড়িতেই না ফিরিছতারা আহে, আল্লাহ তো তাগো কতাই ছোনে।

— নারে না, হালিমা একরকম চিৎকার করে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রুপা দিয়া ছেজদা করলেই হে চায়। গরিবের সোদা নামাজে হের মন ভেজে না।

আল্লাহ্র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোনো ভরসাই নেই তাহলে। এত সোনা-রুপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌছাবে না খোদার কাছে। আর তাই

তো, গরিবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই?— সোনা-রুপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেজন্যই বুঝি মালদাররা আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ।

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাইকেই। তিনি কেন তার রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কেনোদিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরিবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তাঁর?

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে ফেরেশতা, দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটো ডানা তার পিঠে, আর গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজি ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলছে ফেরেশতাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়ত ফেরেশতার পথে, আর মিনতি করে বলে যেত তার রক্তের ঢেউ ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুলে পড়ত ডানায় ধরে— ফেরেশতার সাথে সাথে উড়ে উড়ে সে-ও চলে যেত একেবারে আল্লার কাছে। অমনি চোখ মেলে নবী চিৎকার করত গলা ফাটিয়ে, খামচিয়ে রক্তাক্ত করে ঘুম ভাঙাত আল্লার!

কিন্তু তা তো আর হল না। অথচ সবকিছুরই চাবি রয়েছে খোদার হাতে। তার ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেই-বা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যত চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে দু চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তো দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি। একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী, অনেক রাত অইছে— তুই ঘুমা।

নবী আসমানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে, আর একটা পথের খোঁজে কল্পনা তার হয়রান হয়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবী ভরে এত জোছনা— তবু যেন কত অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকুল দরিয়ায় যেন নারিকেলকুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকার পানিভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী— যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমাই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে নিজের হাতে আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে; কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোকচক্ষুর

আড়ালে ওইখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দুরই-বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি— ঘুড়ি উড়িয়ে সে তার বাণীকে এতদিনে অজান্তে উপর হতে আরো উপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে।

পেটব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির হতে পারছে না আজ। অতি সন্তর্পণে বাড়ি পৌঁছে নবী। মা বাড়ি নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর! তিনটা পাতিল তছনছ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা— ওহ! দুই আনার পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলো বার করে মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতো কিনে আবার সে দৌড়াতে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে বের করে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়ি তাকে রোজ বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আসমানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরনো সুতোটার সঙ্গে নতুন সুতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে। ঘুড়ি যতই উপরে উঠতে থাকে উল্লাস অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতো শেষ হয়ে গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এত কাছে? তা তো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক অনেক দূরে আরশের উপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এত কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেত আল্লাকে। সুতো চাই তার আরো, অনেক সুতো— যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যায় মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে। কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতো কিনবে সে পয়সাই-বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না। নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতদিন একটা শখ ছিল, নেশা ছিল, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন এই ঘুড়ি একটি গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনার সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে।

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই সুতোয় হবে না, আরো আরো অনেক সুতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মা'র কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবুও লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজলের লিখা পাল্টাতে হলে কিছু খরচ— কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মা'র অবর্তমানে নবী উল্টেপাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল— ছেঁড়া কাপড়ের বোচকাগুলো খোঁজে তন্ন তন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই-বা কী করে? ভিক্ষা করে, পরের বাড়িতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনোদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা!

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে : ইস্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সের ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট খিদে নিয়েই সে ছুটে যায় ইস্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে! তারপর গাড়ি যখন এল, তাজ্জব বনে যায় নবী— কত বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কত রঙবেরঙের পোশাক। বাক্স-বিছানা, পেটরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু।

'মুটে চাই'— চিৎকার হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজে।

সবার বরাতেই একটা না-একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড় খারাপ, 'মুটে চাই' বলে চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এল না তার গলায়— হাত দুটো চাওয়ার ভঙ্গিতে উপর দিয়ে উঁচিয়ে সে ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে— চোখ তার করুণ আঁসুতে টলমল। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেল না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদনসিবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরো বড় হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায়ে-বেটায় কোনোদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না তারা। কোনোদিন একেবারে উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারত তারা! সেই তার বাপ ছেঁড়া শততালি দিয়ে যে কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিল সেগুলোই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর উপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দু'জনে। ঘরের মেটে দেওয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে 'উসলিয়া' পড়ে পড়ে ঘর ভেসে যায় পানিতে। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লার কাছে তাদের দিলের আরজ পৌঁছাতে পারলেই অবসান ঘটত দুঃখ-রাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবী ও আরবি সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি কখনো। আল্লা কেনই-বা শুনবেন তাদের কথা।

ঘন্টাখানেক পরে আর একটা ট্রেন যখন এল, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' বলে সে চিৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে।

ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণির কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল দেখিয়ে দিয়ে বললেন— ওয়েটিংরুমে নিতে পারবি?

— ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা।

— কত নিবি? ভদ্রলোকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

— আমার বহুত পইছার দরকার, চোখ দুটো বড় বড় করে উচ্চারণ করে নবী— আপনে কত দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান; অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন— এত পয়সা দিয়ে কী করবি?

— বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিনুম যে— অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅলটা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে; ওয়েটিংরুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন— এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুড়ে মারে ওয়েটিংরুমের মেঝেয়— না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কী করুম? আমার অনেক রছি লাগব। আমার ঘুড়ি আছমান ছুইব গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন— ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কী হবে?

— ক্যান, আরছের পায়ায় বাঁধাইয়া টান দিমু। এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে— আল্লা খালি আপনাগো কতাই ছুনব, আমাগো কতা বুঝি ছুনোন লাগব না হের?

এবার সকলে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থমথমে বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন— এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছলছল করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা অইব, আমাগো বাড়ি তখন আইয়েন— আপনের জেব ভইরা দিয়া দিব হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন তিনি তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবানির কথা ভুলতে পারবে না নবী— দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই আসব, আমরা সবাই আসব সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে। অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মসজিদে— তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা করে আনা চালগুলো জ্বাল দিচ্ছে আর সুরবুর হচ্ছে ধুঁয়োয়। গাছতলা থেকে ভিজে বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে, নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে,— কিরে, অতোক্ষণে কোত্থে আইলি?

মা'র দরদভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশি হয় নবী; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তছনছ করে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাকে সে শুকরিয়া জানায়।— দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম, মা,— মা'র দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে!

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে— দোকান তে পালাস নে যেন!— কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইব ঘরে— কাজ না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে?— আমাগো মা-পুতের কি এছাড়া আর উপায় আছে?— এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে— হারে নবী, তোর খিদা লাগছে, না?

মা-এর আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদের কথা। তাছাড়া একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মা'র স্নেহ— দুটোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে— না, মা— আমার খিদা লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

— তাই ভালা,— হালিমা সায় দেয়— ভিক্ষার ভাত যত কম পেটে দেয়া যায় ততই ভালো। এ ভাতে ছেলে-মাইয়া গো বাইড় থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দু'জনেই কিন্তু ভিক্ষার ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূল— এবং নবীর হাতে অনেক সুতো। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারবে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে পয়লা বুকের কাছে চেপে ধরে— বুক তার ঢিপঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়ল আসমানে,— হাওয়ার ভরে নেচে নেচে দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় উপর হতে উপরে,— আরো উপরে! সুতো আজকে ফুরোতে চায় না— ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে— অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে, অসীম শূন্যতায়!

আবেগে, ঔৎসুক্যে বড় হয়ে এল নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তার বড় হয়ে আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময়ে টের পায় নবী— লাটাই আর ঘুরছে না— সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণিমনসায় ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টিসীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনল। আরো রশি চাই তার— অ-নে-ক রশি। খোদা তাঁর আসন এত দূরে পেতেছেন কেন? বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমানো এত নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে তার আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পায়ায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মসজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে, আজো সে চলে ইস্টিশনে! পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা— যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে খোদাকে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশি আর জোটে না। কতোটুকু সুতোই-বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী— আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরনো সুতোটার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে।

পিলখানার ওপাশের ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতো যখন শেষ হয় এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না— সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদি।

রোজ নবী দোকানের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়— কিন্তু কোথায়-বা দোকান আর কোথায়-বা নবী? ইস্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি করে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায়। দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়িটা ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মতো হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেল। ডোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী, আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর থর করে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এল তার, বিস্ময়ে-আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে— একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে— কে হারে, কে জেতে— এবং তারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে! শুধু একটা রশি— টন টন করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়ালে থেকে কেউ টানছে রশিতে ধরে— আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর হাতের শিরা-উপশিরা।

রশি বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উঠে বেড়াক আপন ইচ্ছেয়— আপন ধর্মে! একসময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায়— আরো শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে— অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী— তাদের ইতিহাস।

নবী চেয়ে আছে উপরদিকে— শুধু একটা সুতো— সেরাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশত আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে শাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে এবং আঁৎকা টান পড়ে ঝন ঝন করে উঠছে সুতোটুকু— মেঘ দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভরে আসে। আল্লাহর আরশ ঠিক কোনখানটিতে তা সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হল সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে— আর যেন দূরে নয় বেশি!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার— সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেল না ঘুড়ি! একসময় সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নিচে এবং জমিন ছুঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে; ঘাড় নিচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির,— কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজাভেজা। আহ— নবীর বুকে খুশি আর সীমাই পায় না যেন! বহুদিন পর খোদা আজ তার গরিব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন আর তারই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হল না আর; এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তাঁর বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী— সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে, আজ থেকে কোনো দুঃখই থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে— হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে— জ্বর এসেছে তার। জোহরের সময় চলে এসেছিল ঘরে— আজ তার কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর— খোদা যদি তাঁর বান্দার দুঃখে কাঁদবেন, তো তার মা-র জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তাহলে আল্লাহর আঁসু নয়— শয়তানের পেশাব। শয়তান চায় না যেন মানুষের দিলের আরজ পৌছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে— আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার। সাত তবক আসমান পেরিয়ে তবেই-না আল্লার আরশ! সকালবেলা জ্বর নিয়ে উঠে পড়ে মা হালিমা। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা ফেন যোগাড় করে দিয়ে আসে নবীর জন্যে। নবী বলে— তুমি খাইবা না, মা?

না,— হালিমা ধীরে ধীরে বলে— তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— তুমি চিন্তা কইর না মা— আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইব। এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকব না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে— কিছু বলে না। টলতে টলতে একসময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না একদিনও— বাজারে, ইস্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি করে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান! কিছুতেই থামতে পারে না নবী; যার নূরের

তজল্লিতে সিনাই পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তারি দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দুঃসাহসী শিশু।

কিন্তু যতই সুতো জুড়ে দিচ্ছে— ঘুড়ি ততই উপর হতে আরো উপরে উঠছে— কোনো কূল-কিনারাই পায় না নবী। এত দূরে— মানুষের নাগালের বাইরে এভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে মা আজ বড় খুশি! পরনে তার নতুন শাড়ি— সানকি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়!

বহুদিন পর সানকিভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা করে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে— মা, এই ছব পাইলা কই আইজ?

আজো জ্বর ছিল হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশি দেখে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে— কাহারটুলির জমিদারবাড়ির বউ মরছিল্ না। তারি ফাতিহা অইছে আইজ;— বহুত কাপড়চোপড় আর টাকাপয়সা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না তোর লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া— হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লা; ঘুম তাহলে ভেঙেছে তার। আজ শুকরিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলছল চোখে মা'র দিকে চেয়ে বলে— কইছিলাম না মা— এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকব না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারত না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে— তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

জমিদারবাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে দুদিন ভালোই যায় তাদের। আবার শুরু হয় আধপেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে— রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা— একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজ তাহলে এখনো গিয়ে পৌঁছুয়নি খোদার কাছে!

নবী রোজ ঘুড়ি ওড়ায় আর মনে মনে বলে— আল্লার আরশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে এত সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে, এত ফেরেশতা রয়েছে কী জন্যে? তারাই তো মানুষের দিলের আরজ পৌঁছায় নিয়ে খোদার কাছে। আর কাছ হতে তারাই তো পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে! আজকাল এত নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশতারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লাহর কাছে?

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু। নবী দূর্বার উপর বসে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরনো সুতোটার সঙ্গে। আসমান কেমন যেন মেঘলা মেঘলা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে আর ফাঁকে ফাঁকে চকচক করেছে গাঢ় নীল আসমান। এক সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,— হাতে তার লাটাই ঘুরছে আর সনসন

করে ধাওয়া করছে ঊর্ধ্বদিকে। নবী অপলক চেয়ে আছে ঘুড়ির পানে,— আর রশিতে টান পড়ে পড়ে ঝিনঝিন করে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন! নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না! মন তার আবেগে-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্গ-ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আসমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এল! একসময় নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পায়, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখি উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখিটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে,— আবার দেখা যাচ্ছে। বৃহৎ ডানা মেলে ঘুরছে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র করে, আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখির গায়, নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে— পাখিটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখির ডানায় আর গায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, সুতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখির পিছে পিছে। নবীর এতদিনের অহঙ্কার মাটি হয়ে যায় আজ! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না জীবনে!

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দুচোখ ভরা আঁসু নিয়ে একবার সে তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখির পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি; আর পাখিটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচমকা নবীর মনে হল— এ তো পাখি নয়— এ যে ফেরেশতা— জিবরাইল এসেছে পাখির সুরত ধরে তার ঘুড়িকে আল্লার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে! দু চোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার আঁসু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার আঁসু ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি— বেদনা আর আনন্দে ঝলমল-করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতদিন পর ফেরেশতা এসেছে তার দিলের আরজ আল্লার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে! আর সে কিনা কাঁদছে, পাখি তার ঘুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আসমানের দিকে— দেখে পাখিও নেই— ঘুড়িও নেই,— শুধু শাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে চকচক করা গাঢ় নীল আসমান! অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানের দিকে, আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার আঁসু। আজকে সে সার্থক— আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার, জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি— নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক ঝলক হেসে নবী বাড়ি ফিরে আসে। খুশিতে তার সারা শরীর আজ নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বসে শাক বাছছিল,— 'মা— মা— হুনছ' বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে— তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে; টিপে ধরে নবীর ঘাড়ে— গরগর করে বলে— কোত্থে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রঙ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না!

নবী তার মা'র রাগের কারণ বুঝতে পারে না,— তবু তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে— মা আইজ জিবরাইলরে দেখছি— আমগো খবর....

নবী কথা শেষ করতে পারে না— ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে। কিলোতে কিলোতেই বলে— ওরা দিব আর আমরা খামু বইয়া বইয়া? ঝাঁটা মার জিবরাইলের মুখে শতবার!

— মা মা— তুমি গাল দিয়ো না, চিৎকার করে ওঠে নবী— গুনা অইব মা, আল্লা রাগ করব।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়— গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তার। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মায়ের হাত।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে বলে গেছে— নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেয়া হল আজ থেকে। দোকানির কাছেই শুনেছে হালিমা— নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি ওড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, আর ইস্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিল হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কী? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।— হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা-বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে! আমি মরলে জিবরাইল খাঞ্চা খাঞ্চা ভাত লইয়া আইব না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ— চিৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেঁহুশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মা'র দিকে একবার চায়— এবং কিছু না বলে ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির উপর। কিছুই পেটে পড়ল না তার। শুয়ে শুয়ে, কপাল কুঁচকে ঠোঁট ফুলিয়ে সে কটমট করে। তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, সে নিজেই জানে না!

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখল, জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করছে। এক সময় নীল আসমান দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল জিবরাইলের জন্যে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবার যাত্রা শুরু হল— আবার একটা আসমান ফাঁক হয়ে গেল— আবার আরেকটা— ষষ্ঠ আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল জিবরাইলের ডানায়,— জিবরাইল তবু এগোচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে! তারপর এক সময় খুলে গেল সপ্তম আসমানের দরজা আর তার ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিল নবীর চোখ দুটোকে। আর চাইতে পারল না নবী— দুচোখে হাত দিয়ে চিৎকার করে ওঠে ঘুমের ঘোরে— মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেল!

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী— গলে যাওয়া দেয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে-মুখে এসে লাগছে।

আবু ইসহাক

বনমানুষ

নতুন চাকরি পেয়ে কলকাতা এসেছি। সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি। যে-কোনো সময়ে, বিনা-কারণে ও বিনা-নোটিশে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগপত্রে এসব শর্ত দেখেও ঘাবড়াইনি একটুও। বন-বিভাগে চাকরি করতাম ষাট টাকায়। এখানে পাব একশো তিরিশ টাকা। ডবলেরও বেশি। এমন সুবর্ণ সুযোগ কোনো নির্বোধ পায়ে ঠেলে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর যাই হোক, আমি দুপায়ে হাঁটি। জঙ্গলে যারা চার পায়ে হাঁটে, তাদের প্রতিবেশে থেকে আমার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়নি। সত্তর টাকা বেশি পাব— এ কি যেমন-তেমন ব্যাপার! বিয়ে করেছি অল্পদিন। এখন ডবল টাকারই দরকার। তাছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্যসমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।

চাকরিতে যোগ দিয়েছি গতকাল। আজ দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। ন'টা না বাজতেই খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। মেসের খাওয়া। কী খেলাম বলব না। বলতে লজ্জা করে। তাছাড়া খাওয়াটা গৌণকর্ম, নেহায়েতই রান্নাঘরের ব্যাপার। যা মুখ্য তা হচ্ছে আমাদের পোশাক। সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। কোনোরকমে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও এ দেহকে দুরস্ত খোলসে ঢেকে ভদ্রলোক সাজাতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই ভদ্রসমাজে বের হওয়ার। আমাদের মতো খুদে অফিসারদের ব্যাপার আরো জটিল। কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে দুরস্ত হওয়া চাই, নয়তো ওপরওয়ালা সায়েবদের সুনজর হবে না কোনোদিন। তাঁদের কথা: ঘোড়ায় চড়ে না হোক, গাধায় চড়েও কেন আমরা তাদের অনুসরণ করব না? অফিসে তাই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের হয়ে দাঁড়ায়।

মেসের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে গলগ্রন্থিটা কোনোরকমে বেঁধে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিই। আয়নায় মুখ দেখে ভালো লাগে না। দাড়িগুলোর কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। অথচ গতকালই দাড়ি কামিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি 'সেফটি রেজার' বের করে ওই অবস্থায়ই কয়েক পোঁচ টেনে নিই। কিন্তু কোটের কলারটায় সাবানের ফেনা লেগে যায়। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে চুলে চিরুনি চালাই আর-একবার। তারপর জুতোজাড়া পায়ে ঢুকিয়ে আর একদফা আয়নায় মুখ দেখে বেরিয়ে পড়ি।

ন'টা বাজে। পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকি। গলি নয় ঠিক। দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরুপথ। গা বাঁচিয়ে একজন যেতে পারে কোনোমতে। মাঝপথে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক আসছিলেন ওদিক থেকে। দেহের আয়তন তার নিতান্ত ছোট নয়। তাই কোলাকুলিটা হয়ে যায় ভালোভাবেই। তারপর একজন, আরও একজন, আরও একজন। কোলাকুলি সেরে বেরিয়ে যান তারা। কোলাকুলিটা যদিও সকলের সাথে সমান জমে না, তবুও মনে হয় মানুষে মানুষে হানাহানির এ সময়টায় অজানা-অচেনায় এরকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।

আর মাত্র কয়েক কদম পার হলেই বড় রাস্তা। দেয়াল ছেড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্রমহিলা গলিটায় ঢুকে পড়েছেন। আমার সামান্য কয়েক কদমের পথটুকু পার হবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়েই আসছেন তিনি। এবার আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পিছু হেঁটে শেষটায় উপায় করতে হয় আমাকেই।

দেয়ালে ঠেস্ দেয়ায় ছাতলা লেগেছিল কোটে। রুমাল বের করে ঝেড়ে আবার পথ দেখি আমি। এবার আর সোজাপথে নয়। সোজাপথটাই দেখছি কঠিন বেশি। বেনেপুকুর লেন ঘুরে লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে ইলিয়ট রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াই।

ধর্মঘটের জন্যে ট্রাম বন্ধ। আমাকে যেতে হবে ৮ নম্বর বাসে। এক এক করে কয়েকটা বাস চলে যায়। কতবার হাতল ধরতে গিয়ে পিছিয়ে যাই। সাহসে কুলোয় না। লোকসব বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ হবার পাত্র আমি নই। দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি অন্তত একটা পা রাখবার জায়গাও যদি মিলে যায়।

একটা বাস এসে থামে। পা রাখবার জায়গা নেই। তবুও সব লোক ছুটোছুটি করছে, কে কার আগে উঠবে। চাকরি ঠিক রাখার কী প্রাণান্ত চেষ্টা। একটা লোক নেমে যায় ড্রাইভারের কুঠরি থেকে। মহাসুযোগ! পাশের কয়েকজনকে টেক্কা মেরে চট করে উঠে পড়ি আমি। চাকরি গেলে আমার চলবে না। হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কা মেরে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'মানুষ, না জানোয়ার!'

লোকটা কি গণক নাকি! গণকের মতো ঠিকই তো বলেছে সে! আমি জঙ্গলেই তো ছিলাম অ্যাদ্দিন!

লোকটাকে ধন্যবাদ দেয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। ঘাড়টা নুইয়ে গায়ে গায়ে মেশামেশি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মেশামেশিটা আগের কোলাকুলির মতো প্রীতিকর হয় না। আমি শেষে ঢুকে অনেকের অসুবিধে করেছি। ঠেলা-ধাক্কাটা তাই আমার দিকেই আসছে বেশি করে। পাঁজরের হাড়গুলো চাপ খেয়ে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। আর দেরি নয়, পরের স্টপে থামতেই আমি নেমে যাই।

এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল যেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সজীব করে নিই খোলা বাতাসে। স্যুটটার দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। ভেতরের ঘামে আর ওপরের ঘষায় ইস্ত্রি ভেঙে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এবার পাদুটোকে সম্বল করেই ছুটব ঠিক করলাম।

কলকাতা এসেছিলাম অনেকদিন আগে একবার। পথ-ঘাট ভালো মনে নেই। পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকের দিকে। এই পোশাক ছাড়া কার কী ধর্ম জানবার উপায় নেই। কারণ ধর্মের কথা গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মধারীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমার চেহারা দেখে কিন্তু কারো বুঝবার যো নেই, আমার ধর্ম কী। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধার্মিক পোশাকে ঢেকে নিয়েছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ? মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আন্তঃধার্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে-কোনো দিকের চাকু খাওয়ার ভয় আছে আমার। মুসলমান আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হল!

ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করে। মন ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। একশো তিরিশ টাকার চাকরিটার ভার ছেড়ে দিই পাদুটোর ওপর। শুধু তাই নয়, মনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেহের ভারটাও।

এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। কাছাকাছি একটা প্রাণীও দেখছি না যে! বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সুমুখের একটা দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকজন কী যেন দেখছে রাস্তার দিকে। উপর থেকে নিচের দিকে চোখ নামাতেই চোখ ফিরে আসে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিনতে ভুল হয় না। মানুষ! হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। রক্তে রাঙা স্রোত ড্রেনে গিয়ে মিশেছে।

নিমেষে পেছন ঘুরে অন্য পথ ধরি। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও তাকাই না ফিরে। কিন্তু কে যেন গর্জে ওঠে, 'ঠায়রো'।

দু'জন সার্জেন্ট রিভলবার হাতে এগিয়ে আসে। আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তারা। কিন্তু ফাঁসাতে পারে না। নিয়োগপত্রটা পকেটেই ছিল। সেটা দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যাই।

এবার আরেকটা রাস্তা ধরে হাঁটি। হাঁটি সুমুখে পেছনে চেয়ে। মারটা নাকি পেছন থেকেই আসে। এক-একজন লোক চলে যায় পাশ কেটে, মনে হয় এক-একটা ফাঁড়া কেটে যায় আমার। আমার সতর্ক চোখদুটো আড়চোখে তাকায় সবার দিকে। কিন্তু তারাও যে সতর্কদৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকায়! আমাকে— আমার হাতদুটোকেই বোধহয় তাদের ভয়। তাদের ভীত চাউনি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমিও আমার অনুগত হাতদুটো ছাড়া আর কারো হাতকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদূর আগে ডানদিকে একটা পাশগলি। গলির মুখে তিনটে লোক। তাদের পোশাক দেখে চমকে উঠি। তাদের ভাবগতিকও কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটায় ঢিপঢিপ শুরু হয়েছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণী উঁচু-গোড়ালি জুতো পায়ে আসছে গট্‌গট্ করে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যাই। গলির মুখের লোকগুলোকে বোঝাতে চাই, আমি তরুণীটির জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তারই সাথী আমি। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলে হয়। আমার যেরকম গায়ের রঙ! অবশ্য এ-রকম রঙের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের অভাব নেই কলকাতা শহরে।

আমার পোশাক দেখে লোকগুলো না-হয় আমাকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠাওরাল। কিন্তু তরুণীটিকে কী বোঝাব? আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী মনে করবে সে?

আমি উবু হয়ে বাঁ-পায়ের জুতো খুলি। জুতোর ভেতর কাঁকর ঢুকেছে এমনি ভান করে জুতোটা উপুড় করে ঝেড়ে নিই কয়েকবার। তারপর আবার পায়ে ঢুকাই। তরুণীটি আমার কাছে এসে গেছে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে এবার তার পাশাপাশি চলতে শুরু করি। এখন ঠিক মনে হচ্ছে— রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতি। অন্য'র কী মনে হচ্ছে জানি না। আমার কিন্তু ও-রকমই মনে হচ্ছে। এক-পা দুপা করে গলির মুখ পার হয়ে যাই।

ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার নীরব সঙ্গিনী একবার কটমট করে আমার দিকে তাকায়। তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মনটা মিইয়ে যায়। কিন্তু তবুও তার সঙ্গ ছাড়তে ভরসা পাইনে।

পাশাপাশি হেঁটে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাই। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে সে, 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'না— না— ।' আমি থতমত খেয়ে যাই।

'না মানে! বহুক্ষণ ধরে আমি লক্ষ করছি। পুলিশ ডাকব?'

'না— না, মানে— ইয়ে, মানে গুণ্ডার ভয়ে—'

'গুণ্ডার ভয়ে!'

'হ্যাঁ, তাই— তাই আপনার সাথে সাথে এলাম।'

'অবাক করলে! এক জোয়ান পুরুষ, তাকে রক্ষা করবে মেয়েমানুষ! আচ্ছা কাপুরুষ তো!' অবজ্ঞার হাসি তরুণীটির মুখে।

কিছুদূর গিয়ে মহিলা বাঁ-দিকে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। আমি মোড় নিই ডানদিকে।

পাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে আসছে না আমার দিকে!

'উহ্ মাগো' বলে লাফ দিয়ে সরে যাই কয়েক হাত। ফিরে দেখি একজন জটাধারী ফকির হাসছে আমার অবস্থা দেখে। এগিয়ে এসে সে বলে, 'ভয় পেলি নাকি? দু'দিন খেতে পাইনি। দুটো পয়সা দে।'

রীতিমতো ঘাম দিয়েছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তবু হাতে চাকু না-থাকার জন্যে ফকিরটাকে ধন্যবাদ দিই মনে-মনে আর পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে তার দিকে ছুড়ে মারি।

চৌরঙ্গী এসে পড়েছি। একটা লোক হঠাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'ফটো তুলবেন? আসুন। এক টাকায় তিন কপি।'

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। মানুষের ভয়ে ভীত মানুষের ফটোটা তুলে রাখা উচিত ছিল আমার।

এক পয়সার একটা 'পাসিং শো' সিগারেট কিনে রশির আগুনে ধরাতে যাব, হঠাৎ কার স্পর্শে শিউরে উঠি।

চেয়ে দেখি, আমাদের সুভাষ মুচকি হাসছে। সহপাঠী বন্ধুর আলিঙ্গনে বুকের ভেতরটা যেন ভিজে ওঠে। কিন্তু ওর বুকটা শক্ত লাগল না! জামার উপর হাত রাখি। তাই তো!

সুভাষ হেসে বলে, 'হাত দিয়ে দেখছিস কী?'

'দেখছি, মানে— তোর বুকটা শক্ত লাগছে কেন রে?'

'শক্ত লাগছে হুঁহ্ হুঁ! এ জিনিস দেখিসনি কখনো। লোহার তারের গেঞ্জি। একেবারে নয়া আবিষ্কার।'

'নয়া আবিষ্কার।'

'হ্যাঁ এ বর্ম ভেদ করবে চাকু? উঁহুঁ—!'

সুভাষের জামার উপর হাত দিয়ে দিয়ে আঁচ করতে পারি, লোহার তার দিয়ে তৈরি হাতাকাটা গেঞ্জি। মন্দ জিনিস নয়। সহসা আঘাত করে কিছু করতে পারবে না।

আমি হেসে বলি, 'কিরে চাকু-টাকু লুকোনো নেই তো?'

'নেই তো কী! নিশ্চয়ই আছে। এক্ষুনি তোর বুকে বসিয়ে দেব। তোর রক্ত দিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে কালীপুজো করব।'

'এখানে কী করিস?'

'পড়ি আর্ট স্কুলে।'

'আর্ট স্কুলে! ঠিক আছে। শোন্, তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে। মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে। পারবি তো?'

'তা দেখব চেষ্টা করে।'

আরো দু-এক কথা বলে বিদেয় হই তাড়াতাড়ি। দশবছর একসাথে পড়েছি, খেলাধুলো করেছি। আজ দশটা মিনিটও কথা বলবার ফুরসত নেই। গোলামি ঠিক রাখতেই হবে।

হোয়াইটঅ্যাওয়েের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। সাড়ে দশটা বাজে। আমারটা তা হলে বন্ধ হয়ে আছে? তাই তো! এই রে চাকরি বুঝি গেল! ডালহৌসি পর্যন্ত হেঁটে গেলে দেরি হয়ে যাবে অনেক। পকেট হাতড়ে আটআনার পয়সা পাওয়া যায়। বাস ভাড়া ও টিফিনের পয়সা। রিকশা ডেকে উঠে পড়ি। টিফিন চুলোয় যাক।

অফিসে পৌঁছে শুনি হাজিরা বই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে চলে গেছে। রোজ সোয়া দশটার সময় হাজিরা বই তাঁর ঘরে চলে যায়। যারা দেরিতে আসে, তাদের কৈফিয়ত আদায় করে হাজিরা বইয়ে সই করতে দেন তিনি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে ঢুকি। শ্বেতাঙ্গ সায়েব। কিছুক্ষণ আগে, অফিসের গেট পার হয়ে আসার সময় তাঁকে গাড়ি করে আসতে দেখেছি। আমাকে দেখে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বলেন, 'এত দেরি করে এসেছ কেন? এখন এগারোটা বাজে। এরকম দেরি করে এলে চলবে না, বুঝলে?'

অফিসে নতুন ঢুকেছি, তাই বোধহয় বেশিকিছু শুনতে হয় না। কিন্তু আমার মেজাজটা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে হয়, 'আমার পায়ে তো আর চাকা লাগানো নেই আপনার গাড়ির মতো!'

হাজিরা বইয়ে নাম সই করতে যাব, ফাউন্টেন পেনটার জন্যে উপরের পকেটে হাত দিই। কই, নেই তো! এ-পকেটে ও-পকেটে খুঁজি। কিন্তু পাওয়া যায় না আর। সায়েবের টেবিল থেকে কলম তুলে হাজিরা বইয়ে সই করে বেরিয়ে আসি। পকেটগুলো হাতড়ে দেখি আবার। মেসে রেখে আসিনি। পকেটে তুলেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে। তা হলে! বাসের মধ্যে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে 'জানোয়ার' বলেছিল যে-মানুষটা তার কর্ম নয় তো!

আমার পোস্টিং হবে কোনো এক শাখা-অফিসে। অফিসের বড়কর্তা কতকগুলো ফাইল দিয়েছেন। পোস্টিং না-হওয়া অবধি কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে। ফাইলগুলোয় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কলমটার বিচ্ছেদে মন বসে না। পাঁচ মাস বাড়িতে পাঁচ টাকা করে কম পাঠিয়ে পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম কলমটা। জোর করে কাজে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু বারবার কলমটার কথাই মনে পড়ে।

আমি কথা বলি কম। জঙ্গলে তাই অ্যাদ্দিন টিকতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকালয়ে অনেকেই আমাকে বোকা মনে করে। তার প্রমাণ অফিসের মাঝেও আজ পেলাম। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশের মধ্যে ফাইল খুলে পড়ছি চুপচাপ। এমন সময় মিস্টার জাফর আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ যোগগুলো করে দিন তো। দেখবেন, ভুল হয় না যেন।'

লম্বা লম্বা যোগ। মনোযোগ দিয়ে না করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। একমনে যোগ করছিলাম। হঠাৎ মিহি হাসির শব্দে আমার মনোযোগ টুটে যায়। মাথা তুলে দেখি—মিস ঘোষের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ গল্প জমিয়েছেন মি. জাফর। বারে বাহ্! যোগ করে মরছি আমি, আর যোগাযোগ করছেন উনি। আচ্ছা লোক তো!

অনেকক্ষণ গল্প করে আমার কাছে এসে জিগ্যেস করেন মি. জাফর, 'কদ্দূর করলেন? হয়েছে?'

অফিসে চুপচাপ বসে থাকলেও এর মধ্যে অনেককেই আমি চিনে নিয়েছি। মি. জাফরকে চিনি না, এমনি ভাব দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলি, 'না স্যার, এখনো হয়নি। যোগাযোগের কাজে আমি খুবই কাঁচা। আর একটা কথা স্যার, মাফ করবেন! আপনার সাথে এখনো আলাপ হয়নি। আপনি কি চিফ অফিসার?'

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে চলে যায় মি. জাফর। আমি জানি, জাফর আলী ষাট টাকার কেরানি। হেডঅফিসের লোক কিনা, তাই সুযোগমতো শাখা-অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর ওপরও ছড়ি ঘোরাতে চায়।

পাঁচটা প্রায় বাজে। ফাইলপত্র আলমারিতে রেখে বেরিয়ে যাব, এমন সময় মিস ঘোষ ডাকে, 'শুনুন তো।'

মিস্ ঘোষ ষাট টাকা মাইনের টাইপিস্ট। কাছে যেতে একটা ফাইল দেখিয়ে বলে, 'এটার মধ্যে কতকগুলো টাইপ-করা কাগজ আছে। মি. জাফরকে নিয়ে এগুলো কম্পেয়ার করে রাখবেন। কাল আমার আসতে দেরি হবে।'

অনুরোধ নয়, একেবারে আদেশ। আমার রাগ ধরে। এরা পেয়েছে কী! আমি নিরীহ বলেই কি এভাবে ফ্যাগ খাটতে হবে? কিন্তু নিরীহ হলেও সাপের মন্তর জানি আমি। বলি, 'মাফ করবেন, ম্যাডাম। আপনার সাথে এখনও পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আপনি নিশ্চয় অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট।'

মিস ঘোষ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি, মন্তরটা একটু কড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কী করা যাবে? হুকুম দেয়ার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল তার।

অফিস থেকে বার হই। আবার সেই বাস, লোকজন, ভিড়। সেই পথ, পথচারীর ভীত চাউনি। মনটা দমে যায়।

হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গী পর্যন্ত আসি। কিন্তু পা আর চলে না। চলবার কোনো হেতু নেই যে! ভোরে যা খেয়েছি, আর এ-পর্যন্ত এক পেয়ালা চা-ও না। কার্জন পার্কে বসে পড়ি। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। ভিড় কমলে বাসেই যাব।

সাড়ে ছ'টার সময় বাসে একটু জায়গা পাওয়া যায়। পঁ-পঁ করতে করতে বাস ছুটছে। এত ভিড়, বাইরের কিছুই দেখা যায় না। বুঝতে পারছি না, কোন্ রাস্তা ধরে চলছে গাড়ি।

বুম্— ম্—

আবার বুম্— ম্—

ভীষণ শব্দ। কানে তালা লেগে গেছে। শুনতে পাই না কিছু। শেয়ালের ভয়ে খাঁচার মোরগের মতো করছি আমরা।

তারপর কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে বাসখানা চলে এল, অত খেয়াল নেই। কয়েকজনের মুখে শুনলাম, বাসের পাদানির উপর থেকে দু'জনকে দু'পেয়ে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। আর অনেকের হাত-মুখ নাককান ছিঁড়ে গেছে বোমার আঘাতে।

ঘরের কাছে এসেও আর-একবার শিউরে উঠি। অক্ষত দেহে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিথিল শরীরটাকে টেনে এনে বিছানায় ঢেলে দিই। মানুষের মাঝে একদিন চলেই মুষড়ে পড়েছি আমি। আমার সমস্ত রাগ ঘৃণা আজ মানুষের ওপর।

চোখ বুজে ভাবছি— পদত্যাগপত্রটা প্রত্যাহার করার এখনো হয়তো সময় আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটাই ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহরে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

পথ জানা নাই

মাউলতলার গফুর আলী ওরফে গহুরালি প্রায় উন্মত্তের মতো একখানা কোদাল দিয়া গ্রামের একমাত্র সড়কটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিতেছিল।

তাহার এই মত্তজনোচিত কার্যের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে; দীর্ঘ এক কাহিনীও বলিতে পার তাহাকে। একটু সহানুভূতির সহিত সে ইতিহাস বিচার করিলে তাহার এ কার্যের একটা সমর্থনও হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নহিলে যে সড়ক একদা সকলেরই সমবেত চেষ্টায় গ্রামের উন্নতিকল্পে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এমনকি গহুরালিও যাহার জন্য তাহার স্বল্প জমির বিরাট একটা অংশ ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিল, হঠাৎ তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য সে-ই বা এমন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিবে কেন?

এই গতযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের যে গ্রামগুলি বহির্গজতের সহিত একপ্রকার সম্পর্কশূন্য থাকিয়াই সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা যাপন করিতেছিল, এই মাউলতলা গ্রামও তাহাদের একটি। বিরাট এই দেশের ইতিহাসে রাজ্যরাষ্ট্রের ভাঙাগড়া বহুবার ঘটিয়াছে; সুদূর দিল্লি কিংবা ঢাকা মুর্শিদাবাদের বাদশাহি তখতে কত রাজশক্তির উত্থান পতন ঘটিয়াছে— মগ, পর্তুগিজ, বর্গির বন্যা কতবার কত স্থানে ঝড় তুলিয়া বহিয়া গেছে, কিন্তু মাউলতলার স্বকীয় জীবনযাত্রায় তাহা কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। ইংরেজ সভ্যতা সনাতন ভারতবর্ষীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির মর্মমূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু এই যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত মাউলতলা গ্রামে তাহার কোনো বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় নাই।

অন্তত এই সড়কটি নির্মিত হইবার পূর্ব-পর্যন্তও মাউলতলার সম্পূর্ণ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য লইয়াই বাঁচিয়া ছিল।

তখনকার মাউলতলার কথা এখন হয়তো নিছক কাহিনীর মতোই শোনাইবে তোমাদের কাছে। এখানকার মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম করিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শস্য ফলাইত; ভোগের অধিকার লইয়া আদিম বীরত্ব সহকারে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিত, জোর করিয়া ধরিয়া আনা মেয়েমানুষকে বিবাহ করিয়া ভালোবাসিত আর অবসর কালে গান কিংবা পালা বাঁধিয়া আনন্দ উৎসব করিত। বাহিরের জগতের সহিত কোনোরূপ যোগাযোগ একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে।

জীবনযাত্রার একটা একান্ত নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতি ও পদ্ধতি ছিল। বিংশ শতাব্দীর বণিকসভ্যতার কিছুমাত্র স্পর্শ তাহা ব্যাহত করে নাই।

কিন্তু ক্রমে করিল—

একদিন এই গ্রামেরই একজন পুরুষ তরুণ বয়সে ছিটকাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; ধরিতে পার এখন হইতে সে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। সে যখন আবার ফিরিয়া আসিল তখন সাথে করিয়া সে শুধু ধনসম্পদই আনিল না, আপাতদৃষ্টিতে উন্নততর আরেক জীবনপদ্ধতি ও সভ্যতা যেন সে তাহার চিন্তা-কর্ম-চারিত্র্যে বহন করিয়া আনিল। কৌতূহলীচিত্তে সেদিন মাউলতলাবাসীরা সেদিন তাহার চারিদিকে আসিয়া ভিড় করিল।

সে কহিল— এই মাউলতলার বিল-খাল, ওই বিশখালী; আড়িয়াল খাঁরও ওপাশে, রাজার যে কাছারিতে সকলে বছরে একবার খাজনা দিতে যায়,— তাহারও দূরে আরেকটা দেশ আছে— শহর তাহার নাম,— সেই দেশের সহিত সেই দেশের জীবনের সহিত পরিচিত না হইলে এই গণ্ডগ্রাম মাউলতলায় এমন হীনভাবে জীবন কাটাইবার কোনোই অর্থ হয় না। মানুষ হইতে হইলে, ভালোভাবে জীবনধারণ করিতে হইলে ওইসব শহর-বন্দরের সহিত যোগাযোগ একান্ত দরকার।

এবং সেক্ষেত্রে তাহার প্রস্তাব হইল, অবিলম্বে এই যোগাযোগের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে একটা সড়ক নির্মাণ করিতে হইবে।

জোনাবালি হাওলাদার সেদিন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিল যে এখন হইতে তাহার স্বীয় জন্মভূমি মাউলতলার উন্নতি করাই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে।

চেষ্টা চরিত্র করিয়া জেলা বোর্ডের দ্বারা সে এই সড়ক প্রস্তুতের বন্দোবস্তও করিয়া ফেলিল। মাউলতলার স্বল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন যাহারা, তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহে গ্রামোন্নয়নের তথা স্ব স্ব জীবনোন্নয়নের কাজে লাগিয়া গেল।

কিন্তু মুশকিল বাধাইল এই গহুরালির মতো দরিদ্র প্রজারা। সড়ক প্রস্তুতের জন্য তাহাদের জমির যে অংশখানি পড়িবে তাহা তাহারা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইতেছিল না।

গহুরালি বলিল : মোড়ে পাঁচকুড়া আমার ভুঁই, হের দুই কুড়াই সড়কে খাইলে আমি খামু কী?

জোনাবালি জবাব দিয়াছে : আরে মেয়া, কেবল ক্ষেতের ধান বেচইয়াই পয়সা হয় শেখছ এতকাল। সড়কটা হইতে দেওনা, দেখবা উপায়ের আরো কত রাস্তা খুইলয়া যায়। কইলাম যে, এ সড়কের বলইয়াই ভাইব্যোনা, এ তারো চাইয়া বড় জিনিস। সবকথা তো বোঝবা না, তউ কই হোনো এ রাস্তা নোতুন জহীবনেরো।

গহুরালি কী বুঝিয়াছে, প্রতিবাদের তীব্রতা কিছুটা কমিয়াছিল বৈকি। একে জোনাবালির মতো ধনী মানী লোকের কথা; তাহার উপরে স্বপ্নের মতো সেদেশের বর্ণনা শুনিয়া তাহারও মন তখন এক অদ্ভুত সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সড়কের কল্যাণে বাস্তবিকই যে জীবনের সম্মুখে এক নতুন পথ প্রসারিত হইয়া

পড়িবে না তাহা কে বলিতে পারে। জোনাবালির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার যে জমিখানার উপর সড়ক যাইবার কথা, তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

এখনও— এই অগ্রহায়ণের শেষেও প্রায় গোড়ালির উপর পর্যন্ত সেখানে কাদায় ডুবিয়া যায়। ধান পাকিতেছে, তাহার শীষগুলি নুইয়া পড়িয়াছে স্তবের মতো, অধিকাংশই লুটাইয়া পড়িয়াছে কাদার মধ্যে। মজা বিলের জমি— এমন হইবেই। কোনো বৎসরই লাভজনক ফসল এখানে হইতে পাওয়া যায় না। পানি জমিয়াই প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। তবু এদিনে ক্ষেতখানার দিকে চাহিয়া তাহার মন ভরিয়া উঠিত এতকাল; আজ কী জানি কেন মনটা খুব বিরস হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল আর কাঁহাতক এইভাবে দুটি দুটি ধান খুঁটিয়া জীবন চালানো যায়। তাহার চেয়ে সম্মুখে যে নয়া জীবনের হাতছানি তাহাকে বরণ করিয়াই দেখুক না এবার। জোনাবালির কথায় সুখসমৃদ্ধি, মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকা সবই নাকি তাহাদেরও জীবনে সম্ভব হইতে পারে। শুধু যে আবহে— যে রীতিতে জীবন চলিত এতকাল তাহাকে পালটাইয়া নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। দোষ কী, দেখুকই-না একবার পরখ করিয়া। জোনাবালি, দশবৎসর পূর্বেও যাহার পিতা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া একমুষ্টি অন্নসংস্থান করিতে পারিত না, তাহারই পুত্র যখন আজ সেই জগতের কল্যাণে জীবনে অগাধ ধন ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি আহরণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই-বা কেন তাহাদের তাকৎ হিম্মত লইয়া ভাগ্য বদলাইতে পারিবে না?

বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীকে কহিল : ঠিক করলাম, রাস্তার লইগ্যা দিমু জমিটা ছাড়ইয়া।

বউটি অল্পবয়সী হইলেও বুদ্ধি নিতান্ত কম ছিল না, ভাত বাড়িয়া দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুকাল; কহিল : তা হইলে খামু কী?

: অতশত ভাবতে গেলে কী আর দ্যাশের দশের কাম হয়? সকলেরই মঙ্গলের জন্য যে কাম তার লইগ্যা সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হইবে। গহুরালি অবিকল জোনাবালির কথাগুলি স্ত্রীকে বেশ ভারিক্কিচালে শুনাইয়া দিল।

স্ত্রী তবু খুঁত খুঁত করিল : বুঝি না দ্যাশের দশের কাম কারে কয়— মৌলবি সাইবে তো কইয়া গেলে বেশ আছি আমরা, রাস্তা-ফাস্তা বানাইয়া এম্নে এম্নে গেলে জীবনে আরো কষ্ট বাড়বে ছাড়া কমবে না। আরো কইলেন বোলে হগোলডিরে বাইর অওনইয়া স্বভাবে পাইছে, এয়া ভালো লক্ষণ না।

: থুইয়া দেও হের কথা। নতুন কোনো জিনিস করতে গেলে একদল মানুষ চাইর দিক দিয়া এরহম বাধা দেয়ই।

স্ত্রী তবু বলিল : না হয় বোঝলাম দশের উপগারের কাম। তউ ওয়া কী আমাগো করা সাজে, যাগো খাইয়া পড়ইয়াও বাড়তি আছে হেরা করুক গিয়া। রাস্তা আমাগো অইলেই-বা কী না-অইলেই-বা কী।

গহুরালি কহিল : মাইয়া মানষের বুদ্ধি তো। যে জিনিস যার নাই, হের লাইগ্যা তারই তো বেশি আহইট। যাগো আছে তাগো গরজ কী। সক্কলের মঙ্গল মাইনিই তো আমাগোও মঙ্গল।

পরে সে হাজেরাকে ক্ষেতের যে উঁচু পাড়ে তাহাদের বাড়ি, তাহারই কিনারে ডাকিয়া লইয়া গেল। জোনাবালির নিকটে রাস্তার বর্ণনা সে যেমন যেমন শুনিয়াছে ঠিক সেইভাবেই তাহার নিকট বর্ণনা করিয়া গেল। আঙুল দিয়া দেখাইয়া শাদা মেঘের ভেলা ভাসানো নীল আকাশের নিচের রৌদ্র ঝিলমিল দিগন্তের দিকটা। সবুজ বনানীর সীমারেখায়, কাশবনের উদ্দাম ইশারায় সে দিগন্ত যেন কোনো সুদূর স্বপ্ন-রাজ্যে হারাইয়া গিয়াছে।— আর মুখে সে আবৃত্তি করিল জোনাবালির সেই কথা কয়টি : এ কি কেবল সড়ক একটা নতুন জীবনেরও রাস্তা। সুখের আর সমৃদ্ধির— হাজেরা আর সে সেই সড়ককে কল্পনায় দূর হইতে দূরে বিছাইয়া চলিল। পৃথিবী যতখানি তাহাদের ধারণায় কুলায়, যেন তাহার শেষ সীমানা অবধি এতকাল আচরিত জীবনের প্রতি মনে মনে তখন বিদ্রোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে; উন্নততর জীবনের জন্য মনের গতি তখন বাধা-বন্ধহারা। এই সড়ক তাহাদের সে কামনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারিবে কিনা তাহা বিচারের সাধ্য তাহাদের ছিল না, বিশ্বাসেই তাহারা উজ্জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গহুরালি জোনাবালিরও তুলনায় অপরূপ বর্ণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র হাজেরার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল সরলা গ্রাম্য তরুণী হাজেরা অর্ধ-বিশ্বাস অর্ধ-অবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। গহুরালির হাত স্পর্শ করিয়া বারংবার সে জিজ্ঞাসা করিল : সত্য? হাচইও?

: দেখবাই ভবিষ্যতে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ কথাটির ব্যাপ্তি বড় বেশি। সময় সময় তাহার অন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া মনে হইলেও, তবু কার্যকালে তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। গহুরালিও তাহার পরিমাণ করিতে পারিল না।

অবশেষে সমস্ত বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা কাটাইয়া সড়ক নির্মাণ শেষ হইল। জোনাবালি দুই দুইটা গরু জবেহ করিয়া শ্রমিকদের আপ্যায়িত করিল। সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরিক হইল। রাত্রে বসিল পালাগানের আসর। এমন উৎসব এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবন বড় বহুবার করে নাই।

পুরুষেরা একে একে প্রায় সকলেই একবার করিয়া শহর ঘুরিয়া আসিল। এবং সকলেই আসিল কিছু না কিছু সেই সভ্য জগতের চিহ্ন লইয়া। প্রথম উন্মাদনাটুকু কাটাইয়া লোকে অবশেষে সড়কের উপর গরু বাঁধিত; ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে তাহারই পাশে বসিয়া গল্প করিত; হুঁকা টানিত— আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের চার-পাঁচটি যুবক ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া গেল।

গহুরালিও একদিন যে কয়টা পিরহান ছিল একে একে সব কয়টা পরিয়া মাথায় মুখে ভালো করিয়া তেল মাখিয়া প্রসাধন করিয়া একখানা তেল চকচকে বাঁধানো লাঠি হাতে করিয়া তিনদিন ধরিয়া শহর বন্দর ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল।

জোনাবালির কথার চাক্ষুষ প্রমাণ এইবার মিলিল। সত্যই তো, এখানকার মানুষেরা সত্যই অভিনব। সুখে-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ আরেক জাতের মানুষের সেখানে বাস। তাহাদের প্রতিটি চালচলন, কথাবার্তা, জীবনরীতি গহুরালির নিকট পরম

লোভনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল। কিন্তু তবু সব দেখিয়া শুনিয়া একটু দুঃখ বরাবরই তাহার মনে খচখচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল, উহাদের যেন ধরা-ছোঁয়া— কিংবা নাগাল পাওয়া যাইতেছিল না। তাহার মতো দীন দরিদ্রের প্রতি সকলেই ভ্রুক্ষেপহীন, দুইদণ্ড থামিয়া এখানে কেহই তো তাহার কুশলও জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করে না কোথায় নিবাস, কোথায় ঠিকানা; তাহাদের মাউলতলাতে অপরিচিতকেও সম্ভাষণের যে রীতি তাহা এখানে নাই। এমনকি কেহ চোখ তুলিয়া তাকায় না, যদিও-বা কেহ কখনো তাকাইয়াছে গহুরালি বড় অস্বস্তি বোধ করিয়া সে দৃষ্টির সম্মুখে। সে দৃষ্টিতে মায়া নয়, মমতা নয়, আত্মীয়তার শুভ ইঙ্গিতও নয়, শুধু তাচ্ছিল্যমাখা বলিয়াই বোধ হইয়াছে তাহার। কেবল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সে সন্ধ্যাকালে বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময়; দুইধারে সারি সারি মেয়েরা— কেহ বিলোল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল, কেহ-বা আহ্বানও করিয়াছিল হাতছানিতে। তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই একটি মেয়ের কী কথায় সকলে যখন হাসিয়া উঠিল, গহুরালি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটি কী বুঝিতে পারে নাই। তবু একটি মেয়ের চোখের চাওয়াটুকু ভালো লাগিয়াছিল।

দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যাকালে সে আবার সেই পথে গেল। সেই মেয়েটি তখনো সেখানে দাঁড়াইয়া। গহুরালি তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময় সে একটু মধুর করিয়া হাসিল। গহুরালির মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া গেল; হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্ধচেতনের মতো সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল : আয়েন।

গহুরালি সম্মোহিতের মতো তাহাকে অনুসরণ করিল।

মেয়েটি তাহাকে লইয়া গেল হোগলাপাতা আর চাঁচ দিয়া বেড়া বুনানো ছোটো একটা ঘরে। একপাশে একটা বিছানা, অন্য দিকে ছোট একটা হ্যারিকেন। মেয়েটি আলোটা উস্কাইয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল : নতুন আইছো গ্যাম থেইক্যা, না?

গহুরালি মাথা দোলাইল।

: বেশ! তা, ট্যাক ভারি আছে তো? দশ টাকার কম কাম অইবো না, কইলাম। দেহি কতো আছে,— বলিয়া মেয়েটি তাহার কোমরে হাত দিল। গহুরালি যেমন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল তেমনি ভয়ও পাইল। বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও তাহার ছলনায় শেষ পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরেই গহুরালির প্রায় সবই আদায় করিয়া মেয়েটি তাহাকে উঠাইয়া দিল : আরো রইলে টাকা আরো দেওয়া লাগবে; এহোন যাও মিয়া।

প্রতিদানে গহুরালি কী পাইল তাহা সে-ই জানে। তবু এই অনাত্মীয়দেশে আত্মীয়তা বলিয়া, সহৃয়তা বলিয়া সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা একেবারে মনে চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল।

মনে মনে গভীরভাবে সে উপলব্ধি করিল এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসের যাচাই। পয়সাই এখানকার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাণের কোনো মূল্য ইহারা

দেয় না। বড় একাকী আর নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহার। তৃতীয় দিন সকালে একটা বিরূপ বিরস মন লইয়া সে গ্রামের পথ ধরিল।

তবু সারাপথ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই পয়সার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিল। এবং পয়সা উপায়ের পথ খুঁজিতেই তখন হইতে তাহার ব্যস্ততা শুরু হইল। হতাশ হইয়া এ পথে কিছু করা গেল না বলিয়া অন্য চেষ্টার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার মতো মুখ তো তাহার নাই। মনে মনে একটু দমিয়া পড়িলেও স্ত্রীর নিকট যে বাহাদুরি করিয়াছে একদা— তাহারই জন্য সে হাল ছাড়িল না।

শুধু সে একাই নয়, আরো পাঁচ জন মিলিয়া তরিতরকারি, মাছ যে যাহা জোটাইতে পারে তাহা লইয়া সে পথে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। এমন যে থানকুনি পাতা— যাহা এখানে বনেবাদাড়ে অজস্র জন্মায়, কেহ ফিরিয়াও দেখে না, শহরে তাহাতেও পয়সা। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামীণ প্রতিটি বস্তু শহরের পথে নীত হইতে লাগিল। হাজেরা একদিন পরিহাস করিয়া কহিল : যা আরম্ভ করলা, শেষকালে আমাগোও না বাজারে লইয়া যাও।

গহুরালি তখন বেশ দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বছর তিনেকের মধ্যে খোড়ো-ঘরের চাল ফেলিয়া সে টিনই তুলিয়া ফেলিল। যাহারা জোনাবালির কথায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, এবার তাহাদেরও চোখ খুলিল।

কিন্তু এই পথে শহরের ফৌজদারি দেওয়ানিতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিত কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল। এই সড়কেরই চারিদিকে প্রচুর গলি-ঘুঁজিরও সৃষ্টি হইল। অনেক বাঁক, অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল। বুঝি-বা তাহার প্রভাব পড়িল এখানকার লোকের মনেরও উপর।

এমনকি একদিন এই সড়কের উপরেই সামান্য গরুতে ধান খাওয়ার বিষয় লইয়া দুইদলে লড়াই এবং একটা খুন পর্যন্ত হইয়া গেল।

জোনাবালি খবর পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন আসিয়া পৌছিল তখন খুন তো একটা হইয়া গিয়াছেই আর তাহার এত সাধের সড়কের একটা অংশও ঢিল তৈরির কাজে উড়িয়া গিয়াছে।

সকলকে ডাকিয়া কহিল : সড়ক কি এয়ার লাইগ্যা বানাইছেলাম আমরা? আকাটমূর্খ জানোয়ারের দল!

জোনাবালির ভর্ৎসনায় কাহারও মুখে কোনো সন্তুষ্টির চিহ্ন বা ভাবান্তর দেখা গেল না। থানা মামলা-আদালত লইয়াই তখন তাহাদের চিন্তা।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ লাগিল।

তাহার ঢেউ এ পথ বাহিয়া এবার আসিল এখানেও। এ দেশের ইতিহাসে তাহা এই প্রথম, রাজ্য-স্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়ায় এই সব গ্রামের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই কোনোদিন, কিন্তু অতীতের শতশত বৎসর যাহা ঘটে নাই, দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।

চালডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। তাহার সম্মুখে যতটুকু নিরুদ্বিগ্নতা ছিল, তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল।

সুশাসনে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী আসে এই পথ বাহিয়া, আবার, ঘুষ পকেটে লইয়া ফিরিয়া যায়। শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর তাহার সহিত আসগরউল্লার সোমত্ত কন্যা কুলসুম উধাও হইয়া যায়। লড়াই-ফেরত ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে হাত-পা-মুখে ঘা লইয়া শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। আর আসে তরিতরকারি, কাঠ, মুরগি— হ্যানোত্যানো নানা জিনিস কিনিতে মিলিটারির দালাল।

ঘটনাচক্রে তাহাদের একজনের সহিত গহুরালির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তখন মন্বন্তরের কাল। গহুরালির নিদারুণ কষ্ট। ভাবিল, তাহাকে ধরিয়া যদি কোনো একটা উপায় মিলিয়া যায়।

কিন্তু উপায় হইল না কিছুই; কেবল একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া গহুরালি হাজেরাকে খুঁজিয়া পাইল না।

আর সে দালালেরও আর দেখা মিলিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় মাইল সাতেক দূরে একজন চাষির কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, খুব বিহানবেলা এই পথ বাহিয়াই একটি মেয়েমানুষকে একজন পুরুষের সঙ্গে সে যাইতে দেখিয়াছে বটে।

মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে। নিঝুম হইয়া দুটি দিন সে বাড়িতে পড়িয়া রহিল। মনের আবেগ, ক্ষোভ, দুঃখ অনুতাপ কিংবা রাগ কোনো ভাষা পাইল না, রূপ পাইল না; কেবল এক সময় ক্ষিপ্তের মতো একখানা কোদাল হাতে লইয়া সে নিজের যে জমিখানার উপর দিয়া সড়কটা গিয়াছে, সে দিকে ছুটিয়া গেল।

গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল স্ত্রীর শোকে গহুরালি পাগল হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল।

গহুরালি তখন বাস্তবিকই উন্মাদের মতো অবিশ্রান্তভাবে সড়কটাকে কোপাইতেছে। তাহার সব দুর্দশার মূল যে ওই সড়ক এইভাবেই সে তাহাকে ভাঙিয়া মাটিতে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একার চেষ্টাতে সে পারিবে কিনা তাহা একবারও তাহার মনে হইল না।

সকলে প্রশ্ন করিল : আহাহা, এ করো কী গহুরালি?

: ভাঙতে আছি। হাত না থামাইয়াই, চোখ তুলিয়া না চাহিয়াই গহুরালি জবাব দিল।

: ক্যান্?

: ভুল, ভুল অইছিল এ রাস্তা বানাইন্যা। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না; ঠিক অয় নাই।— কোদাল চালাইবার ফাঁকে ফাঁকে গহুরালি যেন স্বগতভাবেই কথাগুলি বলিয়া গেল।

সকলেই ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, ঠিক হইত কী হইলে, কিন্তু গহুরালি দূরের কথা, তাহারা নিজেরাও কি তাহা জানিত! অন্য কোনো নয়া-সড়কের স্বপ্ন তো তাহাদের মনে কেহ জাগায় নাই।

আবদুল গাফফার চৌধুরী
সম্রাটের ছবি

সেকালের দামি সেগুনকাঠের চমৎকার বার্নিশ করা ফ্রেম, ভেতরে সোনালি রঙের ছবি। কত দিন গেল, কত ধুলো ময়লা, ঝড়ঝাপটের ধাক্কা গেছে ছবিটার ওপর দিয়ে; তবু না হয়েছে সেই অপরূপ রঙ ফ্যাকাশে, না হয়েছে সেই চমৎকার বার্নিশ ম্লান। সম্রাট যেন হাসছেন, জর্জ দ্য ফিফ্থ। ঋষিতুল্য দাড়ি, মাথায় চমৎকার মুকুট, আবক্ষ ছবিটায়, চেহারায়, বেশে, ব্যক্তিত্বে কী আশ্চর্য ব্যঞ্জনা, রাজকীয় পৌরুষ। সম্রাট যেন হাসছেন।

ভিজে ঝাড়ন দিয়ে ঘরের মেঝে মুছে, দেয়াল পরিষ্কার করে অবশেষে চাকর হাত দিল ছবিটায়। বারান্দা থেকে খানবাহাদুর চেঁচিয়া উঠলেন, দেখিস, ভাঙিস না যেন।

— না, হুজুর, সাফ করছি।

কাঁধের গামছাটা ফ্রেমে একটু ঘষতেই বার্নিশের রঙটা আরও ঝকমক করে উঠল। খানবাহাদুর ততক্ষণে দরজার কাছাকাছি এসে গেছেন। হঠাৎ একেবারে হা হা করে উঠলেন, করছিস কী, করছিস কী হারামজাদা?

চাকর হতবুদ্ধি। খানবাহাদুরের রাগ আরও বেড়ে গেল।— তোর ময়লা গামছা লাগিয়েছিস্ ওই ছবিতে! শালা জানিস ওই ছবি কার, তোর বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ যার নিমক খেয়ে মানুষ— দৌড়ে যা, আমার টার্কিশ তোয়ালেটা নিয়ে আয়। তারপর ফের ধুয়ে রাখিস।

বাইরে আরও কয়েকজন লোক উঠোনের ঘাস ছেঁটে সমান করছে, ঝাড়ুদার বাড়িময় ঝাঁট দিচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা মিলে বাড়ির সম্মুখেই একটা গেট তৈরি করছে। দুটো কলাগাছও দু'পাশে পুঁতে তার উপর পাতাবাহারের অর্ধচন্দ্রাকার বৃত্ত সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

ছোট ছেলে মজনু ছুটে এসে দাঁড়াল। খানবাহাদুর সেই সকাল থেকে ঘুরছেন। বললেন, কী চাই?

— পয়সা দাও বাবা, চীনে কাগজ কিনব।

— কেন?

— গেটে ওয়েলকাম লিখে সাজাব।

— বেশ, বেশ। খানবাহাদুর খুশি হলেন।

রাস্তায় রোদ তেতে উঠছে। বেলা এখন ক'টা? এগারটা বেজে গেছে বুঝি! ইস্টিমার আসবে সেই সন্ধেয়। পাড়াগাঁর স্টেশন। কোনোদিন-বা জোয়ার না-পেলে

আসেই না। নদীটায় চড়া পড়েছে। যাক তবু লোকজন পানসি নিয়ে এগিয়ে গেছে। বড় ছেলে মনসুর আসবে আজ। সদরের নামকরা তরুণ উকিল, জেলা জজের ছোট জামাই। কত বছর পরে আজ সে গ্রামের বাড়িতে আসছে।

এদিকের কাজকাম প্রায় শেষ। উঠোনের ঘাস এখন নিপুণ কারিগরের হাতে বোনা সবুজ আস্তরণের মতো হয়েছে। ছেলেরা গেট সাজিয়ে খাওয়াদাওয়া সারতে গেছে। খানবাহাদুর গড়গড়ার নল ঠোঁটে চেপে বসবার ঘরের চারদিকটা দেখছিলেন। বেশ হয়েছে। দুপুরের স্তিমিত রোদের আমেজে ঘুমও এসেছিল একটু। দরজায় পায়ের শব্দ হতেই তা ছুটে গেল, কে?

— আমি, বাবা।

— ওহ্ মজনু, কী চাই বাবা।

খানবাহাদুরের স্বর স্নেহকোমল। মজনু এসে কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

— আজ ভাবীও আসবে, না বাবা?

— হ্যাঁ। জবাব দিতে গিয়ে কথাটা আরও ভালো করে স্মরণ হল খানবাহাদুরের। তাই তো, ওদের শোবার ঘরের কী ব্যবস্থা হল?

মজনুকে বললেন, তোমার মাকে একটু ডাকো তো বাবা?

মজনু বলল, মা কি আসতে পারবেন, তাঁর যে বাতের ব্যথাটা আবারও বেড়েছে।

ওহ্! খানবাহাদুর নিজেই উঠলেন। হলঘর পার হতে হতে সাড়া দিলেন, বিবি, শুনছ? ভেতর থেকে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ উঠল, এই যে আসছি।

— আরে না না, তোমাকে উঠতে হবে না। খানবাহাদুর এগিয়ে গেলেন, বললেন, ওদের শোবার ঘরটা ঠিক হল?

— হল আর কি একরকম। আগের খাবার ঘরটাকেই ঝেড়েমুছে দিয়েছি। মিটসেফটা সরিয়ে খাট বিছিয়েছি। ড্রেসিং টেবিলটাও এঘর থেকে ওঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। নিজে দেখবেন চলুন।

আর একবার যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে বিবি উঠে দাঁড়ালেন এক পায়ে, ডান হাতে মজনুকে ভর করলেন। খানবাহাদুর আমতা আমতা করলেন, তুমি আবার কষ্ট করছ কেন?

ততক্ষণে বিবি এগিয়ে গেছেন। আগে এত লোকজন ছিল না। লোক বলতে তো মাত্র স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে। মজনু তখন হাঁটতে শেখেনি। মনসুর ওই বাইরের ঘরেই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ত। তাই অনাবশ্যক ঘরগুলোকে বিবি কোনোটাকে ভাঁড়ার, কোনোটাকে আসবাবপত্রের, কোনোটাকে-বা চাকরবাকরের থাকবার ঘর করে রেখেছিলেন। তার মধ্যে দেখেশুনে সবচেয়ে ভালো, আলোবাতাস খেলে এরকম ঘরটাকে মনসুরের শোবার ঘর করা হয়েছে। কী জানি মনসুরের বউয়ের আবার কী মেজাজ! যা শহুরে মেয়ে বাবা। বৎসরও ঘোরেনি বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে বিবি তার মনের পরিচয় পেয়েছেন বহুদিন আগে মাত্র একবারের সান্নিধ্যের ফলেই।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই বিবি আচম্বিতে ফেটে পড়লেন, সরবতী!

— জ্বী! প্রায় ছুটতে ছুটতে এল সরবতী বাঁদি।

— ওই রানি মাগীর ছবি ওখানে কেন?

সরবতী সদ্য-মোছা ঝকঝকে ঘরের দেয়ালে তাকাল। খানবাহাদুরও তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেল। মজনুর দিকে আড়চোখে চেয়ে তিনি বললেন, ছিঃ ছিঃ, চিল্লাচিল্লি করছ কেন? নামিয়ে ফেললেই তো হয় ছবিটা।

সরবতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা নামিয়ে ছুটল। খানবাহাদুর বিমর্ষ হলেন স্ত্রীর ব্যবহারে। তবু চুপ করে রইলেন। মেয়েদের মন! আজও পরিবর্তন হল না।

চল্লিশ বছর আগের কথা। বিবির বয়স তখন কত? আর এত মেদবহুল দেহ তাঁর তখন কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল! খানবাহাদুরের দাড়ি তখন কত কাঁচা আর ঘন ছিল! তিনি তখন খানবাহাদুর নন, স্রেফ উমর মিয়া, উমর আলী খান। বিয়ের রাতে প্রথম পাতা বিছানা পুরনো না হতেই বিবি একদিন তাঁর দাড়িতে হাত রেখে সন্দিহান ভাবে জিগ্যেস করলেন, ওই ছবিটা কার?

খানবাহাদুর বিবির অজ্ঞতায় স্নেহ প্রকাশ করলেন, চিনলে না? রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা হতেই ঘর সাজাব বলে নিয়ে এসেছিলাম। কেমন, ভালো করিনি?

কিন্তু রানির যুবতী বয়সের সেই স্মিত মুখ, উদ্ধত গ্রীবাভঙ্গি, স্বল্পাবরণ দেহের দিকে চেয়ে বিবি কিছুই বললেন না। খানবাহাদুর অবশ্য তখন বিস্মিত হননি। বিস্মিত হলেন কিছুদিন পরে। ছবিটা দেয়ালে নেই। বিবিকে জিগ্যেস করলেন, ছবিটা কই?

— পড়ে ভেঙে গেছে।

— ভেঙেছে তো কাচ, কাগজের ছবি তো আর ভাঙেনি।

— না, সেটা ফেলে দিয়েছি।

— ফেলে দিয়েছ? বিস্ময়ের পরিবর্তে প্রায় রাগে ফেটে পড়লেন খানবাহাদুর, জানো ছবিটা কার? রামা-শ্যামা তোমার-আমার নয়; রানির— হার ম্যাজেস্টি কুইনের; যার রাজ্যে বাস কর। আর তুমি...

রাগে কথা শেষ করতে পারলেন না খানবাহাদুর। কিন্তু আশ্চর্য, যুবক স্বামীর কাছে সেই প্রথম অপ্রীতিকর ব্যবহার পেয়েও বিবি ব্যথিত হলেন না। বরং একটা দায় থেকে বেঁচে যেন খুশিই হলেন। তা সে রানিই হোক আর যেই হোক; রানি হও তুমি, সিংহাসন আর রাজ্য নিয়ে থাক, নিজের স্বামীর মনে তাকে ঢুক করতে দেবেন না বিবি। দেবেন না এদ্দিন পরে নিজের ছেলের উপরও ঢুক করতে। হোক রানি, বিশ্বাস নেই, আসলে মেয়েমানুষ তো!

ব্যাপারটা খানবাহাদুর বহুদিন পরে আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই আজ চোখের সামনে রানির প্রতি বিবির অসম্ভ্রম দেখেও রাগ করতে পারলেন না। তাতে লাভ নেই। ছবিটা সত্যি সত্যিই ভাঙেনি। বিবিই ফেলে রেখেছিলেন, সেই যৌবনেও স্বামীর রাগকে পর্যন্ত পরোয়া করেননি। বিবিকে বুঝিয়ে লাভ নেই যে, রানি আজ

নেই, আর তার ছবিরও নেই অন্যের মনে তুক করার ক্ষমতা কিংবা হীনতা। কারণ, তিনি রানি।

রিজিয়ার ডান হাতটা মুঠোয় ভরে মনসুর বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল। দরজায় হুলুস্থূল ভিড়। সকলের সামনে খানবাহাদুর আর বিবি দাঁড়িয়ে। পাড়ার মেয়েরা এসেছে দল বেঁধে শহুরে বউ দেখতে। মজনু পর্যন্ত একপাশে দাঁড়িয়ে। ভাইকে দেখে বেশি ঘেঁষল না, ভাবীর কাছে যেয়ে ঢিপ করে তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। মজনুর চিবুকে রিজিয়া ঠোঁট ছোঁয়াল, কে মজনু না? দুষ্টু।

মজনু হেসে ঘাড় ফেরাল। খানবাহাদুর ও বিবিকে সালাম সেরে ভিড় সরিয়ে মনসুর এগিয়ে গেল। রিজিয়া পেছনে। অলক্ষে হাতে টান পড়ল। ভিড় এখানটায় নেই-ই বলতে।

— দেখছ? প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল রিজিয়া।

মনসুর চোখ তুলল। বসবার ঘরের দেয়ালে প্রকাণ্ড ফ্রেম। তার ভিতর সম্রাটের পোর্ট্রেট। জর্জ দ্য ফিফথ। সেই ঋষিতুল্য চেহারার সম্রাট। যেন হাসছেন। মনসুর জবাবে মুচকি হাসল মাত্র।

শোবার ঘরে একটু নিরিবিলি হতেই রিজিয়া ফের সেই কথাটা তুলল, তোমরা কি এখনও ইংরেজের রাজত্বে বাস কর নাকি?

অবশ্য কথাটা অবসর সময়ে স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কির ছলেই বলা। কারণ, রিজিয়ার বাবা এই সেদিনও বারের নামকরা উকিল ছিলেন, পলিটিক্সও এক-আধটু করতেন। সম্প্রতি চাকরি নিয়েছেন। রিজিয়া কলেজে পড়তে দল বেঁধে স্ট্রাইক করে লাইব্রেরি ঘর থেকে রাজদম্পতির ছবি সরিয়েছে। তাই স্বামীকে একটু খোঁচা মারা। কিন্তু মনসুর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, জানই তো, বাবা সেকালের, তার ওপর গ্রামের লোক।

রিজিয়া কথাটা গায়ে মাখল না, তেমনি লঘু কণ্ঠে বলল, বেশ তো। জর্জ সিক্সথও তো ছিলেন, কিংবা হালে তো যুবতী রানি পেয়েছে।

মনসুর এবার হেসে ফেলে বলল, কিন্তু বাবা খানবাহাদুর হয়েছেন জর্জ দ্য ফিফথের আমলেই।

কৌতুকের হাসিতে রিজিয়ার চোখের তারা দু'টি বড় হয়ে গেল। স্বামীর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, ও, তাই বল—

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুকের মধ্যে লুফে নিল মনসুর। তার ঠোটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে দিতে বলল, আর ছবিটা বাবা প্রেজেন্ট পেয়েছেন, তাই অত মমতা।

মুখ সরিয়ে নেবার কৃত্রিম চেষ্টা করতে করতে রিজিয়া বলল, আহ্।

আসলে কথাটাও তাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একবার বেড়াতে এলেন গ্রামে। বেড়াতে কি অন্য কাজে কে বলবে। জমিদারবাড়িতে একদিন পদধূলি দিলেন, প্রচুর খানাপিনা হল। শেষে রুমালে মুখ মুছে পাইপে টোবাকো পুরতে পুরতে বললেন, জার্মানির রাজা কাইজারের সঙ্গে আমাদের লড়াই হচ্ছে, জনো চওড়ির?

যুবক জমিদার উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন, এক-আধটু শুনেছি। খোদা না-করুন, কোনো ভয় নেই তো?

ম্যাজিস্ট্রেট অভয় দিলেন, ওহ্ নো নো। উই আর ফাইটিং এগেইনসট বারবারিজম। আমাদের পেছনে গড আছেন। তবে কথা হচ্ছে কী, যুদ্ধে টাকা দরকার প্রচুর। আহতদের সেবা, হাসপাতাল তৈরি, ওষুধপত্র আরও কত কী!

— তা আমাদের বলছেন-না কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়লেন, তোমার নাম তো আমি কবেই লিস্টে টুকে রেখেছি চওড়রি। ওয়ার ফান্ডে তুমি পাঁচ হাজার টাকা ডোনেশন দেবে।

এমনি করে খানসাহেব। তারপর রেডক্রসে আড়াই হাজার, বিলেতের কোনো শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষের স্মরণে কলেজ স্থাপনে পাঁচ হাজার, মিশনারি কাজে পাঁচ শো...

এমনি করে বছর দুই না-ঘুরতেই আবার একদিন ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন, তুমি হিজ ম্যাজিস্টির কাছ থেকে খানবাহাদুর উপাধি পাচ্ছ, কনগ্রাচুলেশন।

সেই সঙ্গে এল এই ছবিটা। রানির ছবির দুঃখ ভুললেন খানবাহাদুর।

সরবতীর কানেও গেল ছবির কথাটা। বিবির হুকুমে ঠাণ্ডা পানির গ্লাস দিতে এসে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল। রিজিয়া পিষ্ট হচ্ছে মনসুরের দু'বাহুর বাঁধনে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েই সে দৃশ্যটা উপভোগ করল, রোমাঞ্চিত হল। আবেগে দুই চোখ মুদে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পর্দার এপাশ থেকেই মৃদুস্বরে বলল— ভাবী, পানি এনেছি।

চকিতে রিজিয়া সরে গেল, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, নিয়ে আয়।

সরবতী কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে এল। টেবিলে গ্লাসটা তশতরি ঢাকা দিয়ে রেখে খাটের কাছে সরে এল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, এ ঘরে ছবি টানিয়েছিলাম ভাবী, কিন্তু মা রাখতে দিলেন না।

মনসুর বলল, কার ছবি।

সরবতী এক ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর ছবি নিয়ে ফিরে এল। রিজিয়া হেসে ফেলল, ওহ্, রানি ভিক্টোরিয়া! যেমন তোর মা, তেমনি তুই। আমি ঘর সাজাতে ছবি নিয়ে এসেছি। ওই দেখ।

সরবতী ফ্রেমের স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেল, তার পরই দু'হাতে চোখ ঢেকে বলল, ওমা, এগুলো কী ছবি! তোবা তোবা।

একছুটে সে ঘর থেকে পালাতে গেল। রিজিয়া হাসতে গিয়ে বিষম খেল। বলল, হারিকেনের সলতে একটু কমিয়ে রেখে যা সরবতী। আলোটা বড় চোখে লাগছে।

বিকেলে রিজিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। আয়নায় কার ছায়া। রিজিয়া ফিরে তাকাল— ওহ্, মা।

বিবি ততক্ষণে বাঁ পায়ে ভর করে, মেদবহুল শরীরটাকে অতি কষ্টে স্থির রেখে দাঁড়িয়েছেন। চারদিকে নজর বুলিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, ঘর সাজাতে কী ছবি এনেছ মা?

রিজিয়া উল্লসিত হল, অনেক ছবি। সে কত কষ্ট করে কেনা। সব তো আনিনি। কয়েকটা এনেছি। এই তো।

রিজিয়া দেয়ালের কাছে সরে এল, বলল, এটা ম্যাডোনা, এটা মোনালিসা,এটা ইলোরা কেইভের...।

কথা শেষ হল না। একস্থানেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বিবি। হঠাৎ বলে উঠলেন, বউ!

রিজিয়া বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল।

— এগুলো কী ছবি বউ! মেমসাহেবরা ন্যাংটা হয়ে নাচছে। এগুলো কী ছবি? এদের জাত, মান, পর্দাপুষিদা, ইজ্জৎ আছে?

বিরক্তিতে রিজিয়ার মুখ কুঁচকে উঠল। এক মুহূর্ত বিবি তাকে অনুভব করলেন। তারপর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, নিজের ভালোমন্দ কি নিজের দেখতে নেই মা? শত হোক তোমার স্বামী জোয়ান, তোমারও ছেলেপিলে হয়নি।

এতক্ষণে রিজিয়া তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হঠাৎ হাসি লুকোতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এতক্ষণে বুঝি মেয়েটার মতি ফিরেছে, নিজের সাংঘাতিক ভুল বুঝতে পেরেছে। বিবি খুশি হলেন। শহরের হও, আর গ্রামেরই হও, তুমিও মেয়ে, একজনের বিয়ে করা বউ। স্বামীর মন খেলনা নয়। তাই তো বিবি দরবেশের মতো স্বামী পেয়েও ভিক্টোরিয়ার ছবিকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেননি। আর তুমি তো কোন ছার। কথাটা বুঝতেই তো দেমাগ ভাঙল! হুঁ হুঁ, বিবি আজকের মেয়ে নন।

রাত্রে রিজিয়া মনসুরকে দেখে হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেল। মনসুর শার্ট খুলে হুকে রাখছিল, কিছু বলল না। কিছুক্ষণ উশখুশ করে রিজিয়া নিজেই কথাটা পাড়ল।

— মা আজ এ ঘরে এসেছিলেন।

মনসুর ঘুরে দাঁড়াল, বলল, হুঁ।

— কী বললেন জান?

— কী?

— দেয়াল থেকে তোমার ওই সুরনটীদের ছবিগুলো সরাতে হবে। কারণ...

রিজিয়া এবার হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতে বলল, কারণ, তাতে তাঁর জোয়ান ছেলের মাথাটা ঘুরপাক খেতে পারে। বউয়ের উপর টান কমে যেতে পারে। উহ্, মাগো।

রিজিয়া হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য, মনসুর চুপ করে রইল। অন্যদিন হলে সে শুধু হাসত না, মায়ের পক্ষ নিয়ে রিজিয়ার সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়ার অভিনয়ে মেতে উঠত। আজ তার এই উপেক্ষায় রিজিয়া তাই আহত হল। আহত হয়ে পাশ ফিরে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই চাঁদ উঠবে। আকাশ তাই ফিকে হয়ে উঠেছে। জানালার বাইরে গ্রামের নির্জন প্রকৃতি স্তব্ধ। কাপড় বদলে মনসুর বিছানায় উঠে এল। রিজিয়ার চুলের বুনোটে হাত ঢুকিয়ে বলল, ঘুমুলে?

রিজিয়া সজাগই ছিল। দেখছিল চাঁদ ওঠার আগে আকাশের ফিকে রঙ। মনসুরের সাড়া পেয়ে চোখ মুদে ঘুমের ভান করল। মনসুর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ডাকল, রিজু।

রিজিয়া এবার নড়েচড়ে উঠল। বলল, ঘুমোচ্ছ-না কেন?

মনসুর তার কানের কাছে মুখ নামাল, দেখ, চাঁদ উঠেছে।

— বেশ, কবিতা লেখ। অন্যকে জ্বালিও না।

তার কথায় উষ্মা চাপা রইল না। মনসুর প্রায় জোর করে তাকে এপাশে ফেরাল, বলল, ঘাট হয়েছে, মাফ চাইছি।

রিজিয়া এবার রেগে গেল, বলল, ঘুমের সময় জোর খাটিয়ে সোহাগ করতে চাও নাকি?

মনসুর ছোট হয়ে গেল। একটু সরে গিয়ে বলল, না, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ছিল, তাই বলছিলাম...

কথা শেষ না-করেই সে থেমে গেল। রিজিয়া কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর নরম স্বরে বলল, কী পরামর্শ, বলো।

মনসুর উশখুশ করল, থাক, তুমি আবার রাগ করবে।

রিজিয়া বিস্মিত হল, কেন?

মনসুর হাসার চেষ্টা করল, বলল, বলছিলাম দেয়াল থেকে ছবিগুলো সরাবার কথা...

রিজিয়ার বিস্ময় উবে গেল। বলল্, ওহ্, এই কথা।

মনসুর আবার হাসার চেষ্টা করল, তোমাকে আসল কথাটাই বলছি। শুধু মায়ের জন্যই নয়। এর একটা প্র্যাকটিক্যাল দিকও আছে। ড্রয়িংরুমে জর্জ ফিফথের ছবি দেখেছ, ওটা সরাতে হবে।

রিজিয়া উৎসাহিত হল, সারটেনলি।

— কিন্তু সেজন্য তোমাকে-আমাকেও একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে।

— অর্থাৎ একটা 'কিং ফর শো'-এর ছবি সরাতে এই ফাইন ছবিগুলো নষ্ট করতে হবে। রিজিয়ার স্বর অনেকটা স্তিমিত।

মনসুর তার কাছে সরে এল, নিজের অজান্তেই রিজিয়ার ঘন চুলের গোছায় আঙুল চালাতে চালাতে বলল, তুমি বুঝছ-না। আমরা আর এখানে কদ্দিন?

তাই তো। রিজিয়ার মুখটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। মনসুরের মনের খবর সে জানে। প্র্যাকটিস্ জমছে না। অথচ চাকরি করারও ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে আপাতত গ্রামের দশ-পাঁচটা জনহিতকর কাজে মিশে জনপ্রিয় হওয়া। এতে একদিকে ওকালতিতে পসার, অন্যদিকে ইলেকশন এলে... মনসুর কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল, একটা ইলেকশন যাক, তারপরই তো শহর। ইচ্ছে হয় ছবির জন্য পারিতে অর্ডার দাও। কয়েকটা দিন বই তো নয়। জানোই তো বাবা সেকালের। জর্জ দ্য ফিফথের ছবিই তাঁর সম্পদের সামিল। নিজে আবার খানবাহাদুর। ওটা সরাতে না পারলে পাবলিক সেন্টিমেন্ট...

কথা শেষ হল না, রিজিয়া ধীরে ধীরে প্রায় তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে এল, হাসিমুখেই বলল, বেশ, কাল সরবতীকে বলে দেব। এ ছবিগুলো সরালে যদি বাবা তাঁর রাজার ছবি সরান, আপত্তি কী?

মনসুর হাসল, বলল, আঘাত তিনি পাবেনই। তবু এতে কিছুটা খুশিমনেই আঘাত সইবেন।

কয়েকদিন পর। ভোরে উঠে যে দৃশ্যটা খানবাহাদুরের চোখে পড়ল, তা হচ্ছে, সরবতী মনসুরের ঘর থেকে একরাশ ছবি কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে। বিবি সলজ্জ ভঙ্গিতে হেসে বললেন, দেখেছেন মেয়ের কাণ্ড। আপনি তো ভয়ে অস্থির। শহুরে মেয়ে! হোক, মেয়ে তো! মনটা তো আর শহরের ইট, কাঠ, পাথর নয়।

খানবাহাদুর রসিকতা করলেন, হুঁ। তাই বুঝি তুমি রানির ছবিটা সরিয়ে ফেলেছিলে? তা ভালোই করেছিলে। যা কাঁচা বয়স ছিল তখন আমার।

বিবি এই বয়সেও লাল হয়ে উঠছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই খানবাহাদুর সচকিত হলেন। বসবার ঘর থেকে একটা শব্দ আসছে। তিনি উৎকর্ণ হলেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি বসার ঘরটা দেখেও এসেছিলেন। যা পরিবর্তন হয়েছে মনসুর আসার পর। অচিন্ত্যনীয়। কোথায় সেই ঢালাও ফরাশ, তাকিয়া? এসেছে ঝকঝকে চেয়ার, টেবিল, টুল। খুশি হয়েছেন, আবার রাগও করেছেন খানবাহাদুর। হরেক রকম লোক আসে মনসুরের কাছে। আসবেই তো। মনসুর বড়লোক, শিক্ষিত, শহরের লোক। কিন্তু যারা আসে, তারা? খানবাহাদুরেরই ছোটলোক প্রজা সব। অথচ তাদের জন্য চা আসে অন্দর থেকে। তারা চুমুক দেয় সেই কাপে, যে কাপে খানবাহাদুরও চুমুক দেন। বসে সেই ঝকমকা চেয়ারে, যা কোনোদিন তারা সাহস করত না। অসহ্য, দুর্বিনীত স্পর্ধা। তিনি রেগে গিয়েছিলেন, এসব ছোটলোক চেয়ারে বসার সাহস পেল কোথায়?

কিন্তু মনসুর বলে অন্য কথা, কুকুরকেও পোষ মানাতে হয়। নইলে তারা মানবে কেন? খাইয়ে দাইয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ওরা কোনোদিন বুঝতে না পারে, ওদের গলায় একটা শেকল আছে।

আর মনসুর তো তাই করেছে। ছেলে বুদ্ধিমান বটে। তার যুক্তি শুনে খানবাহাদুর খুশি হন— শত হোক তাঁর ছেলে তো!

কিন্তু ড্রয়িংরুমের সেই উৎকট শব্দটা বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে গেল কেন! মনে হল দেয়াল থেকে কিছু চুন-পলেস্তারাও যেন খসে পড়ল। খানবাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একমুহূর্ত। তারপরই তিনি গর্জন করে উঠলেন, একি হারামজাদা, এ ছবি এখানে কেন?

চাকর বিমূঢ়। তার হাতে জর্জ দ্য ফিফথের ছবিটা বুঝি নিমিষের জন্য কেঁপে উঠল। গা থেকে চুন বালির দাগ মুছতে মুছতে সে ভীতস্বরে বলল, বড় সাহেব বললেন, তাই নামিয়ে এনেছি।

মনসুরের নামে খানবাহাদুর স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারপরই ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে গর্জন করে উঠলেন, তাই বলে তুই কেন হারামজাদা? মজনুকে বলতে পারিসনি। জানিস ওই ছবি কার...

কথা শেষ হল না। কাঁপতে কাঁপতে দু'হাতে ছবিটাকেই টেনে নিলেন তিনি। সেই ছবি। সেই রাজা। ঋষিতুল্য দাড়ি। মুখে স্মিত হাসি। এখনও যেন হাসছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

বৃষ্টি

বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির-ছোঁয়া বসন্তরাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল-ধরা শুকনো মাঠ আর পাতাঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতি দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এরপর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আসমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্রধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলো কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাটখেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে কিন্তু তাতে আসবে না এতটুকু ক্লান্তি, কেননা, নতুন ফসলের খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে।

কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চলল, আকাশে দু-একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি; কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

এরপর এল বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে-ওঠা পাটের চারাগুলো আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। উপরে খাঁ খাঁ শূন্য, নিচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর,তারও নিচে বাঘবন্দি নকশার মতো জমিগুলো রোদেপোড়া, বিবর্ণ। দুপুরবেলা খেতের আলের উপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনির মতো হা করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশু-শস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,— 'বেরাদরানে-ইসলাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কী বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। কিতাবে আছে, খোদার গজব নামে তখনি যখন দুনিয়া গুনাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কী দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরি-ডাকাতি বদমায়েশিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ-জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি, মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রাহমানুর রহিম, ইচ্ছা করলে একটু দয়া করতেও পারেন।'

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরুগম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ। থুমনিতে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালের মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাঁকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, 'মৌলানা সায়েব যা বললেন তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা সক্কলের মনে রাখতে হবে, কুকর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা, আস্তার্ক ফেরোল্লা। এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের দুররা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।'

ডান হাতের আঙুলগুলো দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ, তাঁর মগজের কেষে কোষে সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন 'মেঘের নামাজ' হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুফি মৌলানা মহীউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন, দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগির অযোগ্য হয়ে ওঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর দেখলেন অগুনতি টুপির শোভা, হোক-না সেগুলো তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলো বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লাহ দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগল : 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর্ তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান-সুরুজের মালিক, তোর অঙুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে তুই!'

'আল্লাহুম্মা আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন!' সারা জামাতজোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লাহর সাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জার-জার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবাহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মাইয়াসসেফুন, আসসালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দু'দিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল

কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুনকালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলাব্যাঙ আর বিষকাঁটালির গাছ রেখে রাতের পর রাত মেঘ-খেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলাপাতায় ফকির-ফাকরাকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল উপরের দিকে চেয়ে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ-চুয়ানো কাকচক্ষু নীল, একখণ্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈকি! সুতোর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তার অর্ধেক দিয়ে গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়! অথচ এ বছর গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলো জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই হয়েছে চরম বোকামি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত, কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সাকড়ি কম খরচ হয়নি, ভবিষ্যতে আরও হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেননি। গত বছর হাওয়াগাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ্ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমিজমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎ-এর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে দান-খয়রাত করলেই হল।

জানালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচির মিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহ'র গুটিগুলো চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লাহর আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছা হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল, 'মিয়াসাব এখানে? মসজিদে যাননি?'

'না, শরীরটা খুব ভালো নয়।' হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,— 'তা ছাড়া তোর গিন্নিমা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।'

দিন পনেরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তার আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেননি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকালবেলায়। আসলে বউকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সবসময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তা-ও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস, সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর

আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তাঁর মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসল, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনোকিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়েস ষাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

'হাসালেন হাজি সাহেব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?' মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন— 'আপনি কন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি। তা-ও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।'

হাজি কলিমুল্লাহর চোখের তারা দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করছিল; কিন্তু বাইরে আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এত শিগগির ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোঁক গিলে বললেন,— 'দেখুন, তিনকাল গিয়ে এককাল পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর— আর আমার ফাইফরমাশটা করতে পারলেই হল।'

'তা তো বুঝলাম।' মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,— 'ভাঙা নাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে; কিন্তু কোনটা আমরা চাই! কোনটা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?'

এরপর সাতকানি জমি সাফকাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ের ঘরের নাতনি। বয়স একুশ-বাইশ বছর হবে। এ দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, সে হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বেমানান হয়নি!

রান্নাঘরের হাঁড়িপাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসল। হাজি সাহেবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন,— 'কিরে, কিছু খবর আছে?'

জৈগুন বলল,— 'আছে।'

'কী শুনি!' তসবিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লাহ'র, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

'আমি আজ গিয়েছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শরিলের দিকে।' দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,— 'ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।'

হাজি চিন্তিতভাবে জিগ্যেস করলেন,— 'ওর জামাই না কবে মারা গেছে?'

'তা সাত-আট মাস তো হবেই!' জৈগুন হিসাব করে বলল, 'কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের।'

'তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক।' হাজি কলিমুল্লাহ যেন সত্যদর্শন করেছেন, তাঁর চোখে আশার আলো ফুটে উঠল। নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন,— 'আচ্ছা, বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে, তাকে দেখলি?'

'হ্যাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারেনি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।'

'তা হোক, তা হোক।' হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,— 'শুয়ে থাকলে কী হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কী বলিস?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তাছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই ওর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামাপাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনেনি? রজবালি টের পেয়েছিল বলেই- না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না হলে মেয়েমানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায়?'

'যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নাই। আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন?' হাজি আবার তসবিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,— 'তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।'

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা। তাঁর কপালের বলিরেখা আরো কুঁচকে গেল। তসবিহ'র গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ কাজ আর কারো নয়। অল্পবয়েসে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা, স্বামীসঙ্গ একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা। তাছাড়া ওর পুরো জোয়ানি। যেমন-তেমন দু'একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কী কায়দা। মামাতো ভাই, দিনমজুরি করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিঁড়ে ভিজবে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য— এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ-না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা সম্ভব? থানা আর পুলিশ রয়েছে যে। তা হলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লাহ যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরাগাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমাচাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওনা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তো বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝলমল করছে। চারদিক নিঝঝুম, গাছপালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরাগাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর উপর দিয়ে ঝিলঝিল করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলোতে কচি ধান-পাতার জড়াজড়ি।

নিচু হয়ে জুতোজোড়াটা ডান হাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অসুবিধা হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,— 'সাজুকে আমার কাছে দিন।'

ওরা দুজনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম প্রথম 'আপনি' বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নিচে ওর সুন্দর চোখদুটো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিগ্যেস করল,— 'তোমার কষ্ট হবে না তো?'

খালেদ হাসল! বলল,— 'না, এ আবার কষ্ট কী?'

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না-পাওয়ায় ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার কাছছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অন্য কাঁধের উপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে সুমুখে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রুপালি বালুর উপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডানহাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো

পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোট ছোট ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাটাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল, 'খালেদ!'

'কী!'— কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

'আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ।'— স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল, 'আমি চলতে পারছি না। দ্যাখো, দ্যাখো! পানিটা কী সুন্দর!'

খালেদ ফিরে এল। বলল,— 'আপনার কী হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!' পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,— ' দেখছ, কিন্তু সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।'

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নিচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে— 'বউ কথা কও।'

নদী পেরিয়ে এসে চপচপ পানি থেকে পাদুটো ঝাড়া দিয়ে নতুন জুতোজোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর স্বর শুনতে পেল,— 'একটু দাঁড়াও!'

'আবার কী হল আপনার!'

'কী জানি কিছু বুঝতে পারছি না! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন?' জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের চোখজোড়া বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দুটো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,— 'কী হল আপনার?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু বুঝ না!' কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,— 'সাজুকে দাও আমার কাছে। চল শিগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।'

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকে কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন একখণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়মপায়ে উঠোনে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তাঁর আন্দাজই ঠিক?

'জৈগুন! ও জৈগুন!' তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,— 'দেখে যা, আমরা যা ভাবছি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।'

জৈগুন চৌকাঠের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,— 'তবু তো আপনি বলছেন, আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনো সুবা-সন্দে নেই। বাতাসী যা ছিনাল।'

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লাহ্, এর বিচারটা কী হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বারবার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পুবপাড়ার আমবাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নিচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কী দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কী বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপনে আড়চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতাপর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধহয় অনেক দিক থেকেই অদলবদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোনো পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার গিন্নিদের হাতের ছাপ অনেককিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিসফিস আলাপও যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এঘরে ঢুকবার কোনো অধিকার তার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

কিন্তু আমার কী দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন কাঁদিসনে, দু-একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।'

জোহরা আপন মনে আওড়াল,— 'ছাই সম্পত্তি!'

দগদগে ঘা'র উপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, ওর বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বলজ্বল করতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা!

মগজটা গিসগিস করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়োর ধারে মেহেদিগাছটার দিকে, ভিজেমাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে মেহেদিগাছটা কাটতে পারেনি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শিরশির করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারালো বঁটিটা এনে এককে কোপে এককেটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

'আহা হা, করেন কী গিন্নিমা'— জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,— 'গাছটা অনেক দিনের। মানুষের কত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

'তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন না-করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমি কাটবই।'

'আমি কাম করে খাই, আমার কী? আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'আশ্চর্য!' জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,— 'আমার ভালো-মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে? দুনিয়াতে আর লোক নেই!'

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে আর ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই-বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লাহ বললেন,— 'যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করেছে।'

'কেমন করে জানলেন?'— জোহরা শুধাল।

'এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমতো ঘা দিলাম, আর তা বেজে উঠল। ব্যাস, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।' হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,— 'আগামী শুক্রবার রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।'

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না-উঠত, তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চিরদিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করলেন হাজি কলিমুল্লাহ। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে লোমশ হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছতলায় এল।

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?' খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা গলায় বলল,— 'না-খেয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে, না?'

কথা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ থ হয়ে রইল। হঠাৎ ডান হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে ক্ষিপ্তের মতো জোহরা বলল, 'আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!'

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ভোরবেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের উপর দিয়ে মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এরপর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই যেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকল না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল।

শুক্রবার রাত বারোটা বেজে গেল একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে ব্যাপারটা সারা গ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই। আজকের মজলিশ শুধু গ্রামের আলেম-মণ্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামিদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরি করেছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তিনি তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে বিনিয়ে গুনগুন করছিল, এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, 'ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!'

'এই বেটি কান্না থামা!' হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন,— ' সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?'

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে শান্ত গলায় তিনি জিগ্যেস করলেন,— 'কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?'

'কী কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষ নই, কুকুর-বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কী!' বাতাসী চোখ মুদে বলল,— 'না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!'

'কিন্তু এসব কথা তো আর আসমান থেকে পড়ে না!' হাজি কলিমুল্লাহ বললেন,— 'অন্য কারো নামে তো ওঠেনি?'

'সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবার বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না-খেয়ে থাকতে পারিনি— এসব জিনিস কারো চোখে পড়ত না!'

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারেবারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে-নদীতে আলোছায়ায় লুকোচুরি।

একসময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি! ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজিসাহেবের বাড়িটার পিছনটায় আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা অরণ্যের ভিতর কোনো প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধনিশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায় আর সে যেন শিউরে ওঠে গভীর আতঙ্কে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে, গর্জনে চারদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায় তা সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্তপদে এসে উঠল বারান্দায়। এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে একসময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। উপরে-নিচে কেবল শব্দ, শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেকবার মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলো, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কী করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শরীরে রোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছে, ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিনচিন করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ দুটো ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে? একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত রংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুরির রিনিঝিনি, একটি গভীর শান্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খসখস। ঘ্রাণ আসছে, একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না, এখানে নয়। এ তো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল, একটা সুপুষ্ট নম্র মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্রগর্জনে একেকবার কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ঙ্কর সুন্দর রাগিণী।

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারালো হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘরবাড়ির উপর দিয়ে শুধু ঝরঝর ঝাপটা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এপর শুধু ঝমঝম শব্দ।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। একসময় খোলা দরজা পার হওয়ার পর উঠোনে নেমে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই টলতে টলতে উত্তর-ভিটির ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নিচু করে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়িতে ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লাহ। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,— 'অত দেরি যে! আর ইদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।'

'কী আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম!' ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,— 'সে একটা পাঁড়-হারামজাদি, শেষপর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফাই-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? দুটোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লাহর রহমত? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টি নামল!'

'হ্যাঁ, তাইতো, বড় তাজ্জব ব্যাপার!' কথাটা শেষ করে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন, বললেন,— 'আরে, আরে করছ কী? তুমি পাগল হলে নাকি? এত রাত্রে ভিজছ, সর্দি করবে যে।'

'না, সর্দি আমার কোনোকালেই করে না।' জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা ফুলের মতো উজ্জ্বল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো ঠোঁটে বলল— 'আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল ফলবে।'

জহির রায়হান

সময়ের প্রয়োজনে

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধানো একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে-ওখানে।

খাতাটা খুললাম।

মেয়েলি ধরনের গোটা গোটা হাতে লেখা।

মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনও চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কী জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার উপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। একসঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণার থুতু ছিটোই মৃতদেহের মুখে।

সামনে ধানক্ষেত। আলের উপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। একঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কী যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগুতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের উপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু-রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন।

বললেন, কী দেখেছ?

বললাম, মনে হল একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু-একদিনের মধ্যে এগুবার কথা নয়। যাও ভালো করে দেখ।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়তো তাই ভুল দেখি।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা ভুল হবার নয়। শুনেছিলাম, বহুলোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।

দেখলাম।

মেঝেতে পুডিং-এর মতো জমাট রক্ত।

বুটের দাগ।

অনেকগুলো খালি পায়ের ছাপ।

ছোট পা। বড় পা। কচি পা।

কতকগুলো মেয়ের চুল।

দুটো হাতের আঙুল।

একটা আংটি।

চাপ চাপ রক্ত।

কালো রক্ত। লাল রক্ত।

মানুষের হাত। পা। পায়ের গোড়ালি।

পুডিং-এর মতো রক্ত।

খুলির একটা টুকরো অংশ।

এক খাবলা মগজ।

রক্তের উপরে পিছলে যাওয়া পায়ের ছাপ।

অনেকগুলো ছোট-বড় ধারা। রক্তের ধারা।

একটা চিঠি।

মানিব্যাগ।

গামছা।

একপাটি চটি।

কয়েকটা বিস্কুট।

জমে থাকা রক্ত।

একটা নাকের নোলক।

একটি চিরুনি।

বুটের দাগ।

লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে।

চুলের কাঁটা।

দেশলাইয়ের কাঠি।

একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

রক্তের মাঝখানে এখানে-ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো।

পাশের নর্দমাটা বন্ধ।

রক্তের স্রোত লাভার মতো জমে গেছে সেখানে।

দেখছিলাম।

দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।

আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।

অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।

মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হ্যারিকেন। কোমরে বাচ্চা।

চোখেমুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিন শ' লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হল পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোনদিকে যাব। পেছনে ফিরে যাবার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নিচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়তো মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনদিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে চুটছে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার উপরে নেমে এল।

তারপর।

তারপর মনে হল একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখথুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতকগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের

কণ্ঠস্বর। বা'জান। বা'জান। হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বা'জান। বা'জান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানক্ষেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশজন মানুষ।

প্রথম উনিশজন ছিলাম। আটজন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগারজন।

একজন পালিয়ে গেল সে রাতে। গেল, আর এল না। আর একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে। কী অসুখ বুঝে উঠবার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুকপকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। মা। আমার জন্যে তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, মা। আমি ভালো আছি।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। ওখানেই থাক। তখন ছিলাম ন'জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁছেছি।

সাতাশজন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনোদিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিনমজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসঙ্গে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোনো শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মতো অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝে মাঝে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। ক'দিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হত না। সাতাশজন মানুষ আমরা। মাত্র ন'টা রাইফেল।

আরো যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দুশো জনের মতো এসেছিল ওরা। পঁয়তাল্লিশটা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশেপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-গেরস্তবাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারো হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়োল। খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ওদের হাত। পা। মাথা। বুকের পাঁজর। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একটা মৃতদেহকে শত টুকরো করতে করতে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে কাঁদছিল। আমার পুলাডারে মারছস। বউডারে নিয়া গেছস। মাইয়াডারে পাগল করছস। আমার সোনার সংসার পুড়ায়া দিছস।

আল্লাহর গজব পড়ব। আল্লাহর গজব পড়ব।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

আমরা বাধা দিলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল ওরা। করুণ বিলাপ শুরু করল। বিলাপের অবসরে নিজেদের সহস্র দুঃখ-বেদনার ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগল।

ছেলে নেই। স্বামী নেই। স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। যুবতী মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হল। হালের গরু। গোলার ধান। গায়ের অলঙ্কার। কিছু নেই। সব লুট করেছে।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে যদি সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাতকোটি। এককোটি লোক ঘর-বাড়ি-মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। তিনকোটি লোক সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতঙ্ক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে। অনেকগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধুঁয়োর কুণ্ডলী ভেদ করে।

একটা গহনা-নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বাচ্চাতে গিজগিজ করছিল সেটা। দু-পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনও পুড়ছে। কালো জমাট ধুঁয়ো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ নেই। কুকুর নেই। জন্তু-জানোয়ার

নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে। সহসা অনেকগুলো মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম। দূরে নদীর পারে একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো মেয়ে চিৎকার করে নৌকাটাকে পাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডাকছে। ওরা আশ্রয় পেতে চায় নৌকাতে।

না, না, খবরদার, নৌকা ভেড়াবে না। জনৈক বৃদ্ধা ওদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

কেন, কী হয়েছে?

কী আর হবে? বাজে মেয়ে। বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে?

মানে আবার কী সাহেব। বেশ্যা। বেশ্যা চেনেন না। ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে এল তার।

তার একার নয়। অনেকের।

অনেকেই মুখ বার করে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাগুলোকে দেখল। না না। নৌকা থামাবার দরকার নেই। আপদগুলো মরুক। মরলেই ভালো।

নৌকা থামাও। সহসা ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তজবার মতো লাল চোখ। শিগগির নৌকাতে তুলে নাও ওদের। কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল সে। উত্তরে বুড়োটা বিরক্তি প্রকাশ করল। না, নৌকা থামাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বুড়োটার গলা চেপে ধরল ছেলেটা। কুত্তার বাচ্চা। তোমাকে এক্ষুনি তুলে ওই নদীর জলে ফেলে দেব আমি। কোন শালা শুওরের বাচ্চা আছে এখানে বাধা দেয় আমাকে।

নৌকা ভেড়াও মাঝি। ওদের তুলে নাও।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। নৌকা ভিড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে অর্ধমৃত বেশ্যাগুলো ভেড়ার পালের মতো নৌকায় এসে চড়ল।

ছোট বেশ্যা। মাঝারি বেশ্যা। বড় বেশ্যা।

কিশোর বেশ্যা। যুবতী বেশ্যা। বৃদ্ধা বেশ্যা।

ঘৃণায় একপাশে সরে গেল নৌকার কুলীন যাত্রীরা। বেশ্যারা কোনো কথা বলল না। এককোণে গাদাগাদি করে বসল।

অনেকগুলো মুখ।

একটা মুখ আমার মায়ের মতো দেখতে।

মা এখন কী করছে?

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোট ভাই। বোন ইতুদি। ওরা কেমন আছে?

বেঁচে আছে না মরে গেছে?

জানি না। হয়তো বহুদিন জানব না।

তবু একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় আমার।

আবার কি ওদের সঙ্গে একসাথে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি?

আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ দুয়ারে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

ওঠ। চা খাবি না?

কিংবা।

দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাদের উপর কেরাম খেলা। পারব কি আবার?

অথবা।

মাকে সাক্ষী রেখে, সবাই মিলে বাবার পকেট মারা? হয়তো। জানি না।

জানতে গেলে ভাবনা হয়। ভাবনাটাই একটা যন্ত্রণা। অথচ ভাবতে আমি এককালে ভীষণ ভালোবাসতাম। বিশেষ করে জয়াকে নিয়ে।

চিনু ভাবীর জয়া। কতভাবে ভেবেছি ওকে।

কখনো সমুদ্রের উত্তাল পটভূমিতে।

কখনো ঢেউ জাগানো মিছিলের মাঝখানে।

কখনো ছোট্ট একটি ঘরের একান্তে। দিনে। রাতে।

অন্ধকারে নিবিড়তায়।

কিংবা কোনো দুপুরে। কোনো রেস্তোরাঁর কোণের টেবিলে। নিরিবিলি নির্জনে। দু-কাপ চা সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা না বলে বসে থাকার মুহূর্তে। ভাবতে ভালো লাগত।

ইছামতী, করতোয়া, ময়ূরাক্ষী বলে যে নদীর নাম, তার জলে দুজনে সাঁতার কেটে ঢেউয়ের সঙ্গে কানাকাছি খেলতে।

জয়া কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি। সমুদ্র দেখার বড় ইচ্ছে ছিল তার।

একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, সমুদ্র দেখে এলাম। কখন! কোথায়? অবাক হয়েছিলাম আমি।

কেন, এই শহরে? কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে বলেছিল জয়া। শহরের অলিতে-গলিতে এত সমুদ্রের ছড়াছড়ি জীবনে দেখেছ কখনো?

জনতার সমুদ্র।

সমুদ্রের চেয়ে গভীর।

সাগরের চেয়েও উত্তাল।

গতিময়।

মনে হচ্ছিল সামনে শত বাধার পাহাড় আসুক-না কেন, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কোটি কোটি মুখ। পাথরে খোদাই করা চেহারা। মুষ্টিবদ্ধ হাত সীমানা ছাড়িয়ে। লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন।

আগে তো দেখিনি কোনোদিন।

বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে। চুয়ান্নতে। বাষট্টি, ছেষট্টি, কিংবা ঊনসত্তরে অনেক দেখেছি। কিন্তু এত প্রাণের জোয়ার কখনো দেখিনি।

এত মৃত্যুও দেখিনি আগে।

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।

প্রতিদিন দেখি।

জয়াকেও এত নিবিড় করে দেখিনি কোনোদিন। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসাব।

আমাদের নয়।

ওদের।

যখনি কোনো শত্রুকে বধ করেছি তখনি একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসাব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুণি। তিন শ' বাহাত্তর, তিহাত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।

আমাদের যারা মরেছে তাদের হিসাবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুনি।

একদিন।

বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে।

তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রায় এক ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্য। মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্যে।

বাংলাদেশ।

না। পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি আমরা। উত্তরটা ঠিক হল কি?

দেশ তো হল ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজারবার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানা জনে নানারকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওই শালারা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জান? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা-বদমাশ, ঠগ, দালাল, ইতর, মহাজন আর ধর্মব্যবসায়ী আছে তাদের সবার পাছায় লাথি মারতে।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কিসের জন্যে লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়তো সুখের জন্যে। শান্তির জন্যে। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে।

কিংবা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। অথবা, সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে লড়ছি আমরা।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোট মাথায় অত ভাবনা এখন আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদেরকে তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে।

মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কব্জিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল। সেটা হাতে না-লেগে বুকে লাগতে পারত। মাত্র দু-আঙুলের ব্যবধান।

এখন ক'দিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত : বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড় অদ্ভুত।

ঘরবাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়তো কোনো গ্রাম, কোনো গঞ্জে। কোনো উদ্বাস্তুশিবিরে। কিংবা—

না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোনো খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এই যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেকগুলো মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালোবাসব।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা, সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তুশিবিরের পাঁচলক্ষ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে-কানাচে এককোটি মৃতদেহ।

না এককোটি নয়, হয়তো হিসাবের অঙ্ক তখন তিনকোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু ফুরাবে না।

সামনে ধানক্ষেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প-কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার লেখা, আপনার?

না। আমাদের সঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্তকয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পাচ্ছি না। হয়তো মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখজোড়া অজান্তে আবার খাতাটার উপরে নেমে এল। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

বুধবার রাতে

রিকশার পেছন ধরে লোকটা যেভাবে টান দিয়েছিল তাতে ছিটকে পড়বার কথা। রিকশাঅলাও বেকুব আমিও বেকুব।

তখন পর্যন্ত লোকটির চেহারা দেখিনি। ওই উঁচু আসনে বসে থাকলে ভালোভাবে দেখা হবে না। মনে এমনি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। ভাবলাম নেমে দেখি ব্যাপার কী। রিকসাঅলাও বোধ হয় আমার মতো ভেবে থাকবে। আরোহী এবং চালক দু'জনে প্রায় একসাথে নেমে পড়লাম। কারো মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই।

রিকশাঅলা দেখতে এমনিতেই বিষণ্ন প্রকৃতির। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে প্রায় নিবে যাওয়ার উপক্রম করছে। অভাবিত অবস্থায় পড়ে। আমরা দু'জন মনের দিক থেকে খুব কাছাকাছি হয়ে আছি। অন্তত কিছুক্ষণ ধরে তাই মনে হচ্ছিল। রিকশাঅলার করুণ মুখ দেখে আমার মন খচখচ করছিল, ওকে একটু অভয় দেবার উদ্দেশ্যে বেশ দৃঢ়তার সাথে হাসলাম। শব্দ করে নয়, কেননা আমার ভিতরে উৎকণ্ঠা আছে।

নামবার সাথে সাথে যে লোকটি রিকশা টেনেছিল সে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে আগাগোড়া দেখল বারবার। টান দেবার ধরন দেখে বুঝেছিলাম লোকটির স্বভাবে দৃঢ়তার চেয়ে উগ্রতা বেশি।

চেহারা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম,আমার অনুমান মিথ্যা নয়। লোকটি বিশেষভাবে কী চায় জানিনে, তবে এটুকু বুঝতে পারছি দাবি আদায় করার চেয়ে উল্টেপাল্টে দেখার দিকে লোকটির ঝোঁক প্রবল।

আর সে কী চেহারা! আমি অন্য চিন্তায় তন্ময় ছিলাম বলে ওকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠিনি। শরীরে-মনে এত অবসাদগ্রস্ত ছিলাম যে শুরু থেকে অনেকটা সময় পর্যন্ত বিস্ময় ছাড়া অন্য কোনো ভাব মনে আসেনি। অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম,

: কী চাও।

লোকটি কোনো কথা বলছে না।

রাস্তাঘাটে এসব উন্মাদদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে প্রায়ই দেখি। দেখতে দেখতে উৎসাহ কমে গেছে। কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে যা হয়। তাছাড়া দেখেছি পাগলরা অনেকটা সুস্থদের মতো। পুনরুক্তিতে ভরা। সে কারণে আমার কৌতূহল নেই ওদের সম্পর্কে।

লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম,

: কী চাও। বলো না! পয়সা?

লোকটি সজোরে আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল,

হ্যাঁ, পয়সা, পয়সা চিনেছিস খুব!

খেয়াল করিনি, আশপাশে দু'চারজন লোক এসে মজা দেখবার ফিকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

তাদের নিশ্চিত ভাব দেখে বুঝলাম এই পাগলটিকে তারা ভালোভাবে চেনে—হয়তো সারাক্ষণ তাদের ভেতরেই আছে। কাজেই গা-সহা। আমাকে চড় মারবার সাথে সাথে তারা সশব্দে হেসে ওঠে।

আমি কিছু বুঝতে পারছিনে বলেই তখন পর্যন্ত অপমানিত বোধ করিনি। স্বল্প সংখ্যক দর্শক। আমার চড় খাওয়াতে তাদের এত আনন্দিত হবার কী আছে ভেবে পাচ্ছিলাম না। অপ্রস্তুত লাগছিল। সে কারণে একটু রুষ্ট স্বরে লোকগুলোকে বললাম,

: হাসছ যে বড়ো?

এ কথা বলাতে কোনো লাভ হল না। লোকগুলো আরো বেশি করে হাসতে থাকে। আশ্চর্য! সত্যি তারা আমার সাথে এই পাগলের ভয়ানক সম্পর্কটা উপভোগ করছে। গ্লানিবোধে মাথা হেঁট হয়ে আসে। লোকগুলোর দিকে আর তাকাতে সাহস হয় না।

রিকশাঅলা আবার আমার পড়শিও। এক পাড়াতে থাকি আমরা। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বেচারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আরো কত কী যে অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা করছে। ওকে সাহস দেওয়া দরকার, না হলে এক্ষুণি হয়তো রিকশা এবং আমাকে ছেড়ে পালাবে। বললাম,

: ডরাসনে কালু।

কালু কিছু বলল না।

দর্শকদের ভেতর মধ্যবয়সী একজন লোক ফিক করে হেসে ফেলল আমার কথা শুনে। টিটকিরি দিয়ে খুব নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে পাশের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল,

: চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা।

বুঝলাম যার হাতে পড়েছি সে উন্মাদ হলেও সহজ ব্যক্তি নয়। একটু একটু ভয় করছিল। বুকের ভেতর দুপদাপ হচ্ছে। বাইরে তখন পর্যন্ত ভেঙে পড়ার আগে নকল বীরদের মতো একটা তাচ্ছিল্য ভাব টিকিয়ে রাখা গেছে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে বিস্তর।

যমের মতো দেখতে পাগলটা আমার চারদিকে অবিরাম পাক খাচ্ছে। অস্থিরতা ছড়াচ্ছে আর উচ্চস্বরে পাকিস্তানের প্রশংসা করছে। লোকগুলো একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, কিংবা যাকে বলা যায় হতাশ হয়ে পড়েছে। পাগলকে উস্কে দেবার জন্যে এক ছোকরা মতন লোক বলল,

: ভদ্রলোক মানুষ। ছেড়ে দাও দরবেশ বাবা।

যে ভঙ্গিতে কথাগুলো বলা হল তাতে আমি একটু শংকিত হয়ে উঠেছিলাম। বলার ধরন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দরবেশ বাবার বিশেষ আক্রোশ আছে ভদ্রলোকদের ওপর— আশ্চর্য, এদিক থেকে ইতর মেয়েদের সাথে উন্মাদজনের খুব মিল আছে। দরবেশ বাবা নিজমূর্তি ধরল, সে দাঁতে দাঁত ঘষল। হাসল, বুক চাপড়াল। শেষে বলল,

: শালা ফুরফুর করে হাওয়া খাও, না?

আমি উত্তর খুঁজে পাইনি। হঠাৎ ওসব হাওয়াবিলাসীদের কথা কেন! হাঁ বললে বিপদ হতে পারে। না বললে নিরাপদ থাকব কিনা কে জানে। অতএব মূক হয়ে রইলাম— কথায় বলে বোবার শত্রু নেই। দেখা যাক। দরবেশ বাবা শুরু করল,

: তোর বাচ্চার চুলে আগুন। ধেই ধেই করে জ্বলছে। তুমি শালা হাওয়া খাও মাছের বাজারে।

হাওয়া খাওয়ার জন্যে মাছের বাজার কোনো সঠিক জায়গা নয়। কাজেই হাওয়া- বিলাসী নয়, বলা হচ্ছে কোনো দুর্বিনীত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের কথা। লোকেরা হাততালি দিতে থাকে। আর সে কী পৈশাচিক হাসি! এতক্ষণে অবস্থা সম্পর্কে ধারণা হয়। মাঝে মাঝে এই উন্মাদ লোকটি অনেক রাতে ঘরমুখো একজনকে ধরে আসর জমায়। লোকেরা হাসে। হাততালি দেয়। ভদ্রলোক হলে উন্মাদের সুবিধে, তার চেলাদের জন্য। তাদের প্রতিভা সহজে বিকশিত হয়। আমাকে নিয়ে দরবেশ বাবার এ খেলা কখন শেষ হবে কে জানে। অধৈর্য লাগছে। আবার এত ক্লান্ত হয়ে আছি যে, এই খেলায় অংশ নেবার মতো উৎসাহ নেই, কৌতূহল যা ছিল তারও কোনো চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিনে। বিশেষ করে চড় খাবার পর থেকে। রিকশাঅলা দেখলাম ভিড়ের ভেতর বেশ ঢুকে গিয়ে নিজেকে একেবারে অচেনা করে তুলেছে। বেশ বুদ্ধিমান লোক। হাওয়া বুঝতে পারে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত দেড়টা।

পাগল লোকটি আমার চারদিকে ঘুরছে তো ঘুরছেই। এতক্ষণে বোধ হয় ওর ভেতর নাচের আমেজ এসে গেছে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি তার চেহারা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

চোরের মতো লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাতে দেখি তারা সবাই খুশি। যা চেয়েছিল তাই পাওয়া যাচ্ছে বিস্তর পরিমাণে। এর ভেতরে হঠাৎ নিজের দুই উরুতে জোর দুই চাপড় লাগিয়ে পাগলটি চিৎকার করে উঠল,

: ইয়া আলি।

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাকে কী বলব ভেবে কূল-কিনারা করে উঠবার আগেই ভারি ওজনের আরেকটি চড় লাগল আমার বাঁ কানের উপর। দুহাত দূরে ছিটকে পড়লাম। শুনলাম, পাগল লোকটি বলছে,

: রাজার হুকুম।

বিনা অজুহাতে মার খাওয়ার কথা আগে জানতাম না। অবশ্য এতে মনে করবার কিছুই নেই। কেননা দর্শকরাও যেমন জানে, আমিও জানি, লোকটি বদ্ধ উন্মাদ। তার

মনের আনাচে কানাচে কীসব ভাব নড়াচড়া করে সে কথা আমাদের জানা নেই বলে ওর কথা বা কাজের বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে দর্শকের সাথে আমার একটা তফাৎ লক্ষ করছিলাম।

যারা দেখছে, আমার বিশ্বাস এমন ঘটনা ওরা প্রায়ই দেখে থাকে, তারা পাগলের প্রতিবেশী। সে কারণে আত্মীয়তা জন্মে গেছে ওর সাথে। ওরা জানে, অন্যরকম কিছু না-ভাবা পর্যন্ত পাগল লোকটি তাদের সাথে থাকবে। কাজেই তারা তাকে মেনে নিয়েছে, ওর ভেতর থেকে কথা উপভোগ করার মতো দিকগুলো তারা বেছে নিয়েছে। আর আমার বেলা! আমি এদের সকলের অচেনা। সেই অর্থে বিদেশি। কাজের জন্য এ বাজারের পথ দিয়ে যাই এবং এই গভীর রাতে পাগলের হাতে ক্রীড়নক, একান্ত অসহায় লোক যে অত্যাচারিত হচ্ছে। এ পাগলের সাথে আর হয়তো কোনোদিন দেখাও হবে না।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে এসব কথা মনে হচ্ছিল। কেন জানি না হয়তো নিজের অসহায়তার জন্যেই মন খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোনো জেদ নেই— প্রতিবাদ নেই। ক্ষমা করা কি সহজ এখন? সত্যি কথা বলতে কি আমি পাগলকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়ে গাত্রোত্থান করলাম।

এই নিষ্ঠুরতার পর লোকগুলো আরো ঘনীভূত হয়েছে, একে অন্যের আরো কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। হাসছে সবাই, তবে শব্দ করে নয় আর।

উন্মাদ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে গিয়েছিলাম, ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক করলাম এবারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব যদিও মারপিট করার ইচ্ছা আমার নেই। তবে প্রয়োজন হলে করব। সেই আমার কাল হল। পাগলটি অবিরাম কিল-চড়-ঘুষি দিচ্ছে। আমি দু হাত দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।

লোকেরা আবার হাততালি দিচ্ছে। এই পর্যায়ে একটা জিনিস মনে হচ্ছে।

পাগল লোকটি বারবার চেষ্টা করছিল আমাকে ঠেলেঠুলে দর্শকদের দলে ভিড়িয়ে দেবার জন্য। আমি বাধা দিলাম, এবং যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকবার চেষ্টা করলাম। এজন্য যে, পাগলামির দর্শক হতে আমি অনিচ্ছুক, ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে।

পাগলটা দাঁতে দাঁতে ঘষছিল,

: রাজার হুকুম।

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। বললাম,

: কোন রাজা।

বলল : নতুন রাজা।

দর্শকদের ভেতর কখন দুজন পুলিশ কনস্টেবল এসে জুটেছে। তারাও গা-ঢাকা দিয়ে মজা দেখছিল।

রাজার হুকুমের কথা শুনে পুলিশ কনস্টেবল দুজন হেসে উঠল। লোকেরা আবার হাততালি দিল এলোমেলো।

পাগলের মার থেমেছে। এখন তার গোঁ সে আমাকে লোকদের ভেতর ভিড়িয়ে দেবে। এ ইতরামির অর্থ আমি জানি। সে জন্যে তাকে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছি।

পুলিশ দুজন লাঠি হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। পাগলের দিকে লাঠি উঠিয়ে বলল,

: বাবা দরবেশ। ভালোয় ভালো পথ দ্যাখো।

পুলিশের উপদেশ কাজে লাগে। পাগল আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ দুজন ভিড় ভেঙে দিল। আমার রিকশাঅলা বিনীত ভঙ্গি করে এসে আমার সামনে দাঁড়াতে বললাম,

: চল।

পুলিশ দুজন রিকসার মুখ ঘুরিয়ে পাশের গলি দেখিয়ে দিল। বলল,

: এ পথ দিয়ে যাবেন না। ওই মোড়ে দেখলাম আরো দুজন পাগল রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে।

এ খবর জানানোর জন্য কনস্টেবল দুজনকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম,

: ভারি সময়মতো এসেছিলেন। না হলে কী যে হত!

একজন আমার কথা শুনে হেসে ফেলল,

: কী আর হত। আরও মার খেতেন। তারপর ওই দলে ভিড়ে যেয়ে হাততালি দিতেন। কিন্তু যে গলি দিয়ে যাচ্ছেন! একটু সতর্ক থাকবেন।

বললাম, কেন?

: এগলি দিয়ে গেলে একটু পরেই বেশ্যাপাড়া। বেশ্যাপাড়া ছাড়ালে কবরখানা।

আমার রিকশাঅলার আপত্তি নেই। সে ওই গলির পথ ধরল। ঘটনা দেড় বছর আগেকার এক বুধবারের রাতে। ডায়েরিতে তার উল্লেখ আছে, একটু বর্ণনাও লিখেছিলাম।

সৈয়দ শামসুল হক

নেপেন দারোগার দায়ভার

নদীর নাম আধকোশা। বর্ষাকালে হিমালয় থেকে ঢল নামে, রাতারাতি নদী ফুলে চারগুণ হয়ে যায়, তাই হয়তো নদীর নাম আধকোশা কেউ রেখে থাকবে। এখন এই চৈত্রমাসে শুকিয়ে সে উপবাসী সাধুর মতো। নদী পেরুলেই গ্রাম, গ্রামের নাম কাঁঠালবাড়ি।

গন্তব্যে প্রায় এসে পড়া গিয়েছে।

ঘোড়ার পিঠে বসেই নেপেন দারোগা নদীর এপার-ওপার চোখ চালিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে; এ কী র‍্যা? ঘাটিয়াল কই?

খেয়াঘাটের চালা একেবারে শূন্য। বাঁশের মাচা খাঁ খাঁ করছে, পারানির কড়ি নেবার ক্যাশবাক্সটা রাখা থাকে যে ভাঙা টেবিলের উপর সেটা পর্যন্ত অনুপস্থিত।

ততক্ষণে ক্যাঁচোর-কোঁচোর করতে করতে গরুর গাড়িটা এসে ঘাটে থেমেছে। গাড়ির দুপাশে বন্দুকহাতে শিউশরণ আর রামদাস। দুজনে, লালপাগড়ি খুলে মাথায় খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে নেবে ভাবছিল, হুংকার শুনে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হাঁ, কাঁহা গইল বা? এ ঘাটিয়াল? ঘাটিয়াল হো।

দুই সেপাইয়ের গলাছাড়া চিৎকার শুকনো নদীর দুইপাড় মুহূর্তে চক্কর কেটে আসে। বাতাস নিস্তব্ধ। নদী স্থির। জনমানুষের সাড়া নেই।

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে নেপেন দারোগা। শিউশরণ লাগামটা নেবার জন্যে দৌড়ে কাছে আসে কিন্তু আবার হুংকার শুনে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

আরে, হিয়া খাড়া হোকে আওরাতকা মাফিক চিল্লাও মাৎ। তালাশ করকে দেখ।

ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে মাটিতে মুখ নামিয়ে কিছু একটা খোঁজে। কিছু-একটা যা চিবোনো যায়। কিন্তু ঘাটের কাছে সবটাই ধু-ধু বালি। এককোঁটা ঘাস নেই।

মানুষগুলোরও সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি। সদর থেকে রওয়ানা দেয়া হয়েছে সেই ভোরবেলায়। এখন পড়তি বিকেলবেলা। সারাদিন সঙ্গে একটা মড়া নিয়ে আহার করতে কারো রুচি হয়নি। অশুচি সংস্কার? এ মড়ার জন্যে নেপেন দারোগা বা তার দুই সেপাইয়ের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকবার কথা নয়।

মড়া মানে, হাজতে থাকাকালীন মৃত কৃষককর্মী দেবেশ বকশি। এখন গরুর গাড়ির ভেতরে শুয়ে আছে, তার নিজের গ্রাম কাঁঠালবাড়ি থেকে একটিমাত্র নদীর ব্যবধানে।

গাড়োয়ান এরই মধ্যে গরুটাকে জোড়নছাড়া করে গাড়িটাকে বাঁশের লাঠি ঠেকান দিয়ে গামছার হাওয়া খাচ্ছে।

মড়ার কোনো হাওয়া খাবার দরকার নেই। তবে, মুখের উপর ক'টা মাছি ভনভন করছিল। খেদিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু গাড়োয়ানের সাহস হয় না। নেপেন দারোগা থেকে নিজেকে সে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখে গাড়ির ওপাশে।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে নেপেন দারোগার। এ জায়গা তো এত বিরান হবার কথা নয়। বিশেষত কাঁঠালবাড়িতে আজ হাটবার।

শিউশরণ আর রামদাস এধার-ওধার ঘুরে এসে মুখ কাঁচুমাচু করে হাতজোড় করে দাঁড়ায়।

কোই নেহি হ্যায় দেওতা।

আরে তোর দেওতার কিছু করেছি। তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

কেবল খিদের জন্যে যে মেজাজ খারাপ, তা হয়তো নয়। তারচেয়ে শক্ত এই দায়ভার।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব বলে দিয়েছেন, মড়া গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে চোখের সমুখে দাহ করিয়ে তবে ফিরবে।

ইংরেজের সঙ্গে লড়তে আসে। ছো। বিড়বিড় করে ওঠে নেপেন দারোগা। হাজতে দুটো রামডলা খেয়েই লীলাসাঙ্গ। এখন ঠ্যালা সামলাতে হচ্ছে তাকে।

রাগে সে হাতের ছড়ি নিজের উরুতেই মারতে থাকে। তার চটাস ফটাস শব্দে গাড়োয়ান চমকে ওঠে বারবার। আতঙ্কের শেষপর্যায়ে মানুষ হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে ফেলে। গাড়োয়ান ওপাশ থেকেই বলে, হুজুর বড়কর্তা।

কি ও?

কনতো হামরা নাও ঠেলি দিয়া আসি।

দূরে একখানা নৌকো বাঁধা ছিল, আগেই চোখে পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে পরামর্শটা মনে ধরে নেপেন দারোগার। তার কুঞ্চিত ভ্রুযুগল স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

সেটা লক্ষ করে গাড়োয়ানের সাহসের মাত্রা বেড়ে যায়। সে এবার গাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলে, মোক ফির ছাড়ি দিবেন, মই আর কাঁঠালবাড়ি যাবার নও।

নেপেন দারোগা না জানতে পারে, গাড়োয়ানের কাছে খবর ঠিকই পৌঁছে গ্যাছে। দেবেশ বকশি হাজতে মারা যাবার পরমুহূর্তে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। এরই মধ্যে খবর হয়েছে যে, লাশের সঙ্গে ইংরেজ হাকিম একশো গোরা সেপাই পাঠাচ্ছেন গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার জন্যে।

আশ্চর্য নয়, ঘাটে মাঝি নেই।

নেপেন দারোগা যে একেবারে বুঝতে পারেনি, তা নয়, তবে এতটা সে আশা করেনি। তার ধারণা ছিল আধকোশার ঘাটেই দেবেশ বকশির আত্মীয়স্বজন থাকবে লাশ নেবার জন্যে।

দাহ করবার সার্টিফিকেটও সে সঙ্গে এনেছে, নদীর পাড়েই দাহ করিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সদরে ফিরবে, এরকম ভেবে রেখেছিল। কিন্তু কোথায় কী?

তুই ব্যাটা পালাতে চাস?

আমতা-আমতা করে গাড়োয়ান। নেপেন দারোগাকে ভয় করে না এমন মানুষ তল্লাটে এখনো জন্মায়নি।

চটাস করে কাঁধে ছড়ির বাড়ি পড়তেই সে হাউমাউ করে ওঠে, হামার নাতিনের ব্যারাম, বাবু। বাইচপার নয়, উয়াক দেইখপার যামো।

শিউশরণ আর রামদাস নৌকো খুলে ঘাটের কাছে এখন ঠেলে নিয়ে আসে।

ঘাটিয়াল ভাগ গিয়া দেওতা। ইসসে পুছিয়ে।

দেখা যায়, নৌকোর সঙ্গে তারা নেংটিপরা এক ছেলেকেও পাকড়াও করে এনেছে।

ছেলেটি লাল পাগড়ি, দারোগার ঘোড়া আর স্বয়ং দারোগার আশুতোষ গোঁফ দেখে প্রস্রাব করে ফ্যালে। কী বলে, তার একবর্ণ বোঝা যায় না। তার উলঙ্গ দেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'এই হারামজাদা', নেপেন দারোগা ছেলেটির কাঁধে ছড়ি রেখে হুংকার দিয়ে ওঠে, 'ঘাটিয়াল কই? লোকজন কই? গেছে কোথায় সব?'

কাঁইও নাই, কাঁইও নাই। পিনপিন করে বলে চলে ছেলেটি— ভয়ে ভয়ে সে একবার গরুর গাড়ির দিকে তাকায়। লাশের পায়ের ডগা দেখা যায়। সম্মোহিতের মতো ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে বলে চলে, সউগ চলি গেইছে। কাঁইও নাই। বন্দুক ধরি আইসবে বলে পালাইছে ওমরা।

ফটাস করে পিঠে ছড়ি লাগিয়ে দেয় নেপেন দারোগা। তিড়িং বিড়িং করে ওঠে সে। 'ভাগো হিঁয়াসে।'

বেশ, সবাই যদি পালিয়ে গিয়েই থাকে, বহুৎ আচ্ছা। সে-ও নেপেন দারোগা। জ্বালিয়ে দেবে গ্রাম। দেওয়ানিদের বেঁধে এনে চাবুক লাগাবে।

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে যায় আগের কাজ আগে সারতে হবে। লাশ দাহ করিয়ে সদরে ফিরতে হবে। রক্তমুখো বেল সাহেব বাংলোয় অপেক্ষা করবেন রিপোর্ট নেবার জন্যে।

জীবনে এরকম মুশকিলে পড়েনি সে। রাজদ্রোহীর লাশ সঙ্গে, সে লাশ নেবার লোক নেই, যতদূর চোখ যায় কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ এক্ষুনি দাহ করতে হবে।

নৌকার উপরে সেপাই দুজন ধরাধরি করে লাশ ওঠায় দেবেশ বকশির। সর্বাঙ্গ একটা ময়লা চাদর দিয়ে ঢাকা। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারের ভেতরেও দেখা যায় দুচোখ তার বিস্ফারিত, যেন সন্ধ্যাতারা খুঁজছে।

'এই হারামজাদা', বলে নেপেন দারোগা নিজেই ছড়ি দিয়ে লাশের মুখের উপর চাদর ঢাকা দিয়ে দেয়।

নৌকোটাকে এক ঠেলা দিয়ে গাড়োয়ান ভয়ে ভয়ে তাকায়। জিজ্ঞাসা, এখন কি তার ছুটি? কিন্তু নেপেন দারোগার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অপসৃয়মাণ নৌকোর দিকে। নৌকোয় লাশের সঙ্গে শিউশরণ আর রামদাস।

গাড়িটানা গরুদুটো মৃদুস্বরে হাম্বা করে ওঠে। রক্তের ভেতরে তারা হয়তো রাতের আগমন অনুভব করে।

তারপর খালি নৌকো নিয়ে ফিরে আসে শিউশরণ।

চলিয়ে হুজুর।

ঘোড়াটিকে জলে নামিয়ে, লাগাম হাতে ধরে, নৌকোর উপর উঠে বসে নেপেন দারোগা।

মুঁই এলা যাঁও, বড়কর্তা?

গাড়োয়ানের গলা পেয়ে সম্বিত ফিরে পায় সে। তাইতো, এতক্ষণ কীসব মাথামুণ্ডু ভাবছিল সে। ঘোর অমাবস্যার রাতে মান্দারবাড়ির কালীর থানে একা নিষ্কম্প বসে থাকতে যে ভয় পায় না, তার এরকম মনে হবে কেন?

ধমকটা যেন নিজের ভয়কেই দিয়ে ওঠে নেপেন দারোগা।

যাবে না তো আমার শ্রাদ্ধ খাবে, হারামজাদা।

গাড়োয়ান আর একমুহূর্ত দেরি করে না। নৌকো জলে লগির খোঁচা খেয়ে নড়ে ওঠে। ঘোড়া সাবলীলভাবে পাশে পাশে সাঁতার কেটে চলে।

মাঝনদীতে ঝপ করে অন্ধকার নেমে পড়ে। ক্ষণকালের জন্যে শীতল একটি দমকা হাওয়া বয়ে যায়। শিউরে ওঠে শান্ত নদীর বুক। আবার সব স্থির হয়ে যায়। নৌকো ওপারে গিয়ে লাগে।

মড়া আগলে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল রামদাস। রাত নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অনুভব করেছিল শীতল দমকা হাওয়া। সে বিড়বিড় করে রাম-সীতা স্মরণ করছিল। দারোগাবাবুকে দেখে, বিশেষ করে শিউশরণকে দেখে, সে এখন স্বস্তি ফিরে পায়। মানুষ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করে সমপর্যায়ের মানুষের কাছে।

লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে যায় নেপেন দারোগা। তার সঙ্গে ঘোড়াটাও জলের ভেতরে থেকে বিশাল শুশুকের মতো ভুস করে উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়াটা একবার গা-ঝাড়া দিয়ে মনিবের পাশে মাথা নিচু করে পা ঝাড়ে। তখন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় নেপেন দারোগা।

অন্ধকারে কোনো আলো চোখে পড়ে না কোথাও। বাতাসে কোনো ধ্বনিস্বর ভেসে আসে না। সন্ধ্যার মঙ্গলশাঁখ বাজে না। আজান শোনা যায় না। বুঝতে বাকি থাকে না, ছেলেটির কথাই সত্যি। সকলেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে নেপেন দারোগা।

তুমলোগ ইহা রহো।

ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে পড়ে সে। বিনা-রেকাবে ঘোড়া চালানো নেপেন দারোগার আরেক অহংকার।

গাঁও ঘুমকে আতা হ্যাঁয়। কোই না কোই শালা ছুপকে রাহা হোগা।

অন্ধকারের ভেতরে ঘোড়া মিলিয়ে যায়। বহুদূর পর্যন্ত পায়ের দাপ শোনা যায় তার। সেপাই দুজনের হঠাৎ খেয়াল হয়, লাশের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকারে লাশটিকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখে তারা। বন্দুক আর তাদের ততখানি সাহস দিতে পারে না। মানুষের অনুপস্থিতি, নির্জনতা আর নদীপ্রবাহের তরল ধ্বনি লাশটিকে তাদের চোখে প্রেতশক্তি দান করে।

বিড়ি ধরায় দুজন। ছলাৎ করে একটা শব্দ হতেই চমকে ওঠে তারা। আসলে মাছ, কিন্তু মাছ বলে প্রত্যয় হয় না তাদের। বিড়ি হাতে বিস্ফারিত চোখে তারা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘোড়ার পায়ের দাপ নিকটবর্তী হয়।

অচিরেই পাহাড়ের মতো সওয়ারসহ ঘোড়া এসে লাশের কাছে স্থির হয়।

বিড়ি ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় শিউশরণ আর রামদাস।

নেপেন দারোগার কণ্ঠস্বর অন্ধকারের ভেতর থেকে দৈববাণীর মতো শোনায়, সব শালা ভাগলবা। আওরত-মরদ সব ভাগ গিয়ো। একঠো কুত্তা ভি হ্যায় নেহি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসে সে। নিজের উরুতেই ছড়ির বাড়ি দেয়। তারপর সেপাইদের ভাষা-ই সে ব্যবহার করে। বোঝে না, ওই ভাষা ব্যবহার করে সে-ও সঙ্গ সন্ধান করছে, কারণ সে এখন শীতল নিঃসঙ্গতা হাড়ের ভেতর অনুভব করে।

শালা আন্দোলন করেগা, চাষিকো সমান ভাগ দেগা, আংরেজ কো হঠা দেগা, গরিবকা রাজ হোগা, বহৎ দরদ দেখানেওয়ালা থা। আব কাঁহা হ্যাঁয় সব? লাশ তো ওহি আংরেজ কো আভি দাহ করনে পড়েগা। হ্যাঁ।

অন্ধকারে সটান দাঁড়িয়েই থাকে শিউশরণ আর রামদাস।

এই প্রথম একটি ধ্বনি শোনা যায়।

দূরে শেয়াল ডেকে ওঠে।

কিন্তু না, শুধু শেয়াল নয়, সেইসঙ্গে মানুষেরও কণ্ঠস্বর যেন। কিম্বা তাদের কানের ভুল। তবু তিনজনই, সম্ভবত দেবেশ বকশির লাশও, উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মৃতরাও জীবিতের অপেক্ষা করে বৈকি।

কোনো মীমাংসা হয় না। সত্যি সত্যি মানুষের কণ্ঠস্বর কিনা, বোঝা যায় না। আবার স্তব্ধতা এসে হামা দিয়ে বসে।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে নেপেন দারোগা হুংকার দেয়।

উল্লুকা মাফিক খাড়া মাৎ রহো। উধার শমসান হ্যায়। হারামিকো লে চল, দাহ করনে কা অর্ডার হ্যায়। বাপ ভাগ গিয়াতো, শালা ইসকা আংরেজ বডি দাহ করেগা। উঠাও লাশ।

আধমাইলটাক দূরে কাঁঠালবাড়ির শ্মশানঘাট, সোজা দক্ষিণহাতি।

আঙুল দিয়ে ইশারা করে নেপেন দারোগা আগেই সেখানে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হয়। শ্মশানযাত্রীদের চালার খুঁটিতে ঘোড়াটিকে বেঁধে জুৎ করে সে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে। এর আগে সৎকার করতে গিয়ে কেউ হয়তো গাছ ফেড়েছিল, তারই গুঁড়ি কাৎ হয়ে জলের কিনারে পড়ে আছে।

শেষ কবে দাহ হয়েছে কে জানে। এখনো বাতাসে চিমসে একটা গন্ধ ভেসে রয়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, বহুদিন আগে এমনি এক শ্মশানঘাটে সে অন্ধকারে বসেছিল, চড়চড় করে চিতার কাঠ পুড়ছিল।

হাঁপানিতে অস্থিসার বাবার চেহারাটা নেপেন দারোগার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে সে দেখে। অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কিসের সঞ্চারমান সাড়া পেয়ে চমকে উঠে দেখে, নদীর জল ঘেঁষে দ্রুত একটা শেয়াল পালিয়ে যাচ্ছে।

ইতস্তত তাকায় নেপেন দারোগা। না, ধারেকাছে কেউ নেই যে দেখে ফেলবে তার হঠাৎ এভাবে শিশুর মতো চমকে ওঠা।

উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক চক্কর দিয়ে আসে সে। নদীর ওপারে, বহুদূরে, সদর এখন তার এক পৃথিবী দূরের বলে বোধ হয়। কখন যে ফিরে যেতে পারবে সেখানে!

লাশটাকে এপারে না-আনলেই হত। কিন্তু না-এনেও তো উপায় নেই। বেল সাহেবের হুকুম আছে কাঁঠালবাড়ির শ্মশানঘাটে নিজে দাঁড়িয়ে দাহ করিয়ে তবে ফিরবে।

নবাবের ব্যাটা দুজন। একটা লাশ নিয়ে এইটুকু পথ আসতে ঘণ্টা লাগিয়ে দিচ্ছেন।

অশ্লীল একটা গালি মুখে আসছিল, হঠাৎ আবার মনে হল, বহুদূর থেকে মানুষের ক্ষীণ একটা বিলাপ যেন ক্ষণকালের জন্যে শোনা গেল।

না। আবার কান পেতে কিছুই শোনা গেল না।

শেয়াল হবে হয়তো।

প্রেতাত্মা?

দূর দূর। নেপেন দারোগা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না। ওসব চোর-ডাকাতের রটনা কারসাজি। ভূতের ভয় তুলে নিজেদের চুরি আর চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখে। ও ঢের দেখা আছে নেপেন দারোগার।

চাঁদ এখনো ওঠেনি। আকাশেও বেশি তারা নেই। ঘন গাছপালায় গাঁয়ের দিকটা একেবারে নিরেট দেয়াল হয়ে আছে।

তার ইচ্ছে করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে জমাট অন্ধকারটাকে মশাল করে তোলে। সবকটা বাড়িঘর একসঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তার কল্পনায়। হাত নিশপিশ করতে থাকে। আক্রোশের চাপে মুখের ভেতরে তার মাড়ি টিসটিস করে।

এতক্ষণে দেখা দেয় দুই উল্লুক।

এ শুয়ারকা বাচ্চা, কাঁহা তাড়ি পি রহা থা? এতনা দের কিঁউ শালে লোগ?

অন্তর্যামী নাকি নেপেন দারোগা? আরে বাপরে বাপ, কিচ্ছুটি চোখ এড়িয়ে করবার জো নেই। শিউশরণ কিছুটা পেয়ারের লোক। সে মাথা চুলকোতে গিয়ে লাল পাগড়িতে বাধা পেয়ে ঘাড় চুলকেই লজ্জা প্রকাশ করে বলে— তাড়ি নেহি পিয়া, হুজুর, ডোম পাকড় লে আওলবা।

হ্যাঁ, আরো একজনকে দেখা যাচ্ছে বটে। তার কাঁধেই দেবেশ বকশির লাশ লগির মতো টান টান বেঁকে ঝুলে আছে।

ঝুপ করে লাশ নামিয়ে মুহূর্তে বাতাসের ভেতর পচা মদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পূর্ণিমার মতো শাদা দাঁত সবকটা বের করে লোকটি হাতজোড় করে দাঁড়ায়।

হামি সুখিয়া ডোম আছি লাট বাহাদোর।

আরে ইস্কো কাঁহা মিলা?

নেপেন দারোগার কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে একটু আবছা সন্তোষ লক্ষ করা যায়।

টালমাটাল শরীরটাকে যথাসম্ভব স্থির রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে সুখিয়া। নেপেন দারোগা ছড়ি তুলে তার পেটে খোঁচা দিয়ে সোজা রাখতে চায়। লোকটি আরো বেশি করে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়, যেন প্রণাম করবার জন্যে সে ছটফট করে।

ইয়ে শালা শারাব পিয়া, হুজুর। বলে রামদাস আর শিউশরণ সুখিয়াকে দুদিক থেকে ধরে খাড়া রাখে।

এ যে একেবারে টেম হয়ে আছে র‍্যা? নেপেন দারোগা ছড়ি নাচাতে নাচাতে বলে। একে দিয়ে কী হবে?

সুখিয়া নিজের চেষ্টাতেই এবার সোজা হয়ে বুক টান করে দাঁড়ায়। দুহাত ঝাড়া দিয়ে শিউশরণ আর রামদাসকে সরিয়ে দিয়ে বলে, গেরামের সব লোক ভেগে গেল, মহারাজা। ই জাগা মইধে বড়বাবু যো আছেন, সি বললেন, কেউ জান লিয়ে বাঁচবে না বটে। মনের মইধে হামি চিন্তা করলোম, দেবুদাদা যো আইতে লাগছেন, উয়ার কি হোবে বটে? কে উহার চিতা সাজাইয়া দিবেক? তো হামি রয়ে গেলাম। হামার ভি ডর লাগছিল, দুই বোতল খেয়ে লিলোম, নদীর পাড়ে বসে রইলোম দেবুদাদার লেগে বটে।

বসে রইলোম। দাঁত মুখ খিঁচুনি দিয়ে ওঠে নেপেন দারোগা। চোপ হারামজাদা। দেবুদাদা তোমার স্বগগে নেবে?

সুখিয়া ধমক খেয়ে দমে যায় না, নেশার ঘোরে অম্লান বদনে সে বলে যায়— আপনি দেখে লিবেন, দেবুদাদার চিতা হামি সাজাইয়া দিবে বটে।

আবার একঝলক শীতল বাতাস বয়ে যায়। যেন হাড়ের ভেতরে গিয়ে কাঁপুনি লাগে।

এ কিরে বাপু, চোত মাসে এমন হাওয়া?— ভ্রু কুঁচকে ওঠে নেপেন দারোগার। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে। পরমুহূর্তে তার হুংকার শোনা যায়।

এ শালা লোগ, রাত কাবার করে দিবি নাকি? কাঠের জোগাড় দ্যাখ্।

চঞ্চল হয়ে ওঠে শিউশরণ ও রামদাস।

সুখিয়া বলে, কাঠ ভি জোগাড় করিয়ে রাখছি, লাট বাহাদোর। হ্যাঁ।

যা, শুয়ারটার সঙ্গে হাত দেগে যা। ঝটপট। জলদি, জলদি।

তাড়া খেয়ে শিউশরণ আর রামদাস সুখিয়াকে নিয়ে কাঠ আনতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মুহূর্তের ভেতরে অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধতা চেপে বসে।

নদীর তীরে পড়ে আছে দেবেশ বকশির লাশ, দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, আর সে, নেপেন দারোগা, জীবন্ত একটা মানুষ, মূর্তির মতো স্থির বসে আছে। কুলুকুল করে বয়ে চলেছে আধকোশা। মানুষের কণ্ঠস্বরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নদী তার নূপুর বাজিয়ে চলেছে।

এরকম কাণ্ড জীবনে দেখেনি নেপেন দারোগা। সারাটা গ্রাম যেন ওলাউঠায় উজাড় হয়ে গেছে।

পিঠের দাঁড়ায় বরফের শীতলতা বোধ করে সে।

গেরস্থর ঝকঝকে উঠোন, পরিষ্কার করে নিকোনো। ঘরগুলোর দরজা যেন অতল কোনো সুড়ঙ্গের মুখ। পেছনে বাঁশবনে শ্বাপদের চলে যাবার সরসর শব্দ। কোথাও কোনো মানুষ নেই। একের পর এক বাড়ি, কুঁড়েঘর, মন্দির, দোকান— যেন পৃথিবী থেকে মানুষ নামের সমস্ত প্রাণী ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে।

যেন এক পরিত্যক্ত পুরীতে সে একা দাঁড়িয়ে।

অন্ধকারে লাশটার দিকে তাকায় নেপেন দারোগা। অমন যে লাল টকটকে ইংরেজ হাকিম বেল সাহেব, তিনি পর্যন্ত বারবার বলে দিয়েছেন— সাবধান, যেন লাশ নিয়ে মিছিল-মিটিং না হয়।

কী আছে ওই মৃত মানুষটির? কোথায় সেই শক্তির উৎস?

ঠিক তখন, পেছনে জঙ্গল দিয়ে তৈরি অন্ধকারের নিরেট দেয়াল ছিঁড়ে হঠাৎ এক করুণ বিলাপ বেরিয়ে আসে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নেপেন দারোগা।

কে?

লাশটার দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে নেয় সে। কেন তাকায় নিজেও সে বোঝে না। ঘোড়াটা মুখ তুলে কিসের নিশ্বাস টানে, তারপর অস্থির হয়ে পা ঝাড়তে থাকে।

মানুষ। নতুন কোনো মানুষ। নইলে ঘোড়াটা ওরকম করত না।

কোন্ হ্যায়?

কারো সাড়া পাওয়া যায় না। তিন হারামজাদা কাঠ আনতে কেন এত দেরি করছে, তা-ও বোঝা যায় না। নেপেন দারোগার মনে হয়, এই মুহূর্তে রওনা হতে পারলে বেঁচে যায় সে। অথচ ঠিক ভয় পেয়েছে, তা-ও নয়। তার পেটের ভেতরেই কেমন সব ঘুলিয়ে ওঠে, হয়তো সারাদিন পেটে কিছু না-পড়বার দরুন, হয়তো অন্য কোনো কারণে।

অচিরে সেই বিলাপধ্বনি নিকটতর হয়, আর সেইসঙ্গে পাতাপত্তরের উপর দিয়ে হেঁচড়ে কিছু টেনে আনবার শব্দ।

মনে পড়ে যায়, ঘোড়ার পিঠে, ব্যাগের ভেতরে টর্চ আছে।

টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায় কঙ্কালসার লোলচর্ম এক বুড়ি। পাছা ঘষে নদীর পাড় বেয়ে নেমে আসছে। তীব্র আলো ঝলক দিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির বিলাপ ও গতি থেমে যায়। এক হাত তুলে সে চোখ আড়াল করবার চেষ্টা করে কিন্তু থরথর করে তার হাত বারবার কোলের উপর পড়ে যায়।

বুড়ি তখন সেখানে বসেই আবার বিলাপ শুরু করে।

তুই কোনটে গেলুরে। দেবু, তুই কোনটে গেলু।

টর্চ জ্বালিয়ে রেখেই নেপেন দারোগা বুড়ির কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু দারোগা দেখে ভয় পাবার বয়স অনেক দিন আগেই পার হয়ে গেছে তার। এমনকি চোখেও ভালো করে দেখতে পায় কিনা সন্দেহ।

এই, তুই কে?

সারা গ্রাম চক্কর দিয়ে এসেছে নেপেন দারোগা। কোথাও কাউকে চোখে পড়েনি। এ বুড়ি তাহলে এতক্ষণ ছিল কোথায়?

একবার মনে হয়, অশরীরী কেউ; মনে হয়, চোখের ভুল, কানের ভুল।

টর্চ নিবিয়ে ফেলে সে।

আবার জ্বালায়।

আবার দেখা যায় বুড়িকে। আবার সে চোখ বোজে আলোর তীব্রতায়। আর এবার সে চিল্লিয়ে ওঠে— জল্লাদ, জল্লাদ তোমরা। মনোত দয়ামায়া নাই তোমার?

ব্যাটা নাই তোমার? মুখ দিয়া রক্ত উঠি মইরবে তোমার একেক ব্যাটা, কয়া দিলাম। হামার দেবুক তোমরা মারি ফেলাইছেন? কোন্ অপরাধ করছিল সে যে তোমার জানের উপর দিয়া উঠি গেইলো? কথা কন না যে বড়? ভগবান তোমার রাও কাড়ি নিছে? ভালো কইরছে। ভালো কইরছে। নিব্বংশ হন তোমরা। কুষ্ঠ হয়া ভিক্ষা করেন, মুই চোখ মেলি দ্যাখো।

নেপেন দারোগার ইচ্ছা হয় লাথি মেরে বুড়িকে ঠাণ্ডা করে দেয়।

কিন্তু আধকোশার জল ছলছল তীরে, অন্ধকারে, নিঃসঙ্গতার নাগপাশের ভেতরে বুড়ির এই বিলাপ হঠাৎ নেপেন দারোগার শক্তি হরণ করে নেয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার মনে পড়ে যায়, বাবা মরে যাবার পর মায়ের সেই বিলাপ, যে বিলাপ শূন্য দালানের কোঠায় কোঠায় অন্ধকারে এমনি মাথা খুঁড়ে মরছিল।

নিজের কানেই নিজের কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত কোমলতা ধরা পড়ে কেমন অপ্রতিভ হয়ে যায় সে।

দেবেশ বকশি কে হয় তোমার?

বুড়ির কানে সে প্রশ্ন পশে কিনা বলা যায় না। কোনো উত্তর আসে না। নেপেন দারোগাও দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করে না। ফস করে টর্চ নিবিয়ে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বুড়ির মতোই আরো অনেকে, শত শত হাজার হাজার লোক, আশেপাশেই অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

এক্ষুনি তারা বেরিয়ে পড়বে, হৈ হৈ করে ঘিরে ধরবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে নেপেন দারোগাকে।

শালা ইংরাজের দারোগা।

শিউরে ওঠে সে। চকিতে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। আকাশে এখনো চাঁদ ওঠেনি, ভালো করে কিছুই চোখে পড়ে না। সম্ভাবনাটি তখন আরো বেশি বাস্তব বলে বোধ হয়। নিজের অজান্তেই নেপেন দারোগা ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। ঘোড়ার পিঠে হাত বুলোয় সে, যেন সপ্রাণ কিছু স্পর্শ করে চিত্তের অস্থিরতা বাগে রাখতে চায়।

চিঁ— হি— হি ডেকে ওঠে ঘোড়া।

মানুষের সাড়া পাওয়া যায়। গান গাইতে গাইতে অন্ধকারের ভেতরে এগিয়ে আসছে শিউশরণ আর রামদাস। তাদের সঙ্গে সুখিয়ার বেপরোয়া গলায় ভিন্ন সংগীতও শোনা যায়।

শুয়ার লোগ, খাল খিঁচ লেনা চাহিয়ে।

রামদাস মিনমিন করে উত্তর দেয়, বৃহৎ ভারি বোঝা, দেওতা। মুশকিল সে লায়া।

গলা শুনেই বোঝা যায়, দেরিটা কেবল কাঠের জন্যেই নয়, কিছু পেটে দিয়ে এসেছে দুজন।

ডিউটির ভেতরে মদ খাওয়ার জন্যে কড়া শাস্তি দিতে পারত নেপেন দারোগা। জনমানুষহীন আধকোশার তীরে অন্তত মুখখিস্তি করতে পারত। কিন্তু কিছুই করল না সে। কোনোরকমে এখন এই মড়া পুড়িয়ে এখান থেকে রওনা হতে পারলেই হয়।

তার কেবলই মনে হচ্ছে বুড়ির পেছনে পেছনে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে শত শত লোক রে-রে করে বেরিয়ে আসবে হাজার মশাল জ্বালিয়ে, কেড়ে নেবে লাশ। লাশ নিয়ে পিলপিল করে সবে ছুটবে সদরের দিকে লাল নিশান হাতে নিয়ে।

তিনজনে কাঠের বোঝা দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে, এনে এখন হতভম্ব দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে? ওদেরও কি সন্দেহ হয়েছে, জঙ্গলের নিরেট দেওয়ালের পেছনে লুকিয়ে আছে মানুষগুলো? বুকের ভেতরে গুরগুর করে ওঠে নেপেন দারোগার।

নেশা ওদের জবুথবু করে রেখেছে। কিন্তু নেপেন দারোগার সে যুক্তি মনে আসে না। সে চিৎকার করে ওঠে— খাড়া হোকে রাম ভজন হো রহা? হাত লাগাও জলদি।

যে সুখিয়া নেশার ঘোরে প্রথম থেকেই টলছিল, কাজের সময় তাকেই দেখা যায় সবচেয়ে সপ্রতিভ। এর আগেও দেখা গেছে, লাশ কাঁধে দিব্যি হেঁটে এসেছে, কিন্তু যেই লাশ নামিয়ে রেখেছে অমনি আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল বুড়ি। কখন সে চুপ করে গিয়েছিল নেপেন দারোগা লক্ষও করেনি। হঠাৎ তার বিলাপ শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে শিউশরণ আর রামদাস।

ভূত ভূত, হুজুর।

হা হা করে হেসে ওঠে সুখিয়া।

শ্মশান তো ভূতেরই জাগা আছে, মহারাজ। কিন্তু ই ভূত লয়। মা আছে বটে।

নেপেন দারোগা চমকে উঠে জিগ্যেস করে, দেবেশ বকশির মা?

বুঝলোম নাই।

আরে তোর চৌদ্দগুষ্টির দেবু দাদার মা?

আবার হেসে ওঠে সুখিয়া। চিতার পরে শেষ কাঠ যত্ন করে বিছিয়ে বলে, দেবু দাদার মা লয়, লাঠ বাহাদোর। ই গেরামে বুড়িকে মা বোলায় সব মানুষে।

তখন কেমন যেন নিশ্চিন্ত বোধ করে নেপেন দারোগা।

কত দেরি? আর কত দেরি?

কিছু বলা যায় না, কখন কী ঘটে যাবে। এ ব্যাটার রকমসকমও বেশি সুবিধের মনে হয় না। খামোখা এরকম জ্বলছে কেন থেকে থেকে?

ব্যস্ সব তৈয়ার বটে।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সব। ঢালু করে কাঠের আড়ে কাঠ বিছিয়ে চিতা তৈরি। এতক্ষণে খেয়াল হয়, জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে কখন চাঁদ উঠে চুপ করে বসে আছে। পচা রক্তের মতো লাল রঙ তার; দেখে শিরশির করে ওঠে গা।

সুখিয়া বোধহয় আশা করে সেপাই দুজন তাকে সাহায্য করবে লাশ চিতায় রাখবার জন্যে। কিন্তু কাউকে এগোতে না-দেখে নিজেই সে কাঁধে করে ওঠায় দেবেশ বকশিকে।

তারপর ঘুমন্ত একটা শিশুর মতো তাকে শুইয়ে দেয় চিতার পরে।

ঘষে ঘষে কাছে এগিয়ে আসে বুড়ি।

'মুখ দেখবি মা' চাদরের ঢাকা খুলে দেয় সুখিয়া। 'জনমের মতো দেখলে।' বলেই হো হো করে কেঁদে ওঠে সুখিয়া।

রক্তিম গম্ভীর চাঁদের আলোয় বুড়ি কি ভালো করে দেখতে পায় দেবেশ বকশির মুখ?

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে বুড়ি প্রত্যেকের মুখের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকায়। শেষে নেপেন দারোগার মুখের দিকে তার দৃষ্টি স্থির হয়। কিছু একটা বলবার জন্যে দাঁতহীন গহ্বরের ভেতর তার জিহ্বা নড়তে থাকে। কিন্তু কিছুই উচ্চারিত হয় না।

দূরে শেয়াল ডেকে ওঠে।

বুড়ি ঘষে ঘষে আরো এগিয়ে এসে দেবেশ বকশির মুখে হাত রাখে। কিছু একটা অনুভব করবার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ, তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বুড়ি বলে— আবার ঘুরি আসিস, দেবু।

গোল বাধাল সুখিয়া ডোম।

দেবুদাদাকে আগুন কে দিবেক বটে?

ধমক দিয়ে ওঠে নেপেন দারোগা। আগুন আবার কিসের? ম্যাচ ধরিয়ে দিবি। ব্যস।

সে হবেক নাই।

একেবারে গোঁ ধরে বসল সুখিয়া।

আবারো জলের কাছ দিয়ে দ্রুত দৌড়ে গেল শেয়াল। শ্মশানে এরা জীবিত মানুষকে ভয় করে না। জীবিত মানুষ বরং মৃতকে ভয় করে এখানে। জঙ্গলের ভেতরে অনেক মানুষের নিশ্বাসের মতো সরসর ধ্বনি বয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলবার জন্যে নেপেন দারোগা তাড়া দেয়। সব শালা তো ভেগেছে। আগুন দেবার জন্যে বসে আছে যে বড়।

বুড়ি হঠাৎ বিলাপ করে ওঠে।

নেপেন দারোগা ধমক লাগায় তাকে। — চোপ, বুড়ি। এই হারামজাদা, তুই আগুন দে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কান ধরে সুখিয়া। আরে, রাম-রাম। সি হবেক নাই। হামার নরক হবেক বটে। হামি যো ডোম হইলোম।

হাহাকারের মতো শোনায় সুখিয়ার কণ্ঠস্বর।

শিউশরণ আর রামদাসের মুখের দিকে দ্রুত একবার তাকায় নেপেন দারোগা। জঙ্গল ভেদ করে মানুষের পায়ে পায়ে এগিয়ে আসার শব্দ যেন তার বুকের পাঁজর ভেঙে দিতে চায়। ইতস্তত করে সুখিয়াকে বলে, এ হারামজাদা। আছে তোর কাছে?

কী মহারাজ?

আরে ব্যাটা, বোতল।

ঢকঢক করে বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে, 'জীবনে এই প্রথম' বলে ঝাঁঝের মুখে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে, নেপেন দারোগা বলে, 'দে শালা, ম্যাচটা দে।'

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দুর্বোধ্য একটা অনুভূতির সঙ্গে লড়াই করবার রসদ সংগ্রহ করে অকম্পিত হাতে 'দেবেন বকশির মুখাগ্নি করে দেয়।'

চিতার আগুনে রক্তিম চাঁদের আলোর দিকে লকলক করে ওঠে।

কাঠ পোড়ার চড়চড় শব্দে শত কণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়।

আল মাহমুদ

জলবেশ্যা

পেঁয়াজ আর রসুনের মরশুমে লালপুর হাটের চারপাশের গ্রামগুলোতেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের দু'মাইল দূর থেকেও বাতাসে কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝাল গন্ধটা বেপারিদের নাকে এসে লাগে। গন্ধটা তখন আর শুধু পেঁয়াজের গন্ধ থাকে না। রসুনেরও একটা অহংকারী গন্ধ আছে যা বাতাসে পেঁয়াজের গন্ধের সাথে মিশে বাতাসকে স্বাদযুক্ত করে তোলে।

এ ধরনের কাঁচা মসলার মরশুমে শুধু যে বাজার আর বাতাসেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। হাটের চারপাশের এলাকার মানুষের শরীরেও এ গন্ধটা থাকে। কথা বললে তাদের মুখ থেকেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেরোয়। তাদের ঘামে, বগলের নিচের চুলে গন্ধটা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে কোনো লোক, যে পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবসা করে না, তার পক্ষে এ পরিবেশে তিষ্ঠানো দায়।

হাটের মধ্যে, মানুষের পায়ে চলা পথের পাশে পেঁয়াজের খোসার আস্তরণ জমে এমন উঁচু হয়ে থাকে যে কাঁচা মসলার মরশুম শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবারের হাটের পশারিরা পেঁয়াজ-রসুনের স্তূপীকৃত খোসার উপরই তাদের বেসাত বসায়। এর উপরই কেনাবেচা চলে। যারা চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে হাটে তাদের বেসাত নিয়ে আসে, তাদের অনেকেই বেচাকেনা শেষ করে রাতে ঘরে ফিরতে পারে না। একে তো তারা হাট করে এমনিতেই ক্লান্ত থাকে, তার ওপর রাতের বেলায় মেঘনাপাড়ের পূর্বাঞ্চলটা কোনো বেপারির জন্যই তেমন নিরাপদও নয়। চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে। দিনের বেলাতেই বেপারিরা চোর-বাটপারের ভয়ে দলবেঁধে হাটে মাল নিয়ে আসে। চার-পাঁচজন বেপারির এক-একটি ছোট ছোট দল হাটবারের সকাল থেকে মধ্যাহ্ন অবধি মাথায় পশার নিয়ে হাটে আসতে থাকে। রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের দাম-দস্তুর, মাল গছানো ফাও মারা চলতে থাকে। রাত দুটোর দিকে হাট যখন স্তিমিত হয়ে আসে, হাটের নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা কেনাকাটা শেষ করে গাঁয়ে ফিরে যায়, বেপারিরা তখন তাদের বড় বড় কুপির আলোয় পয়সা গোনা শুরু করে। আর এই হিসাবের কাজটা তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলে। তখন তাদের চেহারায়, হাতের নড়াচড়ায় এমন একটা সতর্কতার পরিচয় ফোটে দেখলে মনে হবে, কোনো অদৃশ্য তস্কর এখুনি তাদের পুঁজি কেড়ে নেবে। খুতির মুখটা ভালো করে বেঁধে কোমরে না-পেঁচানো পর্যন্ত তাদের মন থেকে অস্বস্তিটা দূর হয় না। প্রত্যেক বেপারির বাঁ-কাঁধে

সাবানে কাচা একটা করে আধময়লা শার্ট থাকে। সাধারণত মাল নিয়ে হাটে আসার সময় কিম্বা বেচা-বিক্রির ঝামেলায় তারা জামাটা পরে না। পরে তখনই, মাল কাবারের পর খুতিটা কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে। হাটের হোটেলে ভাত খাওয়ার খুচরা দু-তিনটে ভাঙা টাকা রাখার যখন আর জায়গা থাকে না তখন। তারা তাদের কাঁধের ঘামে ভেজা কুঁচকানো শার্ট কিম্বা পিরহানগুলো গায়ে দিয়ে পকেটে ভাতের টাকাটা রাখে। তারপর বিড়ি ধরাতে ধরাতে আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে।

রাত বারোটার পরই আজিজ মিয়ার চুলা থেকে মেঘনার তাজা বোয়াল কিম্বা গজার মাছের ঝাল শুরুয়ার প্রকাণ্ড ডেগটা নামে। কাঁচা মসলার বেপারিদের মনমতো খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে আজিজ মিয়ার বেশ নামডাক আছে। আগুনের মতো ঝাল ঝোল দিয়ে বেপারিরা যখন লাল করে ভাত মাখিয়ে নিয়ে নলা তুলতে থাকে, আজিজ মিয়া তখন আদবের সাথে তার বসার গদিটা ছেড়ে নেমে এসে খদ্দেরদের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। জগ থেকে কারো গেলাসে পানি ঢেলে দিতে দিতে ছোকরা চাকরটাকে বলে, 'কান্দু বেপারিরে আরো দুইডা কাঁচামরিচ দে।' কিম্বা পাশের ভোজনরত বেপারির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'খালেক ভাইয়ের পাতে একটু সওরা দে রইস্যা।' দোকানের ছোকরাটা মহাজনের কথা শেষ হবার আগেই গজার মাছের 'ভাঙাচুরার' কড়াই থেকে একহাতা তপ্ত ঝোল খালেক বেপারির পাতে ঢেলে দেয়। খালেক বেপারি 'বছ বছ' করতে করতে টিপা নুনের মুছি থেকে নুন নিয়ে ভাতের উপর ছিটাতে ছিটাতে পরিতৃপ্তির হাসিতে ঘর্মাক্ত মুখটা ভরিয়ে তোলে। খাওয়া হয়ে গেলে বেপারির পেঁয়াজ-রসুনের খোসার আস্তর পড়ে থাকা হাটের আনাচে-কানাচে তাদের ছালা-গামছা বিছিয়ে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেবার জন্য গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দেয়। কেউ তাস খেলে। কেউ আবার দলের কাছে খুতিটা নিরাপদে রেখে পেঁয়াজের বাকলের বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

এ হল যারা হাঁটাপথে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে হাটে কাঁচা মসলা নিয়ে আসে তাদের অবস্থা। কিন্তু যারা নদীপথে নৌকা নিয়ে মাল কিনতে আসে তাদের কাজকারবার আবার আলাদা। প্রতি হাটবারে তাদের অসংখ্য পাল-তোলা নৌকা ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে তরতর করে বাজারের বিস্তৃত ঘাট অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে। নৌকার মাঝিরা ঘাটে ভিড়বার আগেই পালের দড়ি খসিয়ে নৌকার গতিবেগ স্তিমিত করে দিলে গলুইয়ের মাথাগুলো এমন সতর্কতার সাথে নৌকার সারির ফাঁকফোঁকে ঢুকে যায়, দেখলে মেঘনার মাঝিদের হাল ধরার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠোকাঠুকির কোনো ব্যাপার নেই। মাঝিরা একজন আরেকজনের নাওকে জায়গা করে দিচ্ছে। যেন মাঝিদের মধ্যে এমন একটা অলিখিত নিয়ম আছে যাতে প্রতিটি নৌকা ঘাটের ঘেরের মধ্যে নিজের উদ্যত মাস্তুল নিয়ে এসে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। বাজারের ঘাটটাকে ঘিরে নৌকার সার যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, দূর থেকে দেখতে বেশ লাগে। মনে হয়, প্রাচীন যুগের কোনো পোতাশ্রয়। প্রতিটি মাস্তুল আকাশের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে আছে। বাতাসে দড়িদড়া নড়ছে। মেঘনার ঢেউয়ের বাড়িতে প্রতিটি নৌকা একটু কাঁপছে। আর আহত জলের শব্দ চারদিকে একটা একটানা মাতমের রোল তুলছে।

এসব নৌকা আশপাশের বড় বড় বাজার ছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট থেকে আসে। পেঁয়াজ-রসুন, মুগ-মশুর আর মিষ্টিজলের শুঁটকির জন্যে এ হাট প্রসিদ্ধ। ভৈরব, আশুগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ, নবীনগরের পরই লালপুর হাটের কথা লোকে বলে। যদিও হাটবাজারের লোক সমাগমের দিক দিয়ে ভৈরব-আশুগঞ্জের কাছে এ হাট কিছুই না। তবু প্রতি হাটবারে চার পাঁচশ' বড় বড় নাও এ হাটেই মাল কিনতে ভিড় জমায়। দেশের পয়সাওলা মুদি, মরিচ-মশলার দালাল, শুটকির কারবারি, তাঁতে বোনা মোটা নীলাম্বরি শাড়ি আর লুঙ্গি ব্যবসায়ীদের বেহেশত হল লালপুর হাট। এ হাটের পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, সিদল শুঁটকির খুশবাই নাকে লাগলেই হাটবাজারের উটকো দালালদের জিভে পানি ওঠে। তারা নাও বাইতে বাইতে বৈঠা কাঁপিয়ে বাতাস ঠুকে রসালো গান ধরে।

আর আসে বেদেরা। তাদের ঝাঁকবাঁধা নৌকাগুলো মেঘনার বুকে ভাসমান ছোট গ্রামের মতো দেখায়। তারা সহজে ঘাটে ভেড়ে না। যে পাড়ে হাট, তার ঠিক উল্টো দিকে, অপর পাড়ে তীরের মাটি থেকে তিরিশ-চল্লিশ গজ নদীর ভেতরে তারা তাদের বহর আটকায়। নদীর পাড়েও নয়, আবার নদীর মধ্যেও নয় এমন একটা জায়গায় তারা অবস্থান নেয়। তারপর ছোট কোষা নৌকায় এরা হাটের ঘাটে এসে লাগে। বেদে যুবারা হাটে কাচের বাঙড়ি, আয়না, গন্ধের বাসান, সাপের তাবিজ, দাঁতের মাজন আর ছুরি-চাকু বিক্রি করে। মেয়েরা যায় গ্রামে। তাদের হল সাপ নাচানো, শিঙ্গা লাগানো আর দাঁতের পোকা খোলার ব্যবসা। হাটের দিন সকালে তারা আসে আর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই বহর ভাসিয়ে অন্য হাটের দিকে চলে যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় যেখানে একটা গ্রামের মতো দেখা যেত, দেখা যেত নদীর কোল ঘেঁসে জ্বলে উঠেছে অসংখ্য আলোর ফুটকি, রান্নার আগুন আর ধোঁয়া, কিম্বা শোনা যেত শিশুর কান্না আর বেহুলার রূপ বর্ণনা করে পুরুষের গলা ছেড়ে দেওয়া গান, পরের দিন সেখানে উন্মুক্ত জলের বিস্তারে ঢেউয়ের মাতামাতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

লালপুর হাটের তরুণ দালালদের নেতা হল আবিদ বেপারি! সব হাটেই যেমন নিজের পুঁজি ছাড়া ব্যবসা জমানোর একদল লোক থাকে, লালপুর হাটেও পাটের মরশুম থেকে শুরু করে পেঁয়াজের মরশুম পর্যন্ত আবিদ বেপারির ইয়ারেরা হাঁকডাক করে বেড়ায়। বাইরের বেপারিদের মাল খরিদ করতে হলে দালালের সাহায্য না হলে চলে না। দরদস্তুর ও মাল ধরার কাজটা দালালেরা আগেই করে রাখে। এজন্য অবশ্য মহাজনরা আগেই দালালদের পয়সা দেয়। দালালরা যাতে বাজারে আসা মাত্রই চাষিদের ঝুড়ি আর ছালাভর্তি পেঁয়াজ-রসুনটা হাতাতে পারে সেজন্য অগ্রিম শ'খানেক টাকা প্রত্যেক মহাজনই দালালদের দিয়ে রাখে। মাল কেনা হয়ে গেলে মহাজনরা কুলি দিয়ে নৌকায় মাল উঠিয়ে নেয়। প্রথম এরা খুতি খুলে কুলি বিদায় করে। পরে সন্ধেটা পার হয়ে গেলে, যখন নদীর ঘাটটা একটু অন্ধকার হয়ে আসে তখন একে একে দালালরা মহাজনের নৌকায় উঠতে থাকে। পান-বিড়ি খেতে খেতে দালালির পয়সার হিসাব চলে। দালালরা তাদের পয়সাটা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়ে তারপর নাও থেকে নামে। যে দিন মহাজনদের মনমতো দামে দালালরা মাল ধরতে পারে সেদিন তাদের খুব আদর হয়। মহাজনরা নৌকায় বসিয়ে দালালদের খাওয়ায়।

সাধারণত মহাজনরা খাবারটা নিজেদের মাঝিদের দিয়ে নৌকার মধ্যে 'নাইয়া' চুলায় রাঁধে। হাটের দিন তারা মুরগি খায়। খাওয়ার ব্যাপারে এসব মহাজনদের বেশ একটু দিলদরিয়া ভাব আছে। যেসব মুদি-মহাজনদের বয়স কম, তারা আবার হাটে আসবার সময় পাটাতনের নিচে 'বঙ্গেশ্বরী'র বোতল নিয়ে আসে। কিংবা গাঁজার পুরিয়া। দিশি মদকেই মাঝি-মহাজনরা 'বঙ্গেশ্বরী' বলে সম্মান জানায়। রাত আটটার পর মহাজনদের নৌকার কাছে গেলে পেঁয়াজ-রসুন আর শুঁটকির গন্ধ ছাড়াও মাংসের স্বাদু গন্ধের সাথে মদ আর গাঁজার কড়া গন্ধ মিশ্রিত হয়ে একটু অদ্ভুত রাসায়নিক সৌরভ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে আসা বড় নৌকার মহাজনরা আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানে যায় না। যারা যায়, তারা হাড়কিপটে।

আজকের হাটে বেচাবিক্রি বেশি না হলেও আবিদ বেপারি তার দালালির পয়সা নিয়ে সকলের শেষে বেশ একটু রাত করে মহাজনের নাও থেকে নামল। প্রায় একশো মণ পেঁয়াজ আর দু'জন মহাজনকে আবিদ বেপারি ধরিয়ে দিয়েছে। আড়াইশো টাকা আজ আবিদ বেপারির খুতিতে বাঁধা। এ হল তার একহাটের রোজগার। এখন এক সপ্তা স্রেফ আজিজের হোটেলে ঝালঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া আর হাটের গলিতে পেঁয়াজ-রসুনের বাকলের উপর সঙ্গীসাথীদের সাথে তাস পেটানো ছাড়া আবিদ বেপারির কোনো কাজকাম রইল না।

ঘাটপাড়ের ফ্যাচফ্যাচে কাদামাটি এড়িয়ে আবিদ বেপারি বাজারের এক প্রান্তে শুঁটকিহাটার উঁচু জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নদীর দিকে। হাটের এ দিকটায় নদীর প্রস্থ প্রায় মাইল চারেক হবে। নদী মোটামুটি শান্ত। ছোট ছোট ঢেউ থাকলেও মেঘনাকে এ সময়টায় প্রশান্তই বলা যায়। ওপাড়ে গ্রামগুলোকে একটা ক্ষীণ কালো রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। রেখার মধ্যে দু'-একটা আলোর ফোঁটা, দুধের ফোঁটার মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বেদেদের ঝাঁকবাধা নাওগুলোর আলো নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ে প্রতিবিম্ব তুলে একটা অখণ্ড আলোর মালার মতো ভাসমান মনে হচ্ছে। কিম্বা মনে হচ্ছে, নদীর ভেতরে নুয়ে পড়া কয়েকটা হিজলগাছকে যেন একঝাঁক অতিকায় জোনাকি ঘিরে ধরেছে।

আবিদ বেপারি বেদের বহরটার দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বহরটার প্রতিটি নৌকার ছৈয়ের ভিতরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে অথবা ছৈয়ের বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বেদে-বেদেনীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাদের রান্না-বান্নার কাজ সেরে খেতে বসেছে। কারণ একটু আগেও নৌকাগুলোকে ঘিরে যে ধোঁয়ার আস্তরণটা ছিল এখন আর তা নেই। রাতও অনেক হয়েছে। সময় সাড়ে দশটার কম হবে না।

আবিদ বেপারি একটা সিগ্রেট ধরাল। চোখ তার এখনও বেদেবহরটার দিকে স্থির হয়ে আছে। সিগ্রেটটা টান দেয়ামাত্রই একটা ঢেঁকুর উঠল বেপারির গলা দিয়ে। দিশি মদ, ঝাল মুরগির মাংস আর পানের রসের মিশ্রিত ঝাঁঝাল মোদো গন্ধ। টক, বিস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল ময়লা জিভের ওপর। অন্ধকারে মুখটা বিকৃত করে বেপারি চোখ নামিয়ে আনল তার আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগ্রেটটার ওপর। কড়া মিনার সিগ্রেটের ধোঁয়া পেটে গিয়েই এই অশুভ, দুর্গন্ধযুক্ত চুকা ঢেঁকুরটা ডেকে এনেছে। একবার

ভাবল সিগ্রেটটা ছুড়ে ফেলবে। আবার কী মনে করে সিগ্রেটটা ঠোঁটের উপর এনে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল। অনেকটা সুখটানের মতো করে। তারপর এক বুক ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে আবার নদীর দিকে চোখ ফেরাল।

হাঁ, বহরটা থেকে বেশ দূরে, একটু দক্ষিণে নৌকা বাঁধা। ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে দুলছে। নৌকার ভেতরে কোনো বাতি দেখা যাচ্ছে না। আবিদ বেপারির মুখটা পুলকে প্রসন্ন হয়ে উঠল। নৌকাটিকে দেখা যাচ্ছে ভাসমান একটা কালো চোখের মতো। আবিদ বেপারি জানে বহরের অন্যান্য বাতি যখন নিভে যাবে তখন অন্ধকারে কালো চোখের মতো এই নৌকার বাতি জ্বলে উঠবে। প্রথমে ছৈয়ের ভেতর একবিন্দু আলো। তারপর আলোটা গলুইয়ের কাছে এগিয়ে একটু স্থির হয়ে থাকবে। তারপর মানুষের মাথা-সমান উঁচুতে উঠে বাতিটা তার প্রতীকী বার্তা ব্যক্ত করে ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকবে। তখন মনে হবে অমাবস্যায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর এক অংশে ভাগ্যক্রমে একটা আদিম অগ্নিকণা জলে-স্থলে পুরুষদের ডাকছে।

আবিদ বেপারি হাটের দিকে আর গেল না। বরং হাটের ডানহাতের রাস্তায় নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। পথটা অন্ধকার। তবে জলের সম্ভবত নিজস্ব একটা ক্ষীণ দ্যুতি আছে যাতে নদীর শরীরটা অন্তত বুঝে ওঠা যায়। আর এই উপলব্ধি থাকলে পানির পাশে কোথায় অন্ধকার মাটির উপর দিয়ে পায়ে চলার পথটি আছে তা-ও রাতের পথিকরা ঠাওর করে ফেলে। বেপারি যেহেতু আশৈশব এপথে চলাফেরা করেই বেড়ে উঠেছে, সেজন্য পথ চলতে গিয়ে তাকে মাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে না। আসলে তার চোখটা এখনও সেই নদীর উপর ভাসমান অতিকায় কালো চোখের স্থির দারুদৃষ্টির দিকেই নিবদ্ধ।

বেপারি নদীর পাড় ধরে প্রায় মাইলখানেক পথ পার হয়ে একটি গ্রামের ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। জেলেদের গ্রাম। জেলে বউরা দিনমান এই ঘাটে জটলা বেঁধে জলের কাজ করে। এখন এই ঘাটটাকে বড় নিস্তব্ধ আর শীতল মনে হল। ঢেউ এসে কাপড় কাচার কালো পাথরটার উপর ছলছল করছে। কেমন এক ধরনের শীতলতা আবিদ বেপারির শরীর স্পর্শ করল। বেপারি ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে বেদেবহরের পাশে নিঃসঙ্গ নৌকাটির দিকে তাকাল। কাত হয়ে পড়া একটি বিশাল মাখনার মতো আয়তলোচন এখনও বেপারিকে দেখছে। চোখে চোখে তাকাতে না-পারা বয়োসন্ধির কিশোরের মতো আবিদ বেপারি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। ঘাটের কাছেই জেলেদের জাল রং করার শূন্য গামলাগুলো পড়ে আছে। এখন গাবফল পোক্ত হওয়ার ঋতু। তাই ঘাটের পেছনে বহুদূর পর্যন্ত গাবের কষ সিদ্ধ করার বড় জালা আর গামলার ছড়াছড়ি। কাঁচাগাবের কষটে গন্ধ জেলেপাড়া থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত বাতাসকে কেমন বিবমিষায় ভরিয়ে রেখেছে। অন্য সময় এ পাড়ার পাশ দিয়ে গেলে মাছের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগত। কিন্তু এখন গাবের কাঁচা রসের গন্ধে নাকে রুমাল দিয়ে ভদ্রলোকেরা ঘাট আর পাড়াটা পার হয়ে যায়।

আবিদ বেপারি দেখল ঘাটের একটু দূরে যেখানে বড় কাঠালি বটগাছটা আছে সেখানে একটা লম্বা জেলে নাও খাড়া লগির সাথে বাঁধা। নাওটা খাড়া লগির সাথেই

বাঁধা কিনা তা যদিও আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, তবুও এতদঞ্চলের লোক বলে বেপারি তার সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝল নৌকাটা নিশ্চয়ই চইড়ের সাথেই বাঁধা থাকবে। নাওটা দেখেই আবিদ বেপারি খুশি হয়ে গেল। আসলে বাজারের ঘাট থেকে অন্ধকারে জেলেপাড়া পর্যন্ত আসা যে শুধু একটা জেলেনৌকার জন্য তা যেন বেপারির অবচেতনা তার নিঃশব্দ সচেতনতার কাছে ব্যক্ত করল। যেন বেপারি বুঝতে পেরেছে, নিরর্থক নয়, একটা নৌকার জন্যই তার এই মাইলটাক পথ পেরিয়ে আসা। খুশি হয়ে গেল বেপারি। ঘাট পার হয়ে কাঠালি বটের প্রসারিত জটিল শিকড়ের উপর গিয়ে আস্তে আস্তে বসল। তার এখন অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত-না বেদেদের ভাসমান গ্রামটা তাদের সবগুলো বাতি নিভিয়ে জল হয়ে যায়।

নদীর বাতাসে কাঠালি বটের পাতাগুলো মাথার উপর সড়সড় শব্দ তুলছে। স্তব্ধতাকে বিশদ করার জন্যেই যেন শব্দটা একটানা আবিদ বেপারির কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে। গাছের সবচেয়ে বড় শাখাটায় সম্ভবত শকুনের বাসা আছে। কারণ একটা পাখির কান্নার মতো শব্দ অকস্মাৎ আবিদ বেপারির কানে বেজেই থেমে গেল। বেপারি একবার মুখ তুলে গাছের বড় ডালটার দিকে তাকাল। পরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে গাছের পত্রপল্লবকে একটা মস্ত বড় কালো ছাতি ছাড়া আবিদের আর কিছুই মনে হল না। আর ছাতিটাকে যেন কোনো অদৃশ্য হাত বেপারির মাথাতেই ধরে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃতির এই অনুকম্পায় আবিদ বেপারি কিছুটা অভিভূতের মতো পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট ধরাল।

এবার সিগ্রেটটা আর তত খারাপ লাগছে না। বিস্বাদ অবস্থাটা কেটে গিয়ে তামাকের স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে। বেপারি আস্তে, মৃদু টানে টানে সিগ্রেটটা শেষ করতে লাগল। এই বটগাছটার আঁকাবাঁকা শিকড়ের সাথে বেপারির কৈশোরের কয়েক বছরের আনন্দময় স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। বারো-তেরো বছরের এক বালক তার এক বখাটে সঙ্গীর সাথে, স্কুলের নাম করে এখানে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলত, 'পড়া কইরা আইছি।' আর আনন্দে বিগলিত এক চাষি-বউ তার ছেলেকে যত্ন করে ভাত ভাইয়ে দুধের বাড়তি সরের পেয়ালাটা ছেলের মুখের কাছে তুলে ধরত। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ায় আবিদের মনটা ভিজে গেল। যে বড় শিকড়টার নিচে বইপত্র লুকিয়ে রেখে আবিদ তার সঙ্গীর পেছন পেছন জেলেপাড়ায় গিয়ে মার্বেল খেলত, গাছের সেই বড় শিকড়টার উপরই এখন সে বসে আছে। আর গাছের মাত্র তিরিশ গজ দূরেই তার মায়ের কবর। কৈশোরের সুখের দিনগুলো শেষ হবার আগেই মা তার ওলাউঠায় মরে যায়। মা'র কথা মনে পড়ায় বেপারি শিকড়ের আসন ছেড়ে নেমে এল। তারপর চলল কবরস্থানটার দিকে।

কবরস্থানের উঁচু জায়গাটায় উঠে দাঁড়াতেই, একটা ঠাণ্ডা ভয়ের বাতাস এসে আবিদের শরীর ও মনকে কাঁপিয়ে দিল। মদের নেশা নেশা ভাবটা কেমন যেন কেটে যাচ্ছে। আর নেশার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই যেন কবরের গর্তগুলোতে বহতা বাতাস বাড়ি খেয়ে আবিদের শরীরের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। ভয়ে শিউরে

উঠল আবিদ বেপারি, আগের সেই বারো-তেরো বছরের বালকের মতো। একবার তার মায়ের কবরটা জিয়ারত করার কথা মনে উঠল। কিন্তু কবর ও নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকায় যে আতঙ্ক আছে তা সম্ভবত কোনো বয়স মানে না। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক আবিদ বেপারি স্কুলপালানো বার বছরের বালকের মতো হঠাৎ এক দৌড়ে কবরস্থানটা ছেড়ে পালিয়ে বটগাছটার কাছে ফিরে এল। যদিও নদীর পাড়ের এই নিঃসঙ্গ গাছটার নিচে ভয় থেকে পালানোর কোনো কারণ অথবা সত্যিকারের নিরাপত্তা নেই। তবুও আবিদের মনে হল, এখানে কোনো ভয় নেই। এক আবিদ বেপারি ছাড়া জায়গাটা আগের মতোই জনমানবশূন্য, শুধু শকুনের বাচ্চাটা বোধহয় আরও একবার মানুষের শিশুর কান্নার মতো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

আবিদ বেপারি বুঝতে পারল না কেন সে তার মায়ের কবর থেকে এভাবে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। সাধারণত বেপারি ভীতু লোক নয়। ভুত বা জ্বিনটিনের ভয় সে করে না। এছাড়া এখন সে আর বারো বছরের ইস্কুলপালানো নিতান্ত বালকও নয়। তবু কেন এমন হল? বেপারি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল। পরে অবশ্য সে আপন মনেই এ প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজে বের করতে চাইল। তার মনে হল, কররটা হল মরা মানুষের জায়গা। এরা আর পৃথিবীর কেউ না। আজ যেমন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সারারাত অপেক্ষা করলেও এদের কথা শোনা বা দেখা যাবে না, তেমনি কাল প্রভাতেও কবর কবরই থাকবে। জ্যান্ত মানুষের কোনো কাজে এদের আর কিছু করার নেই। জীবন ত্যাগ করে যা পাওয়া যায় এই কবরের মৃতরা নিশ্চয়ই তা পেয়েছে। যারা প্রাণবন্ত তারা তা জানে না। জীবন ধারণ করে তা কোনোদিন কেউ জানতে পারেনি। কবরের লোকেরা, এমনকি নিজেকে নিরাপদ বোধ করছে, হোক তা রাতের মধ্যভাগে জনমানব অথবা কলরবশূন্য, কিন্তু তা জীবনের মধ্যেই রয়েছে। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে যেমন তাদের অস্তিত্ব আছে আগামীকাল সকালেও তারা থাকবে। জীবন ও জগৎ ত্যাগ করে মৃত্যুর রহস্য তারা আবিদ বেপারির মতো অনবহিত বলেই এদের মধ্যেই আবিদ বেপারির নিরাপত্তা। এ ধরনের একটা রন্ধ্রহীন দার্শনিক চিন্তায় আবিদ বেপারির মতো আধ-মাতাল হাটবারের দালালও আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। মনে হল তার ভীতিটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সে আবার মুখ ফিরিয়ে কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে, জোরে চিৎকার করে বলল, 'মায়ো, বাজান আবার এক বেডিরে বিয়া কইরা আমারে খেদাইয়া দিছে। জমিজিরাত কিছু দেয় নাই। আমি বাজারে বেবসা করি, দালালি করি। ভালোই আছি। তুই হুনছ মায়ো, আমার কতা? হুনছ?'

অন্ধকার কোনো জবাব দিল না। কোনো প্রকার জবাবের আশায় নয় বরং কিভাবে তার কাঁপা কাঁপা সম্বোধনগুলো অন্ধকারের আবরণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করার জন্যই আবিদ বেপারি কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বেদেবহরের বাতিগুলো কখন নিভে গিয়ে পুরো বহরটা একটা কালো দাগের মতো হয়ে গেছে তা আবিদ বেপারির খেয়াল ছিল না। যখন নদীর ওপর চোখ পড়ল, দেখল সবকিছু কেমন ঠাণ্ডা জল হয়ে আছে। আর সেই নৌকাটা যা এতক্ষণ আবিদ বেপারিকে চোখে চোখে রাখছিল, তা-ও কেমন যেন ঢেউয়ের উপর ঠাণ্ডা চুপ মেরে ভাসছে। তবে

কি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কালো কাঠের চন্দ্রবিন্দুর মধ্যে কোনো আলোর কণা জ্বলে উঠে অন্ধকার দিকবিদিকে তার প্রতীতি আহ্বান জানিয়ে এখন চুপ মেরে গেছে? মহা ভাবনায় পড়ল আবিদ বেপারি। তার মনে হল নৌকার বাতি তাকে আকুল হয়ে ডেকেছিল। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এখন নিভে গেছে। কিম্বা হাটের কোনো তরুণ দালাল বাতিটার ডাক শুনে নিশ্চয়ই আবিদ বেপারির আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

দারুণ অস্বস্তির মধ্যে আবিদ বেপারি আরও কতক্ষণ বসে রইল। আর কালো চোখের মতো নৌকাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'আমি যামুই। কেউ গিয়ে থাকলেও যামু। মাইরা ভাগাইয়া দিয়া ভিতরে হামামু।' এবার তার চোখ গেল ঘাটের অদূরে বাঁধা জেলেনৌকাটার দিকে। এ নৌকাটাকেও বেপারির কাছে একটা তির্যক দৃষ্টি কালো চোখের মতোই মনে হল। যেন নদীর বিশাল দুটি আয়তলোচন কেউ জলের ললাটের দু'পাশে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে নদীর ওপার থেকে একটা চোখ যেমন এক-দৃষ্টিতে আবিদ বেপারিকে দেখছে, তেমনি এপারেও অপর চোখটা টেরচা চাউনিতে তাকে অবলোকন করছে বলেই বেপারির মনে হল।

বেপারি গাছের শিকড়টা ছেড়ে নিচে নেমে এল। একবার তাকাল বেদেবহরটার দিকে। বেদেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নৌকাটার কাছে এসে লগির বাঁধন খুলতে খুলতে একবার আকাশের দিকে, আবার নদীর দিকে দেখল। আকাশের প্রভাবে পানির উপর অস্পষ্ট দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই একটু পরই চাঁদ উঠবে। যদিও অস্পষ্ট আকাশের ঈশানে এক টুকরো মেঘ জমে আছে, তবুও আবিদ বেপারি নির্ভয়ে নাও ভাসাল। অবশ্য এরই মধ্যে নদীর উপরে বাতাসের বেগটা একটু বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢেউয়ের দাপানি বেড়ে গিয়ে নৌকাটাকে বেশ দোলাচ্ছে। বেপারি নৌকা ভাসিয়েই টলমল করতে লাগল। লগিটা সারাদিন জল খেয়ে পাথরের মতো ভারি। নৌকাটাকে ঠিকমতো সামলাতে না-সামলাতে তা একটু ডানদিকে বাঁক ঘুরে চলতে লাগল। বেপারি পাকা মাঝির মতো ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণ শক্তিতে আবার এটাকে বাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বেশ একটু হাঁপিয়ে পড়েছে। শুধু লগি ঠেলে এত বড় নদী পাড়ি দিয়ে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা সোজা ব্যাপার নয়। তবু বেপারি শুধু গায়ের জোরে নৌকাটাকে যথাসম্ভব সোজা রেখে যেতে লাগল। একবার লগি ঠেলে দিয়ে কোমর সোজা করে সামনের দিকে তাকাতেই দেখল বহুদূরে ভাসমান কালো চোখের উপর একটি আলোর বিন্দু বিরামহীনভাবে ডানে-বাঁয়ে দুলছে। সতেজ ঢেউয়ের উপর দোদুল্যমান আবিদ বেপারির শরীরের প্রতিটি সন্ধি যেন এক আনন্দময় শিহরণে অকস্মাৎ কেঁপে উঠল।

'অই, ডাকতাছে।' মনে মনে বলল আবিদ বেপারি। ততক্ষণ আবিদ বেপারির নৌকাটা মাঝনদীতে পৌঁছাবার আর বেশি দেরি নেই। আবিদ বেপারির কেবলই মনে হতে লাগল নদীর একটা অন্ধকার চোখ যেন আকস্মিক জলের ঝাপটায় দৃষ্টি ফিরে পেয়ে হারিয়ে যাওয়া অপর একটি চোখকে ডাকছে। আর এই মায়াবী আহ্বানে, মন্ত্রবলে বেপারিও ললাটভ্রষ্ট এক আয়তলোচনকে নদীর দুঃখিত মুখমণ্ডলের কাছে একটু একটু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল বেপারি। আকাশব্যাপী তারার ঝালরের মধ্যে সাপের ডিমের মতো সাদা চাঁদ দেখা দিয়েছে। পানখ সাপের ডিমের মতোই চাঁদের মধ্যভাগটা একটু ঘোলাটে আর এবড়োথেবড়ো। এখন আর ঈশানকোণে পুঞ্জীভূত মেঘের পাহাড় নেই। যদিও নদীর উপর দিয়ে বাতাসের বেগটা এখনও স্তিমিত হয়নি। বেপারি আবার অন্ধকার চোখের সাদা মণির মতো কম্পমান আলোর ফোঁটার দিকে তাকাল। আলোটা এখনও নড়ছে। আর যে হাত আলোর ইশারা নিয়ে এতক্ষণ নড়াচড়া করছিল, এখন অস্পষ্ট হলেও আবিদ বেপারির দৃষ্টিগোচর হল। কালো একটা গাছ যেন একটিমাত্র সোনালি ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবিদ বেপারি তাড়াতাড়ি ব্যবধানটা অতিক্রম করতে চাইল। কিন্তু জোরে লগি ফেলেই বুঝল এখনো থৈ নেই। নৌকা এখন মাঝনদীতে। এখানে আর নদীর তল পাওয়া যাচ্ছে না। এ জায়গায় নদী খুব গভীর তা বেপারির অজানা ছিল না। এতক্ষণ লগিটার প্রায় মাথায় আঙুলের টিপ রেখে বেপারি নৌকা বেয়ে এসেছে। এই অথৈ অবস্থায় কী করবে হঠাৎ বেপারি যেন তা সমঝে উঠতে পারছে না।

এদিকে আহ্বানকারী চোখের মণিটা হঠাৎ স্থির হয়ে আছে। কাঁপুনি থামিয়ে আলোময় চোখটা যেন মায়াভরা চাহনিতে তার সহোদর চোখটাকে দেখছে। আর নদীর অথৈ ললাটের উপর দিশেহারা একটা চোখ তার উদ্দিষ্ট যুগলের কাছে পৌঁছতে না পেরে ঢেউয়ের দুলুনিতে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে ভাসতে লাগল।

বেপারি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তারপর লগিটাকে মাঝমাঝি ধরে নৌকার দু'পাশে জলের উপর অনেকটা বাড়ি দেওয়ার মতো করে জল টানতে লাগল। হাঁ, এবার ঢেউয়ের উপর দিয়ে কমজোর চলায় নাওটা এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে বেপারি মাঝনদী পেরিয়ে যাচ্ছে। নৌকা যতই আগে বাড়ছে ঢেউয়ের দাপানিও তত কম লাগছে। শেষে নৌকাটা যখন স্থির গতি পেল, আবিদ বেপারি দেখল সে আর বেশি দূরে নেই। আলোর গাছটা বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আলোর ফুলটা যা এতক্ষণ অদৃশ্য বৃক্ষের উঁচু শাখায় ফুটন্ত মনে হচ্ছিল তা সহসা ঝরে পড়ার মতো বৃক্ষের মূলে পড়ে আছে। গাছটাও আর অস্পষ্ট নয়। দীর্ঘাঙ্গিনী এক নারীমূর্তি নদীর উদ্দাম বাতাসে চুল খুলে দিয়ে নৌকার প্রান্তভাগে দাঁড়ানো। তার পায়ের কাছে একটা ঘোলাটে লণ্ঠন সর্বশক্তি নিয়ে আলো ছড়াচ্ছে। নারীমূর্তির মুখ যে বেপারির জেলে নৌকার দিকেই ফেরানো তা বেপারি বুঝল। নৌকা আর একটু এগিয়ে যেতেই মূর্তির সর্বাঙ্গ বেপারির নজরে এল। বেপারির মনে হল, বহুদিন আগে, তার কিশোর বয়সে গ্রামের মাতবরের পুকুর কাটার সময় মাটিকাটার মজুররা নিচে একটা মূর্তি পেয়েছিল। গাঁয়ে লেখাপড়া জানা লোকেরা বলেছিল মূর্তিটা হল গঙ্গার। হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা সেই গঙ্গামূর্তির কথা আবিদ বেপারির মনে পড়ল। গঙ্গার মতোই একটা হাত কাঁখালে রেখে শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে। সুগঠিত ও সরল। শুধু চুলগুলোই খোঁপায় বাঁধা না-থেকে বাতাসে পিছন দিকে উড়ছে। এই বেমিল দেখে আবিদ বেপারি মনে মনে ভাবল, 'তা অইলে তুমি গঙ্গাদেবী না, মেঘনাদেবী!' এ ধরনের একটা উপমা প্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় আবিদের হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল।

আবিদের নাওকে কাছে আসতে দেখে মেঘনা তার বাতিসহ নৌকার ছৈয়ের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর একটি খিলখিল হাসির ঢেউ বয়ে গেল আরেক মেঘনার ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

আবিদ বেপারি তার নাওকে সামনের নৌকার বাতার কাছে এনে লগিতে ভর রেখে দাঁড়াতেই নদী যেন নয়ন মেলে দিল আকাশের দিকে। এখন চোখ দু'টি আর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেই। সোজা চাঁদের দিকে মাত্রাজ্ঞানহীনের মতো চোখ মেলে আছে।

লগিটাকে নদীর তলদেশে সহজেই পুঁততে পারল আবিদ বেপারি। লগির সাথে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল নাওটাকে। তারপর অসঙ্কোচে গিয়ে ঢুকল সামনের নৌকায়। এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় উঠলে যে দুলুনি ওঠে, সে দুলুনিতে বেপারি বুঝল এ নৌকাটা হালকা জামকাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভেতরে আলোর পাশে বসা মেঘনার কাছে গিয়ে বসা সত্ত্বেও নাওটা সমানে দুলছিল। লগি ঠেলে আবিদ বেপারি রীতিমতো ঘামে নেয়ে উঠেছে। বাইরে নদীতে বাতাস থাকায় শরীরের ঘামটা এতক্ষণ চামড়ার উপর ফুটে বেরুতে পারেনি। এখন বদ্ধ নৌকায় তা সুযোগ পেয়ে দরদর করে সারা গতর ভিজিয়ে সপসপে করে দিল। বেপারি নৌকার ছৈয়ের চটায় গোঁজা শাড়ির পাড়ের সুতোয় তৈরি একটি হাতপাখা দেখে তা তুলে নিল। পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে বল, 'কী নাম বাইদানীর?' প্রশ্ন শুনে একটা খিলখিল হাসির শব্দে ঢেউয়ের দোলায় উথালপাথাল নৌকাটাও বুঝি মুহূর্তের জন্যে গমগম করে উঠল।

'নাম জিগাইয়া কী অইব? নাম আমার বেউলা সুন্দরী।'

কথা ক'টি বলেই আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। হাসির চোটে বুকের কাপড় কেঁপে কেঁপে নেমে গেলে একহাতে কাপড়টা গতরের উপর ধরে রাখল বেউলা সুন্দরী। ব্লাউজহীন পরিচ্ছন্ন কালো শরীর। বক্ষস্থলের উপরভাগটা কণ্ঠার দুটি প্রসারিত হাড় পর্যন্ত জলের মতো কালো হলেও একটু বেশি উজ্জ্বল এবং নির্মল। তার উপর ঝুলে আছে দৃঢ় সবুজ দুগাছি পুঁতির মালা। মালার গোটাগুলো এত ছোট যে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে মেঘনায় মাঝে মাঝে যে সোনালি মাগুর মাছ ধরা পড়ে বুঝি সেসব মাছের সবুজ ডিম দিয়ে কেউ দু'গাছি মালা গেঁথে দিয়েছে।

হাসির লহরটা সশব্দে আছড়ে পড়ে কয়েকটা গমকে ভাগ হয়ে থামতে না থামতেই বেউলা সুন্দরী বেপারির দিকে মুখ কাত করে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার নামতো হুনলেন মহাজন, অখন আপনের নামডা কন?'

'আমার নাম আবিদ আলী বেফারী। আমি অই হাডে দালালি করি।' চিবুকটা চুলকাতে চুলকাতে বলল আবিদ বেপারি।

'অ আল্লা, আপনে তইলে লখিন্দর না। আর আমি ভাবতাছি, আমার নাওয়ে লখাই আইছে।'

আবার হাসতে লাগল বেউলা সুন্দরী। তবে এখন আর তেমন সশব্দে না, বরং ঠোঁট টিপে একটু গা কাঁপিয়ে।

মেয়েটির নিগূঢ় হাসি সংক্রামিত হল বেপারির ঠোঁটেও। বেপারিও বোকার মতো হেসে ফেলল। বলল, 'তইলে ধইরা নেও আমিই চান সদাগরের পোলা লখাই। তোমার লখিন্দর।'

'এই কথা কন। আপনে তো লখিন্দরই, আমি জানি। রাইত নিশিতে যারা আমার ভরায় উড়ে, বাত্তির ডাহে উইড়া আইয়ে, তারা হগলতই লখাই।'

এবার মেয়েটির হাসিতে তার দাঁতের পাটি নজরে পড়ল বেপারির। ফকফকে শাদা আর নিখুঁতভাবে দৃঢ়। মাড়ির যেটুকু আভাস পাওয়া গেল তা-ও চকচকে কালো আর সুন্দরভাবে সংবদ্ধ। বেউলা সুন্দরীর হাসিটা বড় ভালো লাগল বেপারির।

'একটা পান খাইবেন মহাজন? জর্দা আছে, জর্দা দিয়ে দিমু।' বেপারিকে বেশ নরম সুরে, কথায় মায়া মিশিয়ে জিগ্যেস করলো বেউলা। বেপারি হেসে বলল, 'আমারে মহাজন কও কেরে, আমি তো তোমার লখাই।'

'অমা, আবার রসও আছে দেহি! বেইশ বেইশ, আমার ভুল অইছে। অখন থিকা ঠিকঠাক কথা কমু। কমু লখাই মহাজন। লখিন্দরও মহাজনই আছিল। সদাগরের পুত সদাগর। সদাগররে তো মহাজনই কয়। কয় না মহাজন?'

'হ কয়।' বেউলার মুখ নাড়ার কাছে হেরে গেল আবিদ বেপারি, হাসল, 'তোমার অত বুদ্ধি! অত কথা জানলা কেমনে সুন্দরী? পানির মাইয়ারা এমুন চালাক অয়, হিডা তো জানতাম না।'

'কবে জানতেন না লখাই মহাজন? অতদিন বুঝি হগল হাডবারে ভরার নৌকা বিচরাইয়া হুদা পানির মতো মাইয়া দেখছেন। পানির ভিতরে ঢেউ দেখেন নাই?'

বেউলার পটাপট জবাবে বেপারি একটু লজ্জিত ও স্তিমিত হয়ে গেল। তার কেন যেন মনে হল সে এক কালনাগিনীর গর্তে এসে পড়েছে যার ফণা এখন তার মাথার উপর বিস্তৃত। বেপারির এমন অকস্মাৎ দমে যাওয়া দেখে মেয়েটিও যেন হঠাৎ শরমিন্দা হয়েছে। বলল, 'কী অইল, কথা কন না ক্যান? কথা কন, আমি পান বানাই।'

আবিদ বেপারির দিকে পেছন ফিরে পিঠ দেখিয়ে বেউলা নৌকার একটা পাটাতন তুলে ভেতর থেকে পানের ডাবর বের করে আনল। ডাবরে হাত ঢুকিয়ে খয়েরের দাগে ভরা একটা তেনায় পেঁচানো একগুচ্ছ পান বের করল।

এ অবসরে আবিদ মেয়েটির পিঠ, বাহু, কোমর আর চীনা হাঁসের মতো বাঁকানো গ্রীবাভঙ্গি দেখার সুযোগ পেল। যদিও লণ্ঠনটা ধোঁয়াটে আলো ছড়াচ্ছে, তবুও তা ছৈয়ের বাঁশের চটায় ঝোলানো থাকায় সম্মুখবর্তিনীর সর্বাঙ্গে আলো পড়েছে। পেট আর বুক দিয়ে হাঁটু আর উরতের উপর চেপে বসায় পেছন থেকে তার পিষ্ট স্তন দুটির ফুলে ওঠা পর্যন্ত আবিদ বেপারি লোভাতুরের মতো দেখতে লাগল। যেন কোনো নায়রী নাওয়ের বালক মেঘনার বুকে আঁতকা ভেসে ওঠা গাং শুশুকীর সুডৌল বুকের এক অংশ দেখে ফেলে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবছে, অমা মাছেরও আবার বুনি আছে!

বেউলা সুন্দরী তখন ছুরাতার ফাঁকে একটা আস্ত সুপারি রেখে ধীরে চাপ দিয়ে কুচি কুচি করে কাটছিল। আর এই চাপের শিহরণ তার মাংসের ওপর এমনভাবে কাঁপন তুলছে যে বেপারির মনে হল মেয়েটির ঘাড়ের পেশি আর দাপনার দুলুনি যেন

দাঁড়াশ সাপের দ্রুতগামী কামলীলা। পেছন থেকে তার পাছা আর পিঠের নিচের অংশ অনেকটা চালকাড়ার হালকা ঢেঁকি উল্টে রাখার মতো। নিখুঁত আর তেলতেলে। বেউলা সুন্দরীর পরনে মোটা কালোপেড়ে শাদা শাড়ি। এ ধরনের শাড়ি সাধারণত বেদে মেয়েদের পরতে দেখা যায় না। তারা রঙচঙে কাপড়ই পছন্দ করে। বেউলার সাদাসিধা শাড়ি আর শাড়ির গোঁজন-গাজন দেখে তাকে বেদেনী বলে মনে হচ্ছে না। বরং তার শাড়ির অস্বাভাবিক শাদা জমিন আর কালো পাড় দেখে তাকে কোনো পরমা সুন্দরী জেলে-বউ বলেই ভুল হবে। দু'হাতের কবজিভরা সবুজ বাংড়ি টুংটাং শব্দ করছে। বাঁ হাতের কনুইয়ের একটু উপরে মোটা কালো তাগায় একটা চ্যাপটা মতোন বড় রুপোর তাবিজ। বাতি দিয়ে নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে কেশরাশি বাতাসের সাথে বইতে দেওয়ার জন্য ছেড়ে রেখেছিল নৌকার ভিতর তা সম্বরণ করে নেওয়ায় তার মাথার প্রায় সমান সমান এক বিশাল খোঁপার সৃষ্টি হয়েছে। যেন দূর থেকে দেখা নদীপাড়ের কোনো গ্রামের বাড়ির বনের কুঞ্জি। আবার সেই পুকুরে পাওয়া গঙ্গামূর্তির কথা মনে পড়ল বেপারির।

বেউলা সুন্দরী ততক্ষণে পান বানিয়ে বেপারির দিকে ঘুরে বসেছে। তার চোখে চোখ পড়ার লজ্জা এড়াবার জন্য বেপারি দৃষ্টি সরিয়ে নৌকার ভেতর আসবাবপত্র দেখতে লাগল।

'লন পান।' হেসে বেউলা ছোট একটা পেতলের তস্তরিতে দু'খিলি পান এগিয়ে দিল।

খিলিজোড়া একসাথে হাতে তুলে বেপারি প্রশ্ন করল, 'কেমুন জর্দা, সুন্দর খুশবাই বারুইতাছে!'

'কস্তুরী জর্দা মহাজন। কেল্লা শহীদের মাজার থিকা আনছি। খাইয়া দেখেন, ঘামে বুকের পশম ভিজ্জা যাইব।'

হেসে বলল বেউলা সুন্দরী। তার কথায় আবিদ বেপারিও না হেসে পারল না। তারপর পানের খিলি দুটি একসাথে মুচড়ে মুখে পুরে দিল। তার পান খাওয়ার নমুনা দেখে মেয়েটি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। আবিদ বেপারিও হাসতে হাসতে আবার নাওয়ের আসবাবপত্রের দিকে চোখ ফেরাল। মেয়েটি যেখানে বসেছিল, তার পেছন দিকে তিনটি সাপের ঝুড়ি। একটার উপর আরেকটা বসানো। ঝুড়ির পাশে একটা কাঠের ঢেউয়া। তার সাথেই কাত করে রাখা একটা ছোট বটি-দাও। মেয়েটির ঠিক মাথার উপর ছৈয়ের ধনুকের মতো বাঁকা চূড়াটা থেকে একটা সাপের হাড়ের মালা ঝুলছে। ছৈয়ের একপাশে বেড়ায় একটা বড় শিঙ্গা গাঁথা। এরকম শিঙ্গা দিয়েই বেদেনীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বয়স্ক বেতো নরনারীর রক্তমোক্ষণ করে বাত সারায়। কলকিসহ একটা নারকেলের হুক্কাও বেড়ায় ঝুলছে। বেড়ার সাথে বাঁধা দড়িতে দুটি ময়লা শ্রীহীন শাদা শাড়ি। ছেঁড়া, পাড়হীন। এতক্ষণে আবিদ বেপারির চোখে বেউলা সুন্দরীকে ঘিরে ধরা মমতাহীন দারিদ্র্যের বেষ্টন ধরা পড়ল।

কী দেখতাছেন মহাজন, পানিখাওড়ী পক্ষির বাসা দেখেন?'

হাসতে হাসতে জিগ্যেস করল বেউলা সুন্দরী। বেপারি কিছু বলার আগেই আবার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'ঘরে বউ-বাচ্চা আছে?'

'না, বিয়া করি নাই।'

'অ ল্যাজ কাডা হাপ।' বহে বেউলা সুন্দরী আবার হাসতে লাগল। এবার তার হাসিতে ঠাট্টার গমক বেশি। বেপারি মেয়েটির টিটকারির রেশটা বুঝতে পেরে বলল, 'ল্যাজ দিয়া কী করমু, লাজ থাকলে টানুন লাগে।'

'অ টানাটানির মাইজে নাই, খালি ছোপ মারার তালে ঘুরেন? ইয়ানে হিয়ানে গিয়া খালি ছোপ মাইরা পালাইয়া যাওন। বাপরে, সোজা মানুষ না, একবারে পানখ হাপের মিজাজ!'

মেয়েটির মুখনাড়া কথার ভঙ্গিতে এবার বেপারিও জোরে হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার লগে কথায় পারুম না সুন্দরী। তুমি বাকসিদ্ধা বাইদানি।'

আবিদ বেপারির এই সহজ পরাজয়ে বেউলা বেশ পুলকিত হয়েছে বলেই মনে হল। সে ঠোঁট টিপে আবার একটু হেসে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আর বুঝি তর সইতাছে না লখাই মহাজনের, তাড়াতাড়ি খালি মরণের ঢেউ বুকে লাগাইবার মন চায়!'

কথা শুনে আবিদ হেসে মেয়েটির একটি হাত ধরল। হাত সরিয়ে না-নিয়েই বেউলা সুন্দরী বলল, 'হুনেন লখিন্দর মহাজন, আগে কন দেনমোহর কত দিবাইন?'

আবিদ বেপারি খুশি হয়ে বলল, 'হুদা দেনমোহর কেরে, তুমি চাইলে কাবিন পর্যন্ত লেইখ্যা দিমু সুন্দরী!'

বলেই দু'বাহু দিয়ে বেউলাকে জড়িয়ে ধরল বেপারি। এবং বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে মাথা নুইয়ে তার কণ্ঠার হাড়ে গভীরভাবে সশব্দে চুম্বন করল। বেপারির এই আকস্মিক ব্যবহারে মেয়েটি একটুও অবাক হল না। বরং ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বেপারির মাথাটা একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'কেমুন কাবিন, মেঘনার পানিত লেখা ঢেউয়ের কাবিন নিহি? না মহাজন, আমি কাবিন চাই না, আমারে দেনমোহরের টেহাডা হাতে দেন আগে, পরে গতর হাতাইবেন।'

কথা শেষ করেই বেউলা সুন্দরী বেশ ভদ্রভাবে কিন্তু সবলে আবিদের বাহুর বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আবিদ উপলব্ধি করল, এই ছিপছিপে গড়নের কালো মেয়েটির দেহে এক যুবাপুরুষের জোর লুকিয়ে আছে।

আবিদ সতর্ক হয়ে তাকাল বেউলার দিকে। তার গতর থেকে শাড়িটা লুটিয়ে পড়েছে মাজার উপর। খুঁতহীন ছোটো কটোরার মতো বুক দুটিকে মনে হচ্ছে গর্ভবতী গাঙশুশুকীর শরীরের উপরভাগের নিটোল দুটি স্তনের মতোই স্ফীত, পরিপূর্ণ।

আবিদ বেপারি নিজের কোমরে হাত দিয়ে প্রথম খুতির উপর বাঁধা গামছাটা খুলে দড়িতে ঝুলানো মলিন শাড়িগুলোর উপর রেখে, পরে খুতিটা বের করল। খুতির মুখ ফসকা গিঁরোতে শক্তভাবে বাঁধা থাকলেও বেপারি কায়দা করে একটানে খুলে ফেলল। হাত দিয়ে বের করে আনল তাড়া-বাঁধা নোট। সব দশ টাকার। গুনে গুনে পাঁচটা নোট আলাদা করে, তাসের মতো ছড়িয়ে সে বেউলার দিকে মেলে ধরল, 'লও সুন্দরী, তোমার দেনমোহর পঞ্চাশ টেহাই দিলাম।' বেউলা বেপারির অন্য হাতে ধরা আরেক তাড়া নোটের ভাঁজের দিকে আড়চোখে এক ঝলক তাকিয়ে হেসে সামনের তাসের মতো ছড়ানো দশ টাকার পাঁচটা

নোট ধরল। হেসে বলল, 'মেঘনাপাড়ের হাট-বাজারে দালালিরও বেইশ পইসা আছে দেখতাছি!'

আবিদ কোনো কথা না-বলে বাকি টাকাটা খুতিতে ভরে মুখটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর তা কোমরে না রেখে গামছাটা যেখানে রেখেছিল সেখানেই খুতিটা রাখল। মেয়েটিও বেপারির খুতি রাখার মধ্যে একটা পূর্বপ্রস্তুতির আভাস পেয়ে তার হাতে ধরা পাঁচটা দশ টাকার নোট দ্রুত ভাঁজ করে পেছনের সাপের ঝুড়ির ডালাটা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে পলক ফেলতে না-ফেলতেই ডালাটা আবার চাপিয়ে দিল। তবুও ডালা স্পর্শ করামাত্রই ভেতরে সাপের ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেল আবিদ বেপারি। জিগ্যেস করল, 'কী হাপ?'

'পানোখী। মাইনসে কালনাগিনী কয়।'

বলে সোজা বেপারির মুখের দিকে তাকাল বেউলা। জর্দা দিয়ে কড়া পান খেয়ে বেপারির কপাল ঘামছে। ঠোঁট দুটি একটু কালচে লাল। বেউলাকে তার দিকে তাকাতে দেখে বেপারি জানতে চাইল, 'তুমি হাপ নাচাও?'

'না। আমি হাপ পালি, আর মানুষ নাচাই।'

কথাটা বলেই বেউলা হেসে হাঁটুর ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে দেহের চারদিকে হাত ঘুরিয়ে শাড়ির প্যাঁচ খুলতে লাগল। এখন বেউলার বুক দুটি আবিদের মুখের কাছে ফলের মতো নুয়ে পড়েছে। সদ্য চেরাই করা জামকাঠের গন্ধের মতো একটা গন্ধ মেয়েটির শরীর থেকে আবিদ বেপারির নাকে এসে লাগল। বেপারি ঘাড় উঁচু করে একটি ফলের উপর আলতোভাবে তার জর্দাতাপিত ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল। বেউলা শাড়ির প্যাঁচ গুটিয়ে নিয়ে উরতের ফাঁকে রেখে নাভির উপরকার শক্ত গিঁটটা নখ দিয়ে খুঁটে খুলতে চেষ্টা করছে। বেপারি বলল, 'আমি খুইলা দিমু?'

বেউলা খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বলল, 'বান যে বড় শক্ত লখাই মহাজন, দাঁত দিয়া খুলন লাগব। পারবাইন, খুলতে?'

এ সুযোগ আবিদ বেপারি ছাড়তে চাইল না। সোজাসুজি মুখটা নামিয়ে আনল বেউলার নাভির কাছে। শাড়ির গিঁটে দাঁত বসাবার আগেই ঠোঁট ছোঁয়াল গভীর নাভিমণ্ডলের গর্তের নিম্নভাগে। বেউলা তলপেটে পুরুষের তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে শরীর কুঁচকে বসে যেতে যেতে বেপারির মাথায় হাতের ধাক্কা মারল, 'আরে করেন কী আপনে! আমার ক্যাতকুতি লাগে না?'

'ক্যাতকুতি আছে নিহি মাইয়া লোকের? আচ্ছা দেও বানডাই খুইলা দেই। আর চুমা দিমু না।'

কথাগুলো বলে আবিদ বেপারি অনেকটা গায়ের জোরে, বেউলার উরতে হাতের চাপ দিয়ে তাকে আবার হাঁটুর ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। বেউলার ফের উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কোমরের গিঁটের দু'পাশের শাড়ি সরে গিয়ে তার তলপেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। দুটি ছোট কলাগাছের কাণ্ডের মতো উরুমূল তার যুগল বাহু জ্যামিতির কাঁটার মতো বিস্তার করে থাকায় বেউলার অধোদেশকে একটি সুন্দর তোরণের মতো মনে হতে থাকল আবিদের। আবিদ আবার মুখটা নামিয়ে আনল মেহগনি কাঠের আলো পিছলে

যাওয়া কালো রঙকে হার মানাবে এমন সুন্দর নাভিমণ্ডলের কাছে। চুম্বনের ইচ্ছায় ঠোঁটের মাংস কুঞ্চিত হতে থাকলেও বেপারি গিঁটের একটা কুচকানো অংশে দাঁত চেপে আস্তে টান দিল। প্রথম টানে গিঁটের পাকানো আঁচলটা খুলে গেলে আবিদ বলল, 'দেখলা সুন্দরী, আমি কেমনে আঁট দিঁরো খুলতাম পারি!'

কথা বলার সময় আবিদের চোখ বেউলার মুখের দিকে ছিল না বরং শাড়ির বাঁধন মুক্ত হয়ে পড়ায় তার অধোদেশ সম্পূর্ণ নিরাবরণ থাকায় বেপারি কালো গুল্মময় ত্রিভুজাকৃতি এই ঈষদুষ্চ বদ্বীপের মোহনায় সৌন্দর্য অবলোকন করতে ব্যস্ত। আবিদের মনে হল যেন এক ফণা-মেলা সাপিনী তার ফণাসহ গর্তে ঢুকতে গিয়ে গর্তের মুখ আটকে থমকে আছে।

'নেন, জাগা ছারেন, আমি হুতি।'

বলে বেউলা সুন্দরী বেপারির অভিভূত মুখের উপর তর্জনীর টোকা মারল। বেপারি নাওয়ের মধ্যভাগের দখল ছেড়ে ছৈয়ের কাছে সরে যেতেই বেউলা সুন্দরী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পাটাতনে। তার বুক, পেট আর উরতের মাংসপেশিকে মনে হচ্ছে কোনো পারদর্শী শরীরচর্চাকারিণীর প্রদর্শনরতা একটা অপরূপ কৌশলের মতো।

আবিদ বেপারি লুঙ্গিটা খুলে দড়ির কাপড়ের উপর রেখে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'একটা সিগারেট খাইয়া লমু?'

'আ মরণ। এমুন সময় আবার কেউ সিগ্রেট ধরায়? রাইত আর বেশি নাই মহাজন, জলদি করেন। হুনতাছেন না কিনারের গাঁওয়ে মোরগ ডাকতাছে। পহর ধলা মারলে আমার বহর ছাইড়া যাইব। আইয়েন।'

বেপারির দিকে না ফিরে বরং ছৈয়ের বাঁকা তুঙ্গে ঝোলানো সাপের হাড়ের শাদা মালাটার উপর চোখ রেখে তাড়া দিল বেউলা সুন্দরী।

আবিদ বেপারি গায়ের জামাটা খুলে স্তূপ করে দড়ির উপর রেখে সাপের ঝুড়িগুলোর কাছে যেখানে বেউলা তার কদলীকাণ্ডের মতো নগ্ন উরুযুগল ভাঁজ করে শুয়ে আছে সেখানে গিয়ে বসল। তার সামনে গম্বুজের মতো বেউলার সুডৌল হাঁটুর চূড়া উঁচু হয়ে আছে। আবিদ বেপারি নিজের হাঁটুর ওপর নিজেও একটু উঁচু হয়ে উঠল। তার মাথা সাপের সাজানো ঝুড়িগুলোর সমান হলে সে দেখল বেউলা চোখ মুদে গম্ভীর, থমথমেভাবে শুয়ে আছে। আর তার বুকের উপরে গোল আতাফলের মাঝে বসা দুটি ভ্রমরের মতো স্তনের বোঁটা সদাজাগ্রত কালো আঁখিতারার মতো স্থিরভাবে বেপারির উলঙ্গ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে স্তম্ভিত, অভিভূত।

কোমল স্পর্শে বেপারি বেউলার গম্বুজের মতো হাঁটুতে হাত রাখলে মেয়েটি অতি ধীরে তার ভারি উরুযুগলের একটি ফাঁক করে দিল। যুগলের বামস্তম্ভ জঙ্ঘার একপাশে আস্তে নেমে গেলে বেউলা তার ভাঁজ করা বাম পায়ের ভাঁজ খুলে পাটাতনের উপর নিঃশব্দে স্থাপন করল। বেশ আরামের সাথে রাখল পা'টা। অন্য পা'টাও এভাবেই রাখবে ভেবে বেপারি অপেক্ষা করছে। কিন্তু স্তম্ভটা অনড়। বেপারি তার ডান হাতটা আবার স্তম্ভের চূড়ায় রাখতে গিয়ে বুঝল হাতটা কাঁপছে। ঠিক জালি লাউয়ের মোটা লতার মতো কাঁপছে। বেপারির স্পর্শে বেউলা ঘুমজড়ানো ধানচেরা চোখ দু'টি মেলল।

দৃষ্টিতে গভীর ঘুমের অলসতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি বোঝা গেল না। কালো মাংসল ঠোঁটজোড়ায় কোনো বাসনার কুঞ্চন নেই। বরং কেমন দৃঢ়তার সংবদ্ধ।

বেপারি কাঁপা গলায় বলল, 'পাও সরাও বাইদানী।'

বেপারির 'বাইদানী' সম্বোধনে বেউলার চাপা ঠোঁটের ওপর হাসির একটু মৃদু ঝিলিক খেলে গেল। সে অনুমান করল তার মহাজনের অবস্থা কাহিল। বেউলা তার ডান উরু একটু ডান দিকে হেলিয়ে প্রসারিত করতে লাগল। তবে তা পাটাতনের উপর না বিছিয়ে অকস্মাৎ তুলে দিল বেপারির বিস্তৃত কাঁধের উপর। পায়ের পাতা কাঁধ অতিক্রম করে গিয়ে সাপের ঝুড়ির ডালায় ঠেকল। বেপারি বেউলার এই উদার সম্প্রসারণে কৃতার্থ হয়ে তার ডান হাঁটুর পাশে ঠোঁট ঘসতে লাগল। দরদর করে ঘাম ঝরছে আবিদের পেশিবহুল পিঠ আর বুকের পশম ভিজিয়ে। তার কোমরে মোটা ঘুনসির তাগাটা ভিজে আঁট হয়ে আছে। বেপারির নগ্নতাও এখন শিল্পিত পাথরের মতো সুন্দর আর ঋজু। যেন যাদুঘরে রাখা পালযুগের কোনো অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ধরাচূড়া ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

ওদিকে আবিদের অলক্ষে তার পিঠের উপর রাখা বেউলার ডান পায়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ পায়ের পাতা ও আঙুল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ রাজহাঁসের চঞ্চুর মতো ঠোকর মেরে সাপের ঝুঁড়ির ডালাটা ফেলে দিল। আর চোখের নিমেষে একটা অকথ্য ফোঁসফোঁসানি তুলে ঝুড়ির অধিবাসিনী কালনাগিনী দ্রুত হিল হিল করে বেউলার পা বেয়ে নেমে এসে আবিদের ডান বাহুতে ছোবল হানল। বাহুর উপর সাপের মুখের ভেজা শীতল স্পর্শে ঘাড় ফিরিয়েই বেপারির চোখের তারা ভয়ে স্থির হয়ে গেল। সাপটা বেউলার উরতের উপর থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে আবিদের দুচোখের মধ্যিখানে ফণা তুলে একটু একটু ডানে বাঁয়ে দুলছে। আর মুখ থেকে কালো সুতোর মতো সরু জিভটা দ্রুত পিছলে পিছলে আসা-যাওয়া করছে। বুঝি নড়লেই আবার ছোবল হানবে। বেউলা একদৃষ্টে সাপটার দিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় করে চিৎকার করে উঠল, 'খাইছে মহাজন, আপনেরে কালে খাইছে। সব্বোনাশ অইছে— এই হাপের যে দাঁত তোলা অয় নাই গো!'

তার চিৎকার আর উরতের কাঁপুনিতে সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে আবিদের দুচোখের মাঝখানে, নাসিকার গোড়ায় সজোরে ছোবল মারল। বেপারির দুচোখের পাতা থর থর করে কয়েকবার কেঁপে শেষে স্থির বিস্ফারিত হয়ে রইল। তারপর অজ্ঞান দেহটা উপুড় হয়ে পড়ল বেউলার বুকের উপর। এমনভাবে পড়ল, দেখলে মনে হবে কোনো রমণরত পুরুষ তার অংশভাগিনীকে মধুরতর পুলকের মাঝে আলোড়িত করতে করতে দাঁত দিয়ে বক্ষবর্তুল মর্দন করছে।

আবিদের জ্ঞানহীন দেহটা বুকের উপর দুহাতে জড়িয়ে ধরে খিলখিল হেসে উঠল বেউলা সুন্দরী। তার বাহুর উপর থেকে ফণা মেলে রাখা কালনাগিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার লখিন্দরের কাম অইয়া গেছে লো লেংটা বাইদানি, অখন তর ফোঁস ফোঁস থামা।'

বলেই আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল বেউলা। মুখমণ্ডল উঁচু করে আবিদ বেপারির কপালের নিচে নাসিকার গোড়ায় যেখানে সাপটা ছোবল বসিয়েছিল, সেখানে

দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন করল। পরে বেপারির দেহটাকে কায়দা করে বুকের উপর থেকে ঠেলে পাশে চিৎ করে শুইয়ে দিল ঠিক একটা বাচ্চা ছেলেকে শুইয়ে দেয়ার মতো। বেপারির ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। তার ধীরগতি নিশ্বাসের দুলুনিতে পেশল বুক আর নেতিয়ে পড়া পেট পরস্পরের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত ওঠাপড়া করছে। শিশ্নটিকে মনে হচ্ছে হাত ফসকে বেরিয়ে পড়া টাকি মাছের মতো লম্বমান।

বেউলা সুন্দরী উঠে বসে নগ্ন জঙ্ঘাপ্রান্তে দুহাত রেখে আড়মোড়া ভাঙল। লুটিয়েপড়া কেশরাশি খোঁপা করে বাঁধল। কিন্তু শাড়ি পরল না। সাপটাকে তখনও ফণা ধরে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে কালনাগিনীর ঘাড়টা খপ করে ধরল।

'দাঁত নাই বাইদানীর আবার ফোঁসফোঁসানি কত! লো নেংটা বাইদানী, তুই আমার লখিন্দররে করলি কী? দিমু মাথা ছেইচা!'

সাপটাকে কপট তিরস্কার করতে করতে কোমর উঁচু করে বেউলা উঠল। কালনাগিনী তখন বেউলার হাতে লতার মতো ঝুলছে। সাপটা যাতে দেহ মুচড়াতে না পারে সেজন্য অপর হাতে তার কোমরটা ধরে ফেলল বেউলা। শেষে তুলে এনে ঝুড়ির ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ডালা চাপিয়ে দিল। তার হাতের নড়াচড়ায় কোনো তাড়াহুড়া আছে বলে মনে হল না। বরং ধীরেসুস্থে ছৈয়ের বেড়ায় কাপড় ঝোলানোর দড়িটার কাছে বসে বেপারির গামছা দিয়ে মুখটা মুছল। টাকার খুতিটা খুঁজে বের করে তা সাপের ঝুড়ির ডালার ভেতরে গোল করে গুঁজে দিল। এবারও সাপটা ফোঁসফোঁসানির শব্দে তার ক্রোধ ব্যক্ত করছে।

টাকার খুঁতিটা সামলানো হয়ে গেলে বেউলা গামছাটা দিয়ে বেপারির জ্ঞানহীন দেহের নগ্নতা ঢেকে বেশ সাহসের সাথে তাকে পাঁজাকোলে তুলে দিয়ে নৌকার গলুইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। আবিদ বেপারির ভারি দেহের ভারে বেউলার মতো শক্তিস্বরূপিণীও একটু বাঁকা হয়ে আছে। নদীর উপর জোর বাতাস আর অনর্গল ঢেউ থাকায় আবিদ বেপারির জেলেনৌকার হালকা গলুইটা মাছের মতো লাফাচ্ছে। বেউলা নাওয়ের দাপানিতে পানিতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটা সুযোগের অপেক্ষায় নৌকার কিনারার কাঠে পা রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আবিদ বেপারির ভারি দেহের ভার তার হাতে আর সইছিল না। শেষে ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যেই সে জেলেনৌকার গলুইয়ে পা রেখে চিরঅভ্যস্তের মতো উঠে গেল। আর জেলেনৌকার দুটো তক্তার উপর বেপারিকে শুইয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে নদীর পানি তুলে বেপারির চোখে একটা ঝাপটা মেরে দ্রুত ফিরে এল নিজের নৌকায়। তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লগির বাঁধন খুলে নাও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল বেদেবহরটার দিকে। যেন মেঘনার ললাটের উপর থেকে এক অতিকায় কালো চক্ষু স্বইচ্ছায় তার সহোদরা লোচনকে ত্যাগ করে ভেসে যাচ্ছে। আর ঢেউয়ের উপর আটকে রাখা দোদুল্যমান পরিত্যক্ত নয়নটি এক নগ্ন গঙ্গামূর্তির চাতুরী দেখে অথৈ ঢেউয়ের উপর ছল ছল করে কাঁদতে লাগল।

শওকত আলী

কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ

বাতাস উঠলে এখন টাঙনের পানিতে কাঁপন লাগে না। পানি এখন অনেক নিচে। বালি কেটে কেটে ভারি ধীরে স্রোতে এখন শীতের টাঙন বয়ে যায়। পানির তলায় বালি চিকমিক করে, কোথাও কোথাও সবুজ গুল্ম স্রোতের ভেতরে ভাটির দিকে মাথা রেখে এপাশ-ওপাশ ফেরে। চতুর দু-একটা মাছ তিরতির করে উজানে ছুটে গেলেও আবার ভাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু কাঁপে না পানির স্রোত। এমনকি সাঁকোর উপর দিয়ে চিনি-কলের ভারী আখ-বওয়া ট্রাকগুলো যাবার সময়ও না। সাঁকোর থামগুলো গুমগুম শব্দ করে ওঠে, কিন্তু পানির স্রোত তেমনি ধীরে, তেমনি শান্ত। আসমান কান্দর আর দিগন্ত জুড়ে যে শীতের একটা শান্তভাব থাকবার কথা সেই ভাবটা টাঙনের স্রোতে আজকাল সবসময় ধরা থাকে।

আজ ওই শান্ত নদীর ধারে বসে থাকবার জন্যেই কিনা কে জানে কপিলদাস ভারি আরামে রোদের দিকে পিঠ মেলে দিয়ে ঝিমোতে পারে। তার চারদিকে নানা শব্দ কিন্তু সেসব তার কানে ঢোকে কিনা বোঝা মুশকিল। ধরো, কীরকম গাঁ গাঁ চিৎকার করতে করতে চিনিকলের ট্রাকগুলো ছুটছে, ফার্মের ভেতরে বিনোদ মিস্তিরি খান-দুই ট্রাকটর ট্রায়ালের জন্য চালু করে রেখেছে— তার ধক ধক ধক ধক শব্দ একটানা সকাল-দুপুর-রাত ধরে ক্রমাগত হয়ে চলেছে, নদীর ওপারে আবার কোথায় এক রাখাল সারাদিন ধরে একটানা বুনো সুর বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে— এ সবই তার কানে ঢুকবার কথা। কিন্তু কপিলদাস চুপচাপ। মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে অল্প-স্বল্প দুলছে, আর সে বসে রয়েছে তো বসেই রয়েছে।

ওদিকে ছাগল ঢুকে যদি সবজিক্ষেত তছনছ করে, কি বিন্দা মাঝির বউ সোনামুখি নগেন হোরোর বোন সিলভির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধায় কিম্বা নদীর ওপারে খোলা কান্দরে খরগোশ তাড়িয়ে নিয়ে আসে কোনো ভিন গাঁয়ের কুকুর এবং সেজন্যে যদি এপারের বাচ্চারা লে লে হৈ হৈ করেও ওঠে— কপিলদাস নড়বে না, হেলবে না, কান পাতবে না— কাউকে একটা কথা জিগ্যেসও করবে না।

আসলে কপিলদাস বুড়োর কাছে সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো বলে মনে হয়, এরকমই হয়ে আসছে দুনিয়ায়। ঝগড়া বল, ঝাঁটি বল, জন্ম বল, মরণ বল— সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো। কত দেখল সে জীবনে। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। রাগ বল, ক্ষোভ বল, আবার হাসিখুশি

মনের ভাব বল, কিম্বা সামনে প্রকাণ্ড কান্দর, কি কান্দরের উপরকার আসমান, আবার তার নিচে টাঙনে স্রোত— সবকিছু, যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যা শোনা যাচ্ছে— সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো। আসলে, তার মনে হয়, সংসারের অনেক ভেতরে শান্ত ধীর এবং নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোত আছে। সবকিছুর উপর দিয়ে ওই স্রোত বয়ে যায়। সেখানে কাঁপন নেই, উত্তেজনা নেই, চিৎকার নেই। সবকিছু সেখানে ক্রমাগত একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো।

ঠিক এই ধরনের একটা গা-ছাড়া পরিতৃপ্ত ভাব আজকাল তাকে প্রায়ই পেয়ে বসে। আর সেজন্যেই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ভারি আরামে সে ঝিমোতে পারে। বয়স বেড়ে গেলে সম্ভবত মানুষের এরকম একটা অবস্থা এসে যায়।

তবে সবসময় ওই ভাবটা থাকে না।

মাঝে মাঝে ওই রকম ঝিমোতে ঝিমোতে সে হঠাৎ আবার জেগেও ওঠে। তখন নগেন হোরোর বোন সিলভির চিৎকার, মহিন্দরের ছেলের খরগোশ শিকার, কি ম্যানেজার মহাজনের দুর্ব্যবহার— এইসব ঘটনা তার চোখে পড়ে যায় এবং একটু একটু উত্তেজনাও বোধ করে। আর আশ্চর্য লাগে তার। চারদিকে এত কাণ্ড ঘটছে অথচ সে কোনো জায়গাতেই নেই— কোনোকিছুতেই সে জড়াচ্ছে না। ভাবো তো কী কী ! কপিলদাস কি এইরকম ছিল? নিজেকেই জিগ্যেস করে সে, কপিলদাস, এইরকম ছিলি তুই?

আর তখনই পুরনো ঘটনা ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিয়ে আসে চোখের সামনে। পুশনা পরবে কী তুমুল নাচ জুড়েছে দেখ কপিলদাস। তার গলায় বাঁধা মান্দল কী রকম শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়েদের গলায় কেমন শানানো স্বর। কপিলদাস দেখতে দেখতে নিজের যৌবনকালে চলে যায়। একের পর এক ঘটনা মনে পড়তে থাকে তার। আর ওইরকমভাবে স্মৃতি তার সামনে পুরনো পসরা খুলে বসলে সে ভারি সুখে ওইসব পুরনো ঘটনার মধ্যে বিচরণ করে ফেরে।

একবার সেই যে কী হল, মহাজনের ধান খামারবাড়ি থেকেই কিষাণদের হাতে বিলিয়ে দিলি— মনে আছে সে কথা?

আর মানুয়েল পাদ্রিকে টাঙনের পানিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলি? মনে নাই?

চকিতে সে দেখতে পায় বর্ষায় ভরা টাঙরের পানিতে পাদ্রি তলিয়ে গেল। ঘোলাটে পানির মধ্যে কালো জুতোসুদ্ধু তার পা দুখানি উপরে উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল স্পষ্ট করে। একটু পরই মানুয়েল পাদ্রি আবার ভেসে উঠেছিল। আর সে কী গাল! সাঁতরাতে সাঁতরাতে শাসাচ্ছিল, দেখিস তোর বাপকে বলব, দেখব বিচার হয় কিনা।

সেই ছেলেবেলার কথা। হাপন ছিল যখন সে। তোর তীর কীরকম নিখুঁত নিশানায় গিয়ে বিঁধত, কপিলদাস মনে নাই সে কথা?

হাঁ মনে আছে। কপিলদাস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকে শোনায়— সব মনে আছে।

কেন মনে থাকবে না। সান্তালের বাচ্চা না সে? দেখ তো খরগোশের পেছনে কে ছুটছে অমন? শুকদেবের ব্যাটা চতুর মাঝি, নাকি দিবোদাসের ব্যাটা

কপিলদাস? আর ওই দেখ, কপিলদাসের শিকারি কুকুর কীরকম ছুটে যাচ্ছে তীর-খাওয়া শিকারের পেছনে। কপিলদাস মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায় তার কালো রঙের কুকুরটাকে— যেটা তার কিশোরকালের সঙ্গী ছিল সর্বক্ষণ! কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত বাঘে খেল।

কপিলদাসের মনে কুকুরের শোক উথলে ওঠে। টুটিছেঁড়া রক্তাক্ত কুকুরটাকে সে মনের ভেতরে দেখে আর কাঁদে।

একেক সময় আবার হাসেও কপিলদাস। ভারি প্রসন্ন হাসিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একেবারে। কেউ দেখে না, কিন্তু তবু বুড়ো হাসে। আহা কী দিন সেসব। সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা হয় না, কপিলদাসের সদ্য যৌবনের রক্তে তখন ধিমি ধিমি তাত। বড় কষ্ট তখন মনের ভেতরে— কিছুই ভালো লাগে না। ওই সময় নসীপুরের হাটে দেখা হল। কামারহাটির পেছনে, ধাঁই ধাঁই শব্দে লাল লোহার উপরে হাতুড়ি পড়ছে আর পাশে ভাঁটের ঝাড়— সেখানে ভাঁট ফুলের বুনো গন্ধ, সন্ধ্যারাতের চাঁদ পূর্ব-আকাশে। সাঁওতাল মেয়ের দুবাহু ময়াল সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল গলা। কালো চোখের পানিতে জ্যোৎস্নার আলো চিকচিক করে উঠেছিল। তবু হাসছিল সিনথিয়া। তার হাসি দেখে মন ভরে যাচ্ছিল কপিলদাসের। সেই মন-ভরানো সুখের হাসিও বুকের ভেতর থেকে একেক সময় উঠে আসে।

কপিলদাস একেক দিন আবার নিজের কাছে গল্প ফাঁদে। দূর থেকে দেখা যায় বুড়ো থেকে থেকে মাথা নাড়াচ্ছে আর ঝুঁকে ঝুঁকে দুলছে। কোন গল্পটা আরম্ভ করবে সে? বাহ্ গল্পের কি আর শেষ আছে— নিজেকেই শোনায় বুড়ো। ধরো, মেলার সেই ঘটনাটা—

মেলার গল্পটাই হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়ে যায়। কেন যে বেছে বেছে মেলার গল্পটাই শুরু হয়— সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গল্প আরম্ভ করলেই সে মেলার ঘটনায় চলে আসে।

ছাড়, ছাড়ে দে! বাহুর ভাঁজে চেপে ধরা গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘামের গন্ধ এবং ওইরকম দমবন্ধ হয়ে-আসা আওয়াজ— ভারি কৌতুকের বিষয় হয়ে ওঠে। কপিলদাস ওই অবস্থাতেই মজা পেয়ে হেসে ওঠে এবং গলা চেপে ধরা বাম বাহুর হাতের মুঠো ডান হাতে ধরে একটু জোরে চাপ দেয়। আর ওই রকম চাপ দিতেই লোকটা আ-হ্ শব্দ করে আর্তনাদ করে ওঠে। তার দুচোখে ভয়ানক বিভ্রান্ত ঘোলাটে দৃষ্টি। ওই আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় লোকটার গলাটা বোধ হয় মটাৎ করে ভেঙে গেল। অত বড় শরীর, কিন্তু পা দুখানা কেমন শ্লথ হয়ে মাটি থেকে আলগা হয়ে যায়। আর তাতে উল্টো বিপদ হয়। ওই রকম বিশাল শরীরের পুরো ভারটা এসে পড়ে নিজের উপর। কী মুশকিল, কপিলদাস কী করবে তখন বুঝতে পারে না। লোকটার জোরে জোরে নিশ্বাস নেবার শব্দে ভারি খারাপ লাগতে আরম্ভ করে একসময়। ওদিকে একটা নাগরদোলা লোকসুদ্ধ ভয়ানক বনবন করে ঘুরছে দেখতে পায়। শুনতে পায় কলের গান বাজছে— ফান্দেহ্ পড়িয়া বগা কান্দেহ্ রে-এ-এ-এ— নিজেকে তখন অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। মনে

হয় সে বোধহয় মেলার মাঝখানে নেই। ওই রকম অবস্থায় চারদিকের লোকজন তাকে ছাড়িয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কপিলদাস দূর থেকে পেছনে তাকালে দেখতে পায়, লোকটা মাথা নিচু করে দুহাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

কেন যে ওই রকম মারামারির কাণ্ডটা ঘটেছিল ঠিক মনে করতে পারে না। শুধু লোকটার মুখ মনের ভেতরে দেখতে পায়। লোকটার নাম কী, বাড়ি কোথায়, কোন প্রসঙ্গে ওইরকম ঘটনা ঘটে গিয়েছিল কিছু মনে আসে না।

কিম্বা ওই ধানকাটার ব্যাপারটাই ধরো-না কেন। আধিয়ার জোতদারের মাঝখানে পড়ে গেল সাঁওতাল বস্তিটা। গুপীনাথ হুঁ হুঁ করে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। ওদিকে কে একজন আগুনের কুণ্ডলির উপরে আরেক বোঝা নাড়া চাপিয়ে দিয়ে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর ওই আগুনের আলোয় গুপীনাথের কপাল চকচক করতে লাগল। কিন্তু সে শাদা চুলভর্তি মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

কপিলদাসের ঘাড়ের কাছে শীতের বাতাস শিরশির করে এসে লাগছিল। আগুন দেখতে পেলে শীতের কামড়টা বোধহয় বেশি লাগে। নইলে হঠাৎ ওই সময়ই-বা কেন কানের কাছ দিয়ে, ঘাড়ের কাছ দিয়ে, শিরশির শিরশির করে শীত তার শরীরে ঢুকে ক্রমাগত ছড়িয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু বুড়োর কাণ্ডখানা দেখ, হুঁ হুঁ করে না। বলে দেয় না, ডাইনে যেতে হবে, না বাঁয়ে। একদিকে জোতদার মহাজন আর অন্যদিকে আধিয়ার কিষাণ। ওদিকে আবার কুয়াশার নিচে পাকা ধান শুয়ে আছে যুবতী মেয়ের মতো। কুন দিক যাবে মানুষ— হাঁ মড়ক, কহে দে, কুন দিক যাবে।

কিন্তু গুপীনাথ সাড়া দেয় না— যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্বাস নিচ্ছে কিনা বোঝা দায়।

সাঁওতালদের তখন কী মুশকিল ভাবো দেখি। মহাজন বসত করবার জায়গা দেয়, আবাদের জমি দেয়, গিরস্তির কাজ দেয়— সেই মহাজনের বিপক্ষে কেমন করে যায়। মহাজন যে সব দেয়। হাঁ, সব দেয়— কিন্তুক পেটের ভাতটা কি সারা বছর দেয়, আঁ? কহ মড়ল, কহে দে, দেয় পেটের ভাতটা? এই রকমের সব বাদানুবাদ। কিন্তুক যদি ভিটেমাটি থেকে তুলে দেয় তাহলে? এই রকমের সব তর্কাতকি। ওদিকে গুপীনাথ কিছুই বলে না। মোড়ল হলে বোধহয় ওই অবস্থায় কিছু বলা যায় না।

কিন্তুক তখন ভারী জাড় হে মড়ল। দেহ দলদল করে কাঁপছে। দূরে দূরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল— হামরা মাহাজনের সঙ্গে নাই, আধিয়ার কিষাণের সঙ্গে হামরা।

কে বলেছিল কথাটা? মনে নেই এখন। সে নিজে হতে পারে, মোহন কিন্তু হতে পারে— কিম্বা চতুর মাঝিও হতে পারে। লোকটা যে কে ঠিক মনে নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক মনে আছে।

তারপর?

কপিলদাস আর খেই ধরতে পারে না। বিচারসভার শেষদৃশ্যটা স্মরণে আসে না। বরং হঠাৎ ধানকাটার দৃশ্যটা মনের ভেতর দেখতে পায় সে। কপিলদাস মাঠে

নেমেছে, পাশের ক্ষেতে মোহন কিস্কুর বউ টুরি— সারা কান্দরে আর একটা মানুষ দেখা যায় না। ধানগাছের নোয়ানো পাতায়, শিষের গায়ে, তখনও রাতের হিম ফোঁটায় ফোঁটায় জমে আছে। রোদের তাপ গায়ে লাগে কি লাগে না এমনি কুয়াশা।

হঠাৎ পাশে অস্ফুট আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল সে। দেখল, টুরি মাঝিন হাতের কাচিয়া ফেলে তার বিশাল পেট দুহাতে চেপে ধরে বসে পড়েছে। কপিলদাস চিৎকার করে লোকজন ডাকাডাকি করল। কাছাকাছি একটি মানুষ নাই হে তখন— ভালো তো কী বিপদ। সে নিজে এগিয়ে গেলে সে কী গালাগাল টুরির। ওই গালাগাল শুনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হল। আর ওই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল টুরি একটু পরই উঠে দাঁড়াচ্ছে। মেয়েটা তারপর টলমল পায়ে হেঁটে হেঁটে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

পুরুষ মানুষ আসলে নিষ্কর্মা। কপিলদাস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকেই শুধোয়, বলো নিষ্কর্মা নয়? জন্মের সময়টাতে তার করবার কিছু নেই। সে শুধু বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকতে পারে।

ওই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে টুরির কাতরানি শুনেছিল। মেয়েমানুষের ওই চাপা অথচ মর্মভেদী আর্তনাদের সঙ্গে বোধহয় আর কিছুর তুলনা হয় না। ওহ্ সে কী কষ্টকর ওইরকম আর্তনাদ শোনা। তার একটু পরই সদ্যোজাত বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে তার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে খুশি জেগে উঠেছিল। ছুটে গিয়েছিল তখন ঝোপটার দিকে। হ্যাঁ, ঝোপটাকে সে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায়। বাঁশঝাড় ছিল, একটা নাটার গাছ ছিল। আবার কয়েকটা আঁশশ্যাওড়ার গাছও দেখা যাচ্ছিল। সেখানে আবার একটা সাপের খোলসও ছিল। আঁশশ্যাওড়ার ডাল থেকে নাটা গাছের কাঁটাভর্তি ডাল পর্যন্ত লম্বা করে টানানো। সেই খোলসটার উপর আবার রোদ এসে পড়েছিল তখন। আর ওইসব দেখতে দেখতে, হ্যাঁ ভারি মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে, মাথা উঁচু করে সে তাকিয়েছিল।

ভারি আশ্চর্য সেই দৃশ্য। সদ্যোজাত শিশুর নাড়ি দাঁত দিয়ে কাটছে মা। বাচ্চাটা থেকে থেকেই চিৎকার করে উঠছিল। সদ্যোজাত বাচ্চার কান্না কিন্তু অদ্ভুত। অদ্ভুত নয়? কেমন আঁ আঁ করে শরীরের সমস্ত নিশ্বাস বার করে দেয় গলা দিয়ে, তারপর নিশ্বাস নিয়ে হিক্কা তোলার মতো দেহ কাঁপিয়ে দমকে দমকে কাঁদতে থাকে। ওই রকম কান্না শুনেও মা কিন্তু কিছু বলছিল না। কে জানে ওইরকম সময়ে মায়েরা বাচ্চার কান্না শুনতে পায় কি পায় না। হ্যাঁ, মা কিছুই বলছিল না। কোনো সোহাগের কথা মায়ের মুখে ফুটছিল না। তাই দেখে সে মনে মনে কিছুটা উত্তেজনা বোধ করছিল। কিন্তু তখন মা ভয়ানক ব্যস্ত-না? তার তখন বাচ্চার কান্না শোনবার মতো সময় কোথায়? বল, অতদিক তখন নজর দিতে পারে?

হ্যাঁ, দেখছিল সে, মায়ের নিজের শরীর একদিকে, আরেকদিকে সন্তান। নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড় সন্তানের গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছিল তখন। আহা, হাত দুখানি কী শান্ত, কী কোমল— কব্জির ভাঁজটুকু কিম্বা আঙুলের নড়াচড়াটুকু টাঙনের মোলায়েম ঢেউয়ের মতো মনে হচ্ছিল। নিজের অনাবৃত বক্ষদেশ নিয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ

নেই। কপিলদাস এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় দুধে স্ফীত সাঁওতাল মায়ের বুক কীরকম নিঃসঙ্কোচ হতে পারে। বোঁটা দু'টি, বোঁটা দুটির চারপাশে কালো ঘেরটুকু পর্যন্ত ভারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শুধু মায়ের বক্ষদেশ নয়— নিম্নাঙ্গের কাপড়ও কীরকম রক্তাপ্লুত তা-ও সে দেখতে পাচ্ছিল। কালো শরীরে সাদা কাপড় এবং সাদা কাপড়ের উপর আবার ওইরকম ডগডগে লাল রক্ত— সে-ও সবুজ ঘাসের মাঝখানে। সকালবেলার রোদে গোটা দৃশ্য ভয়ানক জ্বলজ্বল করছিল তার চোখের সামনে। তারপর যখন সে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল— আহা— সে যে কীরকম একটা ভাব, সে বলে বোঝাতে পারবে না। বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ, তার নিচে ভেজা মাটির গন্ধ এবং তারো নিচ থেকে যেন নবজাত শিশুর গন্ধ, উঠে আসছিল। আর ওই সময় তার দুহাতের মধ্যে ধরা ওইরকম রক্তাক্ত কোমল একটি লাল ফুল।

বাচ্চাটা লাল মুখ মেলে চিৎকার করে উঠছিল। তার মাড়ি, জিভ, কুঁচকানো নাক, পিটপিটে চোখ দুটি এখনো সে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর হাঁ, হাঁটতে হাঁটতে ওই সময় সে দুহাতে বাচ্চাটাকে দোলাচ্ছিল।

কপিলদাস বুড়ো বসে বসেই হাত দুখানা তুলে শূন্যে দোলাতে আরম্ভ করে।

ওইরকম গল্প বলতে বলতে বেলা ফুরিয়ে যায় একসময়। রোদের তাপ কমে আসে। ঝাপসা চোখ দুটি মেলে সে তখন আসমানের ধূসর রঙ দেখে। এবার নদীর ভাটি থেকে উঠে আসা শঙ্খচিলের ডাকটাও শুনতে পায়। বাতাসে তখন শীতের কামড়। তার দুহাতের আঙুল ছেঁড়া কোটের বোতাম দুটি খুঁজতে থাকে।

আর ওই সময়ই তার চোখে পড়ে যায়। দেখে ক'জন লোক টাঙনের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। লোকগুলোকে সে চিনতে চেষ্টা করে। ওখানে এই সময়ে কারা? অমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা— কে লোকটা? অনেকক্ষণ ধরে লোকটার নড়াচড়ার ভঙ্গি লক্ষ করে। লক্ষ করতে করতেই মনে পড়ে— ক'দিন আগেও বোধহয় ওদের এইভাবেই দেখেছে সে। ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন বলাবলি করছিল। সে একসময় চিনতে পারে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা লোকটা ম্যানেজার মহাজন ছাড়া আর অন্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু এমন সময় ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কী কাজ? একবার মনে হয় জরিপ হচ্ছে বোধ হয়। একেক সময় ওইরকম জমিজমার মাপামাপি চলে। ওরা কি জমিজমা মাপতে এসেছে? কই এরকম কোনো খবর তো তার কানে আসেনি।

একটু পর আর দেখা যায় না কাউকে। দেখতে না পাওয়ায় কৌতূহলটা আর থাকে না। কপিলদাস তখন গরুর পালের ঘরে ফেরা ঘুন্টির আওয়াজ কান পেতে শোনে। ফার্মের গরুগুলোর গলায় নতুন ঘুন্টি বাঁধা হয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল বোধহয় জয়হরির ছোট ছেলেটা ফার্মের গরু চরায়। জয়হরির কী যেন হয়েছিল? জয়হরির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সে। আর ঠিক ওই সময় কাছে এসে দাঁড়ায় সলিমউদ্দিন। এসেই ডাকে, বুঢ়া দাদা, বাড়িতে যাবো নাই?

হ্যাঁ যামু, সে জয়হরির কথা স্মরণ করতে না পেরে সলিমউদ্দিনের দিকে মনোযোগ দেয়। ছোঁড়া কোত্থেকে আসছে সেই কথা জিগ্যেস করতে করতে উঠে দাঁড়ায়।

সলিমউদ্দিন তখন কুশিয়ার ক্ষেতে আজ কী কাণ্ডটা ঘটেছে সেই ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করে। এবং ওই আরম্ভের মুখেই সে জানিয়ে দেয়— বুঢ়া দাদা তুমার বস্তিটা আর এইঠে থাকবে নাই, ইবছর এইঠে ধানের আবাদ হবে। কথাটা কেন যে বলে ছোঁড়া বুড়ো ঠিক ধরতে পারে না। কিম্বা এমনও হতে পারে যে তার বর্ণনাতেই বোধহয় প্রসঙ্গটা থাকে না। সিলভি আজ বিন্দা মাঝির বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। কীভাবে, সেই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে বর্ণনা করে। তারপর হঠাৎ বিন্দা মাঝি এসে গেলে কী হল সেই পরিস্থিতিটাও সে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কপিলদাস হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ায় আরেকবার। সিলভির বাপের কথা স্মরণ করে ফিরেও এসেছিল। শেষে কী যে হয়ে গেল লোকটার? কবিরাজের হাট থেকে ফিরছিল সেবার— হ্যাঁ, এইরকম জায়গাতেই বোধ হয় ঘটেছিল ব্যাপারটা। সে মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে। বর্ষাকালের ব্যাপার, মাটিতে ফাটল ধরেছিল— ওদিকে টাঙন তখন পাগল। মাটি ধসে পড়েছিল হঠাৎ। তখন সন্ধ্যা, শিবনাথ বোষ্টম পুলের উপর দাঁড়িয়ে তখন গান গাইছিল। ঠিক ওই সময়ে ঘটনাটা ঘটে। কপিলদাস পুরনো কালের এইসব খুঁটিনাটি ঘটনার কথা ভাবতে শুরু করে দেয়।

ওদিকে কিন্তু কানের কাছে গুনগুন করে সলিমউদ্দিন বলেই চলেছে— সিলভি তারপর কী কহিল জানিস বুঢ়া দাদা। বিন্দা মাঝিক কহিল, তুই ম্যানেজার মাহাজনের কুকুর। কুকুর কহা কি ঠিক— তুই কহ বুঢ়া দাদা?

কুকুর বলেছে? কপিলদাস আবার দাঁড়িয়ে যায়। হরগোবিনের মেয়ে, নগেন হোরোর বোন, সিলভি, কুকুর বলেছে। অ, সলিমউদ্দিনের দিকে তার চিন্তা ফিরে আসে, কুকুর কহে দিলে, ক্যানে?

আহ্ হা। সলিমউদ্দিনকে আবার পুরনো কথার খেই ধরতে হয়। বলে, আরে ওই যে কহিনু বিন্দা মাঝি ম্যানেজার মাহাজনের ঘরের ভিতর থে বাহার হয়ে আসিল আর আসে ধমকালে, মারিবা চাহিল।

ম্যানেজার মহাজনের সঙ্গে কি তখন বিন্দা ছিল? একটু আগে অস্পষ্ট দেখা লোকজনের মধ্যে বিন্দা মাঝি ছিল কিনা সেই কথাটা স্মরণ করতে চাইল বুড়ো।

সলিমউদ্দিনের বর্ণনা তখনো ফুরোয়নি। বলর, সিলভির কী তেজ, বাপ, মায়ামানুষ না ডাইন— এক্কেবারে দাও উঠালে মারবার তানে!

কপিলদাসকে এবার মনোযোগী হতে হয়— কী কহিল? দাও উঠালে মারবার তানে— কা'ক মারবার তানে?

বিন্দা মাঝিক বাহে, বিন্দা মাঝিক।

অ, কপিলদাস মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। হরগোবিনের মেয়ে সিলভিকে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায়। খুঁটি উপড়ে গিয়ে ও মেয়ে ছাগলের পালটাকে যখন আলের উপর দিয়ে হৈ হৈ হুস হুস করে তাড়াতে থাকে আর ছুটতে থাকে তখন তার শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখ। যদি পুরুষমানুষ হও তো নজর ফেরাতে পারবে না। সিনথিয়া ছিল ওইরকম। কপিলদাস মুর্মু নজর ফেরাতে পারত না। দেখ, ওইরকম মেয়ে সিলভি, সে-ই কিনা দা তুলে তেড়ে গিয়েছে বিন্দা মাঝির দিকে! কী হইল, তারপর কী হইল?

প্রশ্নটা মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, কিন্তু কৌতূহলটা আর থাকে না। দূরে দেখতে পায় ম্যানেজার মহাজন সম্ভবত আবার এসে দাঁড়িয়েছে উঁচু পাড়ের উপর। বস্তির দিকে হাত তুলে তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। আর ঠিক ওই সময় দেখ বাচ্চারা আবার শিকার করে ফিরছে— ওই সামনেরটি বোধহয় তার নাতি। তার কুকুরটাকে স্পষ্ট চেনা যায়।

সলিমউদ্দিন তখনো সিলভির প্রসঙ্গ পালটায় না। কী কী সব বলতেই থাকে। সিলভির ভাই নগেন হোরোর নাম করে। কেন যে-খেই ধরা মুশকিল। নাকি সলিমউদ্দিন সিলভির সঙ্গে ইদিক-সেদিক কিছু একটা করছে? কপিলদাসের হঠাৎ সন্দেহ হয়। তবে সলিমউদ্দিনের খিটখিটে হাড়-সর্বস্ব শুকনো চেহারাটা দেখে আবার মায়াও হয়। কিন্তু সান্তাল মেয়ের তো শুধু পুরুষমানুষ হলে চলে না। তার মরদ পুরুষ দরকার। সে ফস করে জিগ্যেস করে, হাঁ বাহে, পচই খাইছি কুনোদিন?

সলিমউদ্দিন বুড়োর কথায় হকচকিয়ে যায়। ওই কীরকম বিদঘুটে প্রশ্ন। জবাব দেয়, না বুঢ়া দাদা, নিশা মোর সহ্য হয় না।

কপিলদাসের হঠাৎ খেয়াল হল লোকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। এখুনি না দেখল! মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উবে গেল অতগুলো মানুষ।

নাকি সে দেখেনি! তার কেবলি মতিভ্রম হতে থাকে। এদিকে সলিমউদ্দিনের সেই খামারবাড়ির ঘটনাটার বর্ণনা তখনো ফুরোয়নি। এখন অবশ্যি সিলভির কথা বলছে না। কিন্তু ম্যানেজার মহাজনের কথাটা বলেই চলেছে। ম্যানেজার মহাজন, বিন্দা মাঝি, বিন্দা মাঝির বউও আবার ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে তার বর্ণনায়।

বিন্দা মাঝির মাউগটা বুঢ়া দাদা— হাঁ, বুঝল নি, এক্কেবারে বেহায়া বাহে। হাসে কেমন, দেখলে তোর শরীর জ্বলে যাবে।

নাও বোঝো! এবার কপিলদাসের হাসি পায়। কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়ল। এরও তাহলে মাথায় দোষ আছে।

কিন্তু ম্যানেজার মাহাজন কী কহিল শুনব? কহিল, আর নহে, তুমার বস্তিটা ইবার উঠায় দিবে, দু-চার দিনের ভিতর এইঠে টাকটর চলিবে।

কপিলদাস দাঁড়িয়ে পড়ে কথাটা কানে ঢুকতেই। দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, আঁ, কী কহিল?

সলিমউদ্দিন কথাটা আবার বলে। বিন্দা মাঝির বউ সোনামুখী ম্যানেজার মহাজনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ঝগড়া হল আর তারপরই ম্যানেজার মহাজন কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। কথাটা কীভাবে বলেছিল সেইটাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে চেষ্টা করে।

সলিমউদ্দিনের কথা শুনতে শুনতে সে চারদিকের অন্ধকারের দিকে নজর ফেরায়। শীতকালের অন্ধকার ভারি দ্রুত নামছে। নদীর ওপারে কান্দরের দিকে রাখালের ডাকাডাকি শব্দ মিইয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। ধোঁয়া ধোঁয়া মলিন কুয়াশা কালো হয়ে ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে নেমে এসে একেবারে ঢেকে দিয়েছে ক্ষেত, গোহাল, মানুষ এবং বস্তিতে। চারদিকের ছড়ানো মানুষ এখন কাছাকাছি হচ্ছে, ঘরে

ফিরছে সবাই। মানুষের যত কথা সব এখন একে একে উঠোনে উঠোনে গিয়ে জড়ো হচ্ছে! এখন কিছুক্ষণ আগুনের কুণ্ডলির চারপাশে কথাগুলো বিনবিন স্বরে ঘোরাঘুরি করবে। তারপর সেটাও যাবে চুপ হয়ে। মানুষেরা তখন যার য়ার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। অন্ধকার আর শীত কী রকম অদ্ভুত জিনিস দেখ, মানুষকে তাড়িয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। অন্ধকার দেখে মন ভয় পায় আর শীত দেখে শরীর! কাণ্ডটা দেখ!

অন্ধকারের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটুখানি দার্শনিক ভাবনা এসে যায় বুড়োর মনে। সলিমুদ্দিনের কথা প্রায় ভুলে যায় ওই সময়। অত যে খুঁটিনাটি বর্ণনা তার কিছুই কানে ঢোকে না। বিন্দা মাঝির বউ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকেছিল সেই দুপুরবেলা, সবাই যখন কুশিয়ার ক্ষেতে। তারপর কুশিয়ার ওজনের সময় বিকেলবেলা সবাই যখন খামারবাড়ি এল, তখন দুজনকে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। ওই সময় হেসে হেসে মস্করা করে কী যেন বলছিল বিন্দা মাঝির বউ, ম্যানেজারও তখন খুশি ছিল, সিলভির দিকে তাকিয়ে সে-ও সম্ভবত কিছু বলছিল। ওদের ওইরকম কাণ্ড দেখেই কিনা কে জানে, তীব্র চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে উঠেছিল সিলভি। ম্যানেজার মহাজন ওই গালাগাল শুনে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এসেছিল। উঠোনের মাঝখানে ওজনের কাঁটা পোঁতা ছিল। নবীন বর্মণ আর আকালু পরামাণিক কুশিয়ার মাপতে শুরু করে দিয়েছে তখন। বিন্দা মাঝিও কেন যে কথাটা বলতে গেল ওইসময়। তার নেশা ছিল তখনও। সে সিলভিকে ছিনাল বলে গাল দিয়ে উঠল। আর ওইতে বিপদ হয়ে গেল। সিলভি কুশিয়ার-কাটা দা নিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল বিন্দা মাঝির দিকে। সিলভি অবশ্যি কিছু করতে পারেনি। তাই নাকি পারে। অত লোকজন চারদিকে। ওই কাণ্ডটা ঘটে যাবার পরে ম্যানেজার মহাজনের কী রাগ— এই মারে তো এই মারে! শেষে, মানে রাগটাগ যা দেখাবার দেখানো হয়ে গেলে, তার আসল কথাটা জানিয়ে দিল সবাইকে।

সলিমউদ্দিন সম্ভবত যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। কপিলদাস কিছুক্ষণ শুনেও ঠিক ধরতে পারে না কথাটা। তার কেবলি তখন মনে হচ্ছে ম্যানেজার মহাজন এই সন্ধেবেলা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালই-বা কেন, আর কেনই-বা ওইভাবে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। বিন্দা মাঝির বউ ম্যানেজারের সঙ্গে মস্করা করে কথা বলছিল— এইটুকু শুধু তার মনের মধ্যে ধরা পড়ছিল। দৃশ্যটা সে মনের মধ্যে দেখতেও পাচ্ছিল। ওইসঙ্গে থেকে থেকে আবার সিলভির সঙ্গে সলিমউদ্দিনের ফষ্টি-নষ্টির কথা, অন্ধকারের কথা, ঠাণ্ডার কথা সব একসঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল। এমনকি টুরির সদ্যোজাত বাচ্চাটাকে দুহাতে দোলাচ্ছিল পর্যন্ত সে মনে মনে। হ্যাঁ, তারপর কী যেন? সে হঠাৎ শুধোল; হাঁ কী কহছিল ম্যানেজার মাহাজনের কথা, টাকটর কুনঠে চলিবে?

এত কথার পর এই প্রশ্ন। সলিমউদ্দিন রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়। বলে, না বুঢ়া দাদা তোরঠে কুনো কথা কহা যায় না, কুনো কথা তোর ফম থাকে না।

সলিমউদ্দিনকে ক্ষুব্ধ হতে দেখে কপিলদাস বুড়ো ছোঁড়ার ঘাড়ে হাত রাখে। কী কপাল ছেলেটার দেখ, এই বয়সে মা-বাপ-ভাই-বোন চৌদ্দগুষ্টি খেয়ে বসে আছে।

একটা চাকরি ছিল ফার্মে, ম্যানেজারের বউয়ের হুকুমে সেটিও গেছে। ছেলেটার রোগা দুর্বল শরীরে হাত রাখলে তার একেক সময় মায়া হয়। এখনো তাই হল, বেচারা! সেই কখন থেকে ঘটনাটা বলে যাচ্ছে। কপিলদাস এবারে আন্তরিক আর মনোযোগী হয়। প্রায় মিনতি করে বলে, হাঁ বাপু তারপর কী হইল কহ তো? ম্যানেজার শালা কী কহিল?

আবার কথাটা নতুন করে বলতে হল সলিমউদ্দিনকে। বলল, তুমার বসতটা ইবার উঠায় দিবে, এইঠে ইবছর টাকটর চলিবে।

কপিলদাস এবারও বুঝতে পারে না। তার নিজের হিসাব মেলে না। ট্রাকটর জমিতে চলবে, তাই চলে এসেছে এতকাল। মানুষের বসতের উপর দিয়ে ট্রাকটর চলতে যাবে কেন? ই কেমন কথা? সে অন্ধকারেই ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়। বলে, ঠিক শুনিছিস তুই, কহ ঠিক শুনিছিস?

সলিমউদ্দিন এবার সত্যিই বিরক্ত হয়। বলে, মোর কথা বিশ্বাস না হয় আর কাহাকো পুছে দেখ। মুই ইবার যাঁউ, তুই বুঢ়া মানুষ, তোর কিছু ফম থাকে না।

কথাটা বলেই হঠাৎ ছোঁড়া চলে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস বুড়োর ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু সচল হবার কথাও তার মনে আসছিল না। কথাটা কি ঠিক? কী কাণ্ড বল দেখি, কথা নেই বার্তা নেই, বসতের উপর দিয়ে ট্রাকটর চলবে। কপিলদাস চিৎকার করে ডাকে তখন, সলিমউদ্দিন, এ সলিমউদ্দিন।

তার ডাক সলিমউদ্দিনের কানে পৌঁছোয় কিনা বোঝা যায় না। অন্ধকারের ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। চারদিকে তার মেলানো সংসার। টাঙনের স্রোত, দক্ষিণের কান্দর, মানুষজন, আসমান, ধানক্ষেত এমনকি নিজের সুখ-দুঃখ কি সাফল্য-ব্যর্থতা পর্যন্ত সে আজকাল একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলানো দেখতে পায়। আর সেজন্য নিজের ছোট্ট দুনিয়ায় সে ভারি নিশ্চিন্ত ছিল। কেমন ধারণা হয়েছিল জীবন এরকমই বয়ে যায়। একটুখানি ঝগড়া-বিবাদ, হৈ চৈ, কিছু দুঃখ, খানিক সুখ, জনম-মরণ সব মিলিয়েই জীবন। সে ভেবে নিয়েছিল এইভাবেই দুনিয়া তার নিয়ম পালন করে। কিন্তু সলিমউদ্দিন এ কোন কথা বলল? কথাটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল।

তবে হলে কী হবে, আসলেই সে বুড়ো মানুষ তো! মন একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যায়। কয়েক পা এগোতে না এগোতে উপরের দিকে নজর তুললে আসমানের তারা দেখতে পায় সে, আর তাই দেখতে পেয়ে সে আসমানের শোভা দেখে কিছুক্ষণ। চোখ ঝাপসা, কিন্তু দেখতে পায় ঠিকই— শীতের আসমানে ঝকঝক করছে নীল নীল তারা। তারা কি আসলেই নীল? নাকি তার অমনি হঠাৎ মনে হল। সে ঠিক ধরতে পারে না। একটা তারা তার খুব চেনা মনে হল। ওই তারাটাই না?

ওইরকম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে পুরনো কথার মধ্যে চলে যায়। নরম কোলের উপর ছিল মাথাটা। মুখের উপর সিনথিয়ার স্তনভার। সিনথিয়া সোজা

হয়ে বসায় বুকের আড়াল সরে যায় আর তখন তারাটা চোখে পড়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিল সে। সিনথিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করছিল, চল পালাই।

পালাব, সিনথিয়া মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, না। পষ্ট করে জোরের সঙ্গে বলেছিল, না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস মাথা নাড়ায় আর নিজেকে শোনায়— না, ক্যানে পালাব। তার পা আপনা থেকে বাড়ির পথ ধরে। কোথায় পালাবে সে। এক-সময় আবার হাসি পায় বুড়োর, পালাবার কথাটা এল কোত্থেকে? তুই বুড়া মানুষ হে মড়ল— নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তখন সে বলে, তোর কিছু ফম থাকে না। আর ওই সময় ট্রাকটরের আওয়াজটা তার কানে এসে ধাক্কা মারে। কী কারণে যে হঠাৎ ধকধক শব্দ করে জেগে উঠল ঘুমন্ত ট্রাকটরটা আন্দাজ করা মুশকিল। বিনোদ মিস্ত্রি একেকদিন এইরকম হঠাৎ ট্রাকটরের এঞ্জিন চালিয়ে দেয়। ট্রাকটরটা সে চোখের সামনে দেখতে পায় যেন। বিশাল বিশাল দুই চাকা ঘুরতে ঘুরতে মাঠের বুকের উপর দিয়ে চলেছে। পেছনের ধারাল চাকতিগুলো মাটি ফালা ফালা করে দিচ্ছে, গন্ধ বেরুচ্ছে কাটা মাটির ভেতর থেকে। ওইভাবে ট্রাকটরটা চলে আসে একেবারে দীনেশ কিস্কুর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত। তারপরই বেশ দিব্যি ঘুরে যায়। বসতই হল ট্রাকটর চলাফেরা করার শেষ সীমানা। হ্যাঁ, কলের জিনিস ওই পর্যন্ত আসে। সংসারের সীমানা পর্যন্তই তার আসবার ক্ষমতা, তারপর আর পারে না, এতকাল অন্তর পারেনি। আর এখন সেই কলের জিনিস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে দীনেশ কিস্কুর উঠোনে। ঘরের দেয়ালে ভোঁতা নাক ঢুকিয়ে উল্টোদিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে। দৃশ্যটাকে সে মনের ভেতর দেখতে পায়। আর তাই দেখে সে ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করে। ই কী কথা আঁ? ট্রাকটর চলে আসবে সংসারের বুকের উপর? সংসারে কাচ্চাবাচ্চা, গাইগরু, সব্জিক্ষেত, সুখ-আহ্লাদ— সবকিছুর উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে বেড়াবে— ই কেমন কথা, ম্যানেজার মহাজন ওরকম হুকুম কেমন করে দেয়?

সলিমউদ্দিনের কথাগুলো এবার একের পর এক মনের ভেতর স্পষ্ট হতে থাকে। সিলভির দা নিয়ে বিন্দা মাঝির দিকে তেড়ে যাবার ঘটনা, সোনামুখী আর মহাজনের ঢলাঢলি— ওদিকে নগেন দাস কী একটা চিঠি লিখেছিল-না কোথায়? ব্যাপারটা নিয়ে-না কিছুদিন ধরেই টানাহেঁচড়া চলে আসছে?

কপিলদাস বুড়োর এখন মনে পড়তে থাকে। এই বস্তি উঠে যাবার ব্যাপারটা আকস্মিক নয় একেবারে— তাহলেও, এই কি শেষ পর্যন্ত পরিণতি? বস্তিটস্তি উঠে যাবে আর ট্রাকটর চলতে থাকবে ঘরবাড়ি-ভিটেমাটির উপর দিয়ে। কোথায় একটা মেয়েমানুষের মাথা গরম করে মাতালের দিকে দা উঁচিয়ে তেড়ে যাবার ঘটনা আর কোথায় বাড়িঘর সংসারসুদ্ধু লোপাট করে দেওয়া! কিসের সঙ্গে কিসের জড়ানো। কিন্তু ভাব তো বসতটা কত পুরনো? মনে আছে তোর, হাঁ বাহে মড়লের ব্যাটা, তোর কি ফম আছে?

হাঁ হাঁ ফম আছে। বিচার বসেছিল ফার্মের অফিসঘরে। কে একজন সাহেব মানুষ শুধোচ্ছিল। আর সে উত্তর দিচ্ছিল। কবে কোন প্রাচীনকালে এসেছিল একদল মানুষ। সেই দলের মোড়ল ছিল শিবোনাথ। শিবোনাথ আবার গুণিন ছিল। কিন্তুক গুণিন হলেই কি সব হয়, আঁ? হয় কখনও? হয় না।

ওই পর্যন্ত বলার পর আর বলতে পারেনি সে— মহিন্দর ধমকে উঠেছিল। পরে জানিয়েছিল, তুই আর হামার সঙ্গে আসিস না বাপ— তোর কথার কুনো ঠিক নাই। কুন কথাত তুই কুন কথা কহিস বুঝিস না।

হাঁ মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ— তুই কিছু করিবা পারিস না। ওই দিনই কে যেন বলেছিল কথাটা। কপিলদাস কথাটা নিজেকে শোনাল আরেকবার— তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছু করার নাই। একবার নয়, ঘুরে ঘুরে কথাটা সে বলেই চলল। আর থেকে থেকে ভারি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়টা। আর ওই দীর্ঘশ্বাস তাকে বার্ধক্যের অক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে ঠাণ্ডা পা দুখানি অসাড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের আগুনের কাছে বসে বসে সে হাত-পা সেঁকে কিছুক্ষণ। মহিন্দর আর দীনদাসের ছেলে একসঙ্গে বসে পাথরে ঘষে ঘষে তীরের ফলায় শান দিচ্ছে দেখতে পায়। বোধহয় আগামীকালের আয়োজন। ওদিকে বিন্দা মাঝির মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। কাকে যেন গালাগাল করে চলেছে বুড়ি। বয়স্ক পুরুষদের কাউকে দেখছে না সে— গেল কোথায় সব? কথাটা একবার জিগ্যেসও করে সে। কিন্তু কেউ জবাব দেয় না। মহিন্দরের বউ বিন্নি থালায় করে ভাত দিয়ে যায়। আগুনের তাতে ততক্ষণে আরাম লাগছে কপিলদাসের। ভাতের পাশে একটুকরো পোড়া মাংস দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়। নাতিদের শুধোয় কী শিকার পেয়েছিল তারা। মহিন্দরের ছেলে শিকারের গল্পটা আরম্ভ করে বোধহয়— কিন্তু তার গল্পের দিকে বুড়ো আর মনোযোগ দিতে পারে না। মাড়ি দিয়ে ধরে মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্বাদ এবং গন্ধে আন্দাজ করে নেয় ডাহুকের মাংস চিবোচ্ছে সে। নাতিদের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করে কার কাজ এটা, শিকারে কার হাত ভালো। কিন্তু ওই অনুমানের চেষ্টাও থাকে না একটু পর। বিন্নিকে ডেকে মহিন্দরের খোঁজ করে। কিন্তু উত্তর আসে না। রাগ হবার কথা— কিন্তু রাগে না সে। এসব তার নিত্যিকার অভ্যেসের মধ্যেই পড়ে। বরং সে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। মাংসটা চিবুনো শেষ হলে আরেকবার থালার ভাত নাড়াচাড়া করে। খোঁজে, যদি আরেকটু মাংস পাওয়া যায়, মাংস না-পেয়ে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। শুধু শুধু ভাত মুখে উঠতে চায় না।

দাদা বড় জঙ্গলত্ নাকি বাঘ থাকে?

নাতির প্রশ্ন শুনে একটু সজাগ হতে হয় বুড়োকে। ঠিক মনে করতে পারে না। প্রাণনগরের জঙ্গলে কি বাঘ আছে? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে। তারপর মাথা নাড়ায়, নাই রে— শুকদাস, ওইঠে বাঘটাগ নাই। কিন্তুক ছিল একসময়।

নাতিরা ঘন হয়ে বসে। কপিলদাস ভাত খাওয়ার কথা ভুলে যায় তখন। সে গল্প আরম্ভ করে।

গল্প মানে তো নিজের কথা। সাঁওতাল কিশোর ছেলের যে ব্যাপারে সবচাইতে আকর্ষণ সেটাই সে ধীর স্বরে বর্ণনা করতে থাকে। তার কালো রঙের কুকুরটার কথা আসে। তার ঘরে খুঁজলে তীরের চোঙা দুটো এখনো পাওয়া যাবে— সেই চোঙার ভেতরে বাছা বাছা তীর জমানো থাকত। একবার তীর দিয়ে একটা বাঘ গেঁথে ফেলেছিল। ভাগ্যিস সে তখনো বাঘ কী জিনিস জানত না। বনবিড়াল ভেবে নিশানা করে তীর ছেড়ে দিয়েছে আর অমনি কী ডাক! ভয় পেয়ে পড়িমরি করে কীরকম দৌড়েছিল। সেই ঘটনাটা সে বলে এবং বলবার সময় দৌড়ের বর্ণনাটাই প্রধান হয় উঠতে থাকে। বুড়োমানুষের গুনগুন গুনগুন ধীর স্বরের একঘেয়েমিতে বিরক্তি লাগে বাচ্চাদের। শুকদাস অস্থির হয়ে ডাকে, দাদার বাঘটার কী হইল?

ও, হাঁ, বাঘটা। কপিলদাসকে একটু ভেবে নিতে হয়। তীর খেয়ে বিকট চিৎকার করে উঠবার পর বাঘটার যে কী হয়েছিল কোনোভাবেই মনে পড়তে চায় না। তখন গল্পটা সে বানাতে আরম্ভ করে। তার বর্ণনায় তখন কৌতুক আসে। বাঘের ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবার ব্যাপারটা সে রঙ চড়িয়ে বলতে চায়। কিন্তু বাঘটা টেনে নিয়ে আসবার সময় কী রকম কষ্ট হচ্ছিল সে কথাটাই ঘুরেফিরে বলতে থাকে সে।

শীতের রাত, ততক্ষণে সবারই ঘরে গিয়ে শোবার কথা। কিন্তু কেউ শুতে যাচ্ছে না সেটা সে লক্ষ করে। দেখে, ইতিমধ্যে মহিন্দর, দীনদাস এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো শলাপরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা যে কী, কিছুই অনুমান করা যায় না।

ও হ্যাঁ, বাঘটার যেন কী হয়েছিল? কপিলদাস কিশোর দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাজ ধরে টানবার প্রসঙ্গে ফিরে আসে। ওইরকম যখন টেনে আনছিল তখনো কিন্তু বাঘটা বেঁচে ছিল— হ্যাঁ। ঘা খাওয়া বাঘ কিন্তু ভয়ঙ্কর জিনিস।

এই পর্যন্ত বলে থামতে হয়। ঘা-খাওয়া বাঘের ভয়ঙ্করতা কীভাবে বোঝাবে সেজন্যে তাকে ভাবতে হয়। আর ওই সময় মহিন্দরদের কাছে একটি লোককে আসতে দেখে সে গল্পের কথা ভুলে যায়। উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মহিন্দর আর দীনদাসের কাছে।

ম্যানেজার মহাজনের কথা হচ্ছে তখন সেখানে। ভায়া মাঝি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল, কীরকম ধমক খেয়েছে সেই কথা বর্ণনা করছে সে। বলছে ম্যানেজার মহাজন চিনিকল এলাকা থেকে লোক জোটানোর জন্যে বিন্দা মাঝিকে টাকা দিয়েছে। যাতে গোলমাল না হয় সেজন্যে থানায় পর্যন্ত লোক চলে গিয়েছে।

তাহলে? চাপা, ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কগ্রস্ত স্বর বার হয় সবার মুখ দিয়ে। তাহলে কী হবে এখন। দুশ্চিন্তাটা সবার মনের ওপর ভারি হয়ে ওঠে। কথা সরে না কারো মুখে।

এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে, কিন্তু কথা বলছে না কেউ। কপিলদাস কেমন অস্থির বোধ করে। চারদিকে অন্ধকার, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে আর মানুষ ক'জনা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কী যে কাণ্ড ঘটে সব। কপিলদাসের খারাপ লাগতে আরম্ভ করে। সে উশখুশ করতে থাকে। শেষে একসময় বলেই ফেলে— মাহাজন বসত উঠায় দিবা চাহিলেই কি হোবে, ক্যানে হামার কমরত্ জোর নাই?

উত্তেজনায় কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তাকে থামতে হয়। থেমে অপেক্ষা করতে হয় কথাটার কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে। ওদিকে মানুষ ক'জনা নড়ে না, চড়ে না, আন্দোলিত হয় না। মূর্তির মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কপিলদাসের রাগ হয় তখন। বেশ গলা চড়িয়ে বলতে থাকে আবার— ক্যানে, হামার কমরত্ জোর নাই— আঁ? এ মহিন্দর, হামার কমরত্ জোর নাই? দীনদাস তুই কহ, জোর নাই হামার কমরত্?

মানুষ ক'জনা অন্য কথা ভাবছিল তখন। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া কী রকম ভয়ানক ব্যাপার সেই দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল সবার। কী উপায়ে ম্যানেজার মহাজনকে শান্ত করবে সেই কথা ভাবছিল তারা। আর ঠিক ওই সময়ে কপিলদাসের ওইরকম পাগলামির কথা শুনে কে-একজন রেগে ওঠে। বলে, তুই যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষের ইসবের ভিতর থাকবার দরকার নাই।

কপিলদাস ঠিক করতে পারে না কথাটা কে বলল। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। তবে কথাটা তাকে রাগিয়ে দিল। সে গাল দিয়ে উঠতে চাইল। বলল, ক্যানে বুঢ়া হইলে কি মোর কুনো দাম নাই, আঁ? বুঢ়া হইলে কি মানুষের দাম থাকে না, কহ?

নিজের ছেলে মহিন্দরও বিরক্ত হয়— বলে, তুই এখুন যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষ তুই ইসবের কী বুঝিস!

কপিলদাস বুড়ো এবার সত্যিই দমে যায়। নিজের জন্ম-দেয়া ছেলে যদি এইরকম করে বলে তো সে কী করবে। তাকে পিছিয়ে আসতে হয়। হা মড়ল, তুই তো বুঢ়া মানুষ, তুই কিছু করিবা পারিস না। কথাটা ঘুরেফিরে কেউ যেন তার কানের কাছে বারবার করে বলতে থাকে। সে কিছুই করতে পারে না, তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মানুষের জটলাটা দেখে। ততক্ষণে জায়গাটা বেশ একটুখানি সমাবেশ-মতো হয়ে উঠেছে। দেখে, দীনদাস হাত নেড়ে নেড়ে কী বলে চলেছে। তারপর আবার মহিন্দর আরম্ভ করল। তার কথা শেষ হতে না-হতেই ওদিক থেকে আবার ভায়া মাঝি আরম্ভ করে দেয়।

ভারি ধীর নোয়ানো স্বর। শান্তভাবে পরামর্শ হচ্ছে যেন। রাগ নেই। জ্বালা নেই। কারো দুচোখ ধকধক করে জ্বলে উঠছে না, কেউ চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে না। কপিলদাসের ভারি অবাক লাগে গোটা ব্যাপারটা দেখে। অবাক লাগে, কিন্তু কিছু বলে না সে। বরং নিজেকে সরিয়ে আনে। কয়েক পা পিছিয়ে আসে সে। কিন্তু ওই কয়েক পা সরে আসতে অনেকটা সময় লেগে যায় তার। কানের কাছে তখনও সে শুনছে— তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছুই করার নাই। যেখান থেকে উঠে এসেছিল সেইখানে সে ফিরে যায়। শুধুই যথাস্থানে ফিরে যাওয়া, শুধুই মেনে নেওয়া— তার কেবলই মনে হতে থাকে।

বাচ্চারা লোকসমাগম দেখেই সম্ভবত উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। মেয়ে-বউরা এখানে-সেখানে ইতস্তত দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা একত্র হলে যা হয়— ততক্ষণে খুনসুটি, দাপাদাপি এবং হাসাহাসি এইসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পাথরের উপর

ঘষে ঘষে তীরে শান দেওয়া তখনো হচ্ছে। মহিন্দরের ছেলে ডাকল, দাদা তারপর বাঘটার কী হইল?

ও, সেই গল্প। কপিলদাসের মনে পড়ে একটু আগে শিকারের গল্প বলতে বলতে সে উঠে গিয়েছিল। তখন আগুনের আল্ কিশোর মুখের ওপর চমকাচ্ছে, কে-একজন কঞ্চি দিয়ে আগুনটা আরেকটুখানি উসকে দিল। আর ওই ঘটনার কারণেই কিনা কে জানে, কপিলদাস গল্পটা আবার আরম্ভ করে দিল। হ্যাঁ, বাঘটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে আসছিল সে। ভারি ওজন হয় বাঘের। আর বাঘটা ওদিকে তখনও কিন্তু মরেনি। নাহ্, বাঘটা বোধহয় মরেই গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে।

কপিলদাস সৎ হয়ে উঠতে চায় বাচ্চাদের কাছে। গল্প বানানো বাদ দেয়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে তখন। বাঘটার গায়ে বিকট গন্ধ ছিল, তীরটা ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে গেঁথেছিল, একেবারে এদিক থেকে ওদিক বেরিয়ে গিয়েছিল। রক্ত তখনও বেরুচ্ছিল গলগল করে। আর ওই সময়, বিকেলবেলায়, প্রাণনগরের জঙ্গলের ধারে একটা লোক ছিল না চারদিকে কোথাও। সে চিৎকার করে বাবাকে ডাকছিল, বন্ধুদের ডাকছিল। আর ঠিক তখন হঠাৎ তার পাশের ঝোপ থেকে কী-একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে বেরিয়েই বাঁয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। ওই জানোয়ারটা দেখেই সে—

এ পর্যন্ত বলেই সে থামে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে ইতস্তত করে। আহা কেমন করে বলবে যে শেয়াল দেখে সে ভয়ানক ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।

তারপর, তারপর কী হইল? বাচ্চারা সমস্বরে জিগ্যেস করলে সে হঠাৎ হেসে ওঠে। হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, কিসের বাঘ, চেৎ বাঘ? উতো গিধর কানা। শেয়াল, নেহাতই শেয়াল। বাচ্চারাও হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। সম্ভবত কপিলদাসের বলবার ভঙ্গিতে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। বাচ্চারা মহাউৎসাহে কথা বলতে আরম্ভ করে, তুই বাজপাখি মারিছিস দাদা, বাজপাখি? ভালুক মারিছিস তুই, এ দাদা, হরিয়াল মারিস নাই, হরিয়াল? সম্মিলিত উপর্যুপরি প্রশ্ন হতে থাকে। আর কপিলদাসেরও যে কী হয় সে-ও ভারি হালকা হয়ে ওঠে— মজার মজার কথা বেরুতে থাকে তার মুখ দিয়ে। আরে তুই কে রে— তুই না ভায়া মাঝির ব্যাটা। হাঁ, তুই হলা চিলহা, বুঝল। আর তুই? তুই হল বাগদোর, তুই কে জানিস? তোর নাম গক্রম। অহো তুই ওইঠে ক্যানে— তুই তো ভাল্লুক মামা।

ছোট বাচ্চারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কপিলদাস তখন নিজের আলাদা অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। তীরে শান দেবার সময় কীরকম করে পাথরের উপর ঘষতে হয়— তাই দেখায়। একজনের হাত থেকে বাঁশিটা টেনে নিয়ে ফুঁ দেয়, ফুঁ দিয়ে একটা বহু পুরনো সুর বাজায়। কী বাজাল আঁ, কী বাজাল দাদা? প্রশ্ন হলে সে ভাঙা ভাঙা গলায় গানটা গায়—

ফকির বুলে ঢুলুক বাজে
ভালুক নাচে ঝাম,
হাইয়ারে হালমাল কই গেলু রে— এ— এ।

গানটি শুনে বাচ্চারাও গাইতে শুরু করে দেয়।

বুড়োর ভীমরতি হয়েছে ভেবে মেয়েরা কেউ কেউ মনোযোগ দেয় বাচ্চাদের জটলার দিকে। বড়রা যেখানে সভা বসিয়েছিল সেখান থেকেও কে-একজন চিৎকার করে গোলমাল বন্ধ করতে বলে। কিন্তু বাচ্চাদের থামাবে কে? মহিন্দরের ছেলে ধনুকের জন্যে বাঁশের ছিলা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। কপিলদাস তার হাত থেকে কেড়ে নিল ধনুকটা। বলল, দ্যাখ, কেমন করে ছিলা পরাতে হয় ধনুকে।

বাচ্চারা তখন ঘিরে দাঁড়ায় বুড়োর চারদিকে। কপিলদাস হাঁটু ভেঙে ধনুকের এক মাথা ধরে ঝুলে পড়ে ধনুকটা নোয়ায়। তারপর বাঁ হাতে ছিলার ফাঁসটা ধনুকের মাথায় ঢোকাতে চায়। কিন্তু প্রথমবারেই পারে না। ডান হাতটা তার ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। বাচ্চারা বুড়োর কাণ্ড দেখে সমস্বরে বলে, পারব নাই দাদা— তুই পারব নাই। কিন্তু পারে সে। ওই কাঁপা কাঁপা হাতেই সে ছিলা পরিয়ে দেয় ধনুকের। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলা টেনে ধনুকের একটা টঙ্কার তোলে। ভারি সুন্দর টানটান আওয়াজ হয় তাতে। এরপরও বুড়ো থামে না। একটা শানানো তীর নেয় হাতে এবং তীরটা ধনুকের ছিলায় বসিয়ে তাক করে। সামনের দিকে একবার, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। বুড়ো ভয় দেখিয়ে মস্করা করে যেন। বাচ্চারা তাতে হৈ হৈ করে ওঠে। আর ওইরকম হৈ চৈ শুনেই সম্ভবত কপিলদাস তীরটা দু আঙুলের ফাঁকে চেপে ছিলা ধরে টানে। টেনে ধনুকের নিশানা করে অন্ধকারের দিকে। মহিন্দরের ছেলে বলে ওঠে, দাদা তীরটা ছুটে যাবে, দাদা মোর তীরটা ছুটে যাবে। কিন্তু কপিলদাস নাতির মিনতি শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না। সে সত্যি সত্যি তীরটা ছেড়ে দেয়। আর বাতাস-কাটা শব্দ করে তীরটা অন্ধকারের দিকে ছুটে যায়।

চারদিকে মানুষের বসত। মেয়েরা বুড়োর কাণ্ড লক্ষ করে হাঁ হাঁ করে ওঠে। সভার মানুষদের মধ্য থেকেও কয়েকজন এগিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বুড়ো কপিলদাস আর একটা তীর হাতে তুলে নিয়েছে। সবাই যখন নিষেধ করছে তখন সে দ্বিতীয় তীরটাও সামনের অন্ধকারের দিকে নিশানা করে ছুড়ে দিয়েছে। এবং ওই কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর ছেলেমানুষি তামাসার পর্যায়ে থাকে না। দূর থেকে মহিন্দর চিৎকার করে ওঠে, বিন্নি গালাগাল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুড়ো তখন হাসছে কেমন দেখ, যেন সে কিশোরকালে ফিরে গিয়েছে। জীবনে প্রথম নিশানা ভেদ করার যে খুশি— সেই খুশি পেয়ে বসেছে তাকে। সে শান-দেয়া আরো একখানা তীর হাতে তুলে নিয়েছে তখন। ওদিকে পেছন থেকে দীনদাস চিৎকার করে বলছে— ধর বুঢ়াটাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখানা— সেই চিৎকার বুড়োর কানে আদৌ পৌছায় না। কেউ পেছনে তাকে ধরতে আসছে কিনা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কপিলদাস বুড়ো দুহাতে তীরধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে। বিমূঢ় মানুষজনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অন্ধকার, গাছপালা, কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়। আর সেখান থেকে সে তার তৃতীয় তীরটা সঠিক নিশানায় ছুড়বার জন্যে তৈরি হতে থাকে।

হাসান আজিজুল হক

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেলগাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ির টিনের চাল হিম ঝকঝক করে। একসময় কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দুপাশের বনবাদাড় আর ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ঈশান কোণ থেকে ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার— ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জের রাস্তার উপর উঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামরে মুমূর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মতো ছায়া পড়ে শিয়ালটারও, চাঁদের দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে, তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ির লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মতো হল্লা করে রাস্তায় পড়ে, কোনদিকি গেল শালার শিয়েল, কোনদিকি ক দিনি।

আরো হিম নামে।

বড় পুলের উপর থেকে নিচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় সরদারদের ছোট তরফের বড় ছেলে ইনাম। পানির রুপোলি মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক-মুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শিরশির, খড়মড় উড়ে যায় বাদাম খোলা। খাদের আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে আলো ছলকে ওঠে, কাঁঠালগাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনি বেজে ওঠে ঝনঝন।

ইনাম পুল ছেড়ে ধুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে শঙ্খচূড়ের মতো দেখায় যে ধবল পথ, এখন তা ত্রস্ত হয়ে এল, ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল, তার পেছনে সুহাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে জন্যে এখানে এখন এত রাতে সে সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। কখন সুহাস ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মতো পুরী খেয়েছিল আর অঢেল মিষ্টি সেই গল্প। ট্রানজিস্টারটা বেজেই যাচ্ছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ শুনছিল না, কণিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠাণ্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। বিনিয়ে বিনিয়ে। আর আশ্চর্য, একটা পাখিও ডাকছিল না। রেডিওডা বন্দ করে দে— ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। আইছিস— দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনে।

সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায় কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এল। ইনামের আবার অসহ্য লাগল। রেডিওডা বন্দ করে দে— বলল সে। কেউ শোনপে না, শোনলেও এদিকি আসবেনানে কেউ, ফেকু বলল। সেজন্যি বলতেছি না, খারাপ লাগতিছে গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেরি করলি ঘুমোয়ে পড়বেনে আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টারটা সুহাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে সুহাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োটা, আবার কেডা! সন্ধে হলি ঘুমিয়ে পড়বে বুড়ো— থু করে থুথু ফেলে বলে ফেকু।

যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু— ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল। ঝপ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদের পুকুরে আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁদের বাড়িতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উনুনের আগুন দপ করে জ্বলে উঠলে খাঁদের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্যে ঝলসে উঠল। ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল? সুহাস জিগ্যেস করে। না— ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক! চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে! সুহাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টারটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেঢপ বুটজুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই রুখু গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকেলের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়িতে লোকে বালি আনছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্কুলবাড়ি, বড় সজনেগাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ— হুড়মুড় করে হেড মাস্টার... শালার জোকার একডা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভাঙা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এইসব মনে পড়ল। ঝর ঝর করে ছবিগুলো এল; যেন দক্ষিণ বাতাসে নিমের হলুদ শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে আর ন্যাংটো ছেলেটা দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হয় সুহাস সেই গল্পটা আরও তোড়জোড় করে বলছে, ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাই-এর আগুনটা দেখাল ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছি মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগির মতো চোখ, নিচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কালো ঠোঁট। খাবি নাহি? ফেকু জিগ্যেস করে। সুহাস গল্প থামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাই-এর কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর একটা জ্বালায় তারপর আবার গল্প শুরু করে, লঞ্চে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে— অন্ধকারের মধ্যি গেলাম— দুপাশে গেরাম না কী কিডা জানে— মনে হচ্ছিল সোন্দরবন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙগল বুজিচো? ইনামের মনে হল সুহাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত বলবে। নাপিত বিটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য

লাগলে এই কথা ভাবল ইনাম। সুহাসের গল্পে একশোটা পল্লব— ছোটমামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ছোটমামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ি থেকে সিল্কের পাঞ্জাবি ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি— কিচ্ছু বাদ দিচ্ছিল না সে— তাই ইনাম খেপে গিয়ে বলল, তোর ছোটমামা বিয়ে করতি গিলো ক্যানো ক তো? সুহাস কান দিল না; সকালে সূর্য উঠতি মধুমতী ঝকঝক করতিছে, জ্যাঠামশাই ধপ করে কাদায় পড়িলো লঞ্চ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না। তোর মামার বাড়িটা কোয়ানে, মামার শালীরা বেড়াতি আসলি কস আমাকে— ফেকু কথা না-বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো— চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করে ছোটমামার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতি যাচ্ছ? বুজিচি, ওখেনে, তো পয়সাকড়ি লাগে না; আরামেই আছো দেহা যায়— ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন চুপ করে গেছে। একটা মুরগির শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়তো বসুবাবুদের ইটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়ো বাড়ির ভেঙে-পড়া সিঁড়িঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের টুকরো পাওয়া যাবে। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন কাজেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না— তা পিদিমটা ছাড়া আর কেউ জানে না। কী ঠাণ্ডারে বাবা— বউ অ বউ, আর একটা খ্যাঁতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে, ছেলেটা বকছে বিড়বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো কেডা জানে! বুড়ি আর একবার চেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে। ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টারের চাবিটা ঘট করে খুলেই বন্ধ করে, ইনাম মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর পা ঠুকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলিপথটায় ঢোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার আর সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কী একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, জঘন্য একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তারপর শান্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা, আজকাল এত বেশি ধরা পড়তিছি ক্যানো কতি পারিস? এই কথায় সুহাসের চোখ দুটি চকচক করছে কৌতূহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক? ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না-রেখেই সে বলে, অত মার খাস কী করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা এক চড় মারলি চোহে অন্ধকার দেহি। মার খাওয়াডা শিখতি অয় বুজিচো বাপধনু— ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্যি ইস্কুলি যাতি অয় যেমন, তেমনি— ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ্য লাগে, ইস্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা— ইনাম এমন কথা বলে যা মুদ্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইস্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মানুষের পহেটের কাছে যাতি নেই— পহেটথে ট্যাহা বারোয়ে থাকলিও না। টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেন্ডু

ড্রাইভারের কথা শুনে একবার ভিড়ে হাত দিয়েছিল বঁটিমুখো এক ভদ্রলোকের পকেটে। কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ উঠল যে মনে হল কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও বলে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা। কিন্তু আসলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নারকেল চুরি করে বিক্রি করলে হয়; কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড়ো কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার উপর বাঁদিকের লতা ডানদিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্পের ঝোঁকে ফেকু সুহাসের উপর এসে পড়ে আর সুহাস চিৎকার করে, উরে, মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস রেডিওডা ফালাস না। ...সেদিন কী হল ক দিনি, এক বাস লোক— বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্পিডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবির পহেটথে নোটগুলো বারোয়ে আছে— হাত দিতি খপ্ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মারে, ভাগাড়ে যেন গরু পড়িছে। কপালের ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে — ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিম্ভূত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস থু-থু ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে— বলেই চাবি বন্ধ করে এবং 'তুমি যে আমার জীবনে এসেছ' ধরে দেয়। ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে— ক্ষীণ চিৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না, ইনামের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। নড়েচড়ে গরম হতিছ শালা— ফেকু মন্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হল, কে কে নষ্ট করল আর পকেট মারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, সাফল্য আর পিটুনি খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। করবটা কী কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয়—। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ— ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি— ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়োয়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি— কী কলাডা করবানে?

পাখিদের কোনো গান নেই এখন। শব্দ যা শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল তার। সুহাস ফেকু ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টার, ফেকু মাফলার মুখের উপর জড়িয়ে নিল, ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ি, মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করে, পরিচয় জিগ্যেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয়, পালমশাই; তাদের বাড়ির পলেস্তরা-খসা দেয়াল, কারণ বাড়িটা আসলে সেনদের। ওরা চলে গেছে পঞ্চাশে। বাতাবিলেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াৎ করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজায় ফাঁক দিয়ে ঘুম-জড়ানো গোঙানি ভেসে আসে। সব ঘুমোয়ে পড়িছে— সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁৎ করে। আজ না আসলিই হত— সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি

ছ্যামরা, দুধু খাবা! সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে। বাড়ির মধ্যি ঢোহার সময় মুখডা দেহিছিস? দেহিছি— তুই থো, তাচ্ছিল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দেহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হত— ইনাম ভাবল। তখুনি সুহাস ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এট্টু এট্টু সর হইছে এমন ভাবের মতো লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক? তোরেও খুন করতি পারলি হত— ইনাম আবার ভাবল।

ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। দু পা এগিয়ে বাড়ির ভেতরে ডাক্তারবাবু বসে আছেন— মোটা শাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জ্বলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল। পুকুরের বাঁধাঘাটে একটিমাত্র শুকনো পাতা তখন ফরফর পাক দিতে থাকল। বাঁদিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা দুধের মতো চাঁদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের উপর পড়েছে। পেছনের জামগাছটা কালো, তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরও নির্জনতা, পোড়োজমি, জঙ্গল, পানের বরজ, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর আর বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছুই ফলেনি সেখানে। ইনাম পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকি ফিরে যেতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলো আসছে কাঠের রড লাগানো জানলা দিয়ে। মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখে ঝিলিক। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজপাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি ঝোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে সুহাসকে, সুহাস ট্রানজিস্টারটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে ঠোঁট চেপে আছে, কিছুতেই এগুচ্ছে না। ইনাম চট করে সামনে এসে ফেকুর কাছে টাকা চায়, দুডো ট্যাহা দে— কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? মুহূর্তে সোনালি হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল লাগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুডো ট্যাহা দে, কাল দেবানে সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোডে দুডো ট্যাহাই আছে আমার কাছে— ফেকুর মুলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তাহলি সুহাস দে— দে সুহাস কচ্ছি, কাল দিয়ে দেবানে, ঠিক কচ্ছি, দে সুহাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে— ছটফট করে ইনাম। সুহাস বলে ফেকুকে, কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুড়ি গুড়ি আসতিছিল দেহিছিস? উরে তুই কি ইস্টুপিট— সে হাসে, মাইরি কচ্ছি, পহেটে হাত দিয়ে দ্যাখ— দুডো ট্যাহা আছে মোডে, দাদার পহেটথে মারিছি, মাত্তর দুডো ট্যাহা। তখন ইনাম ক্ষান্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর সুহাস গলাগলি দাঁড়িয়ে। জানলার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োমানুষ চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো— অ্যাঁ? লাল আলোটা সরে যায় জানালা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন

নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙ্গির নিচে শুকনো দুটো পা। গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো। তোমরা? ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। তা কে আর আসছে এখানে মরতে? জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই— ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমানো যায়— তার একটা বয়েস আছে— অজস্র কথা বলতে থাকে সে, মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একইরকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটার একটা ডাল ঝটকানি দেয়— পায়ের নিচে মাটি ঠাণ্ডা শক্ত আর সেজন্য ইনামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগিগুলো কঁ কঁ করে উঠল। আবার হু-উ-উ চিৎকার এল। বিলে বাতাস উঠছে শোনা গেল। ভাঙা চেয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না। বুড়োর অ্যাজমার কষ্টের নিশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চুপ— ভস ভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরাওঠা আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে জমলে বাতাস যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ইনামের ইচ্ছা হল একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কী খবর? অ্যাঁ? সব ভালো তো? ঘড় ঘড় করে একটানা কথা আরম্ভ হয়। আক্ষেপ বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কী বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপরে? আমার আর কী— ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে তুই বুড়ি— ছানাপোনা নিয়ে বুঝে মরগে।... এই তোমরা একটু-আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজখবর নাও। সময়-অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বার বার চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম! না আসলিই ভালো হত।... তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হত এই জঙ্গুলে জায়গায়— বুড়ো বলছে, বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম— হ্যাঃ। ওসব তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কী ভালোই-না বাসে! এই দ্যাখো না, বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্যে— একটা শ্লেষ্মার দলা শ্বাসনালীটাকে একবারে স্তব্ধ করে দেয়,

তাতে চোখ কপালে তুলে বুড়ো কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাব না, আমরা চা খাব না— চিৎকার করে ওঠে সুহাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না— অ্যাঁ— আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অশথ গাছটার মাথায় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জনির বাজনাও এগিয়ে এল সঙ্গে, খোলের চাঁটি আর কি বিশাখার কথা, কি তমালের কথা— সব এসে আবার দূরে চলে গেল। সুহাসের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড় করে। সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে, দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের উপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মতো হয়। খটাখট নড়ে পায়াগুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে! কবেই-বা শুধতে পারব এইসব টাকা? সুহাস উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে— চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে গেলে আর কোনোদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও— হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়। ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই। মুরগিগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, কথা বলে ওঠে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাড়ে, চুপ, চুপ, মাগি চুপ কর, কুত্তি— এবং সমস্ত চুপ করে যায়। বুড়ো ফিরছে এখন— মাথা নামিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে ফিসফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম তুমি বসো, এখখুনি যাবে কেন? এসো গল্প করি।

বুড়ো গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম... তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না— সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম— আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এল, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ— সুহাস হাসছে হি হি হি— আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এল আর এই কথা বলে গল্প শেষ না-করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ— প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো— এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

১৯৬৬

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

পুনরুদ্ধার

শহর এখান থেকে অনেক দূরে। সেই শহর, শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে যে আমাকে লালন করেছিল, তার দরজা এখন আমার কাছে রুদ্ধ।

আমার আর কোনো উপায় ছিল না। সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ পেলাম না, তাই জীবনকে ভালোবাসি বলে নয়, প্রাণস্পন্দন অবিচ্ছিন্ন রাখা নিয়ম বলেই অবশেষে এই গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা নিলাম। শিক্ষকতা মহান ব্রত এবং সেই পথেই মানুষের কর্তব্য করে যাব এমন বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলাম না কখনো। কিন্তু অজন্মা যদি স্বভাব হয়, নিজের ভূমিতে তখন তৃণও জন্মে না।

এখানে এসে প্রথমে খুব খারাপ লাগত। গ্রাম আমার স্বপ্নে ছিল, কিন্তু এমন করে সেখানে যেতে হবে ভাবিনি। তাই খারাপ লাগত। তবে উঁচু ক্লাসে ভালো পড়াতে সক্ষম এমন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের প্রিয় হবেন না এই স্বাভাবিক। ফলে, কিছুকালের মধ্যেই বুঝে নিলাম, জীবনধারণ যখন বিঘ্নিত নয় তখন বাঁচার চেষ্টা করা যায়। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আর একবার করতে দোষ কী।

অতএব, কিছু একটা করা দরকার। যা মূলধন এই গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র-কতিপয়, এই নিয়েই আমার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কী করে? কী করি এদের নিয়ে? তাদের অন্তর্নিহিত সাহিত্য-প্রতিভা আবিষ্করণার্থে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ করা যেত। কিন্তু হায়! সে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। খেলাধুলায় উৎসাহ দিয়ে তাদের সকলকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় করে তুলতে পারি, আমার স্কুলকে জেলার মধ্যে পরিচিত করানোর একটা চেষ্টা নেয়াও অসম্ভব নয় কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে আমার বিস্ময়কর অনভিজ্ঞতা চিরকালব্যাপী। কী করি তাহলে?

স্কুলের ছুটির পরে আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে শস্যহীন পোড়ো জমির মাপ নিতে নিতে হঠাৎ একদিন মনে হল কিছু করার আছে। এই অন্ধকার গ্রামে, নিবাত পরিবেশে, প্রায়-নিরন্ন কৃষককুলের সমাবেশে এখনো কি কিছু অবশিষ্ট নেই? মনে হল, আছে।

খেলাধুলাই প্রকৃষ্ট পথ। ক্রিকেট, ফুটবল, ভলি নয়, এই সমস্ত খেলাধুলায় যে কিছু করা যাবে না তা জানা। বরং এদের নিজস্ব কোনো খেলা, যার উৎকর্ষ কোনো বিলিতি বইয়ের শাসনে হয় না, সেইরকম কোনো খেলার মধ্যে দিয়ে বোধহয় এদের সঙ্গে মেলা যায়।

হাডুডুকেই আমি বেছে নিলাম। দেখলাম, উক্ত গ্রাম্য ক্রীড়ায় সকলের উৎসাহ ও পারদর্শিতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সম-পরিমাণ।

অতএব, স্কুলছুটির শেষে এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে আমি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম। ছাত্রদের ডেকে নিয়ে বললাম, দেখ স্কুলের তো বেশি টাকা-পয়সা নেই, ভালো খেলার সাজ-সরঞ্জাম, ভালো গেম-মাস্টার এসব আমাদের বরাতে জুটবে না। অথচ কিছু খেলতে তো হবে। হাডুডু খেলবে তোমরা?

ছাত্রকুল প্রথমে বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কেননা, রুক্ষ জমিতে কিংবা পিচ্ছিল ঘাসের জাজিমে এ খেলায় তারা বড়োই পারদর্শী। তা ছাড়া আমি আসলে কী চাই তা-ও তারা জানত না।

আমি তখন বুঝিয়ে বললাম, না, অবসরমতো হাডুডু খেলার কথা ভাবছি না আমি। আমরা স্কুল থেকে হাডুডু দল গড়ব, যদি সেক্রেটারি আপত্তি করেন আমরা না-হয় গ্রামের নামেই দল গড়ব। আমরা নিয়মিত অভ্যাস করব। নিয়মিত চর্চার মধ্য দিয়ে এই খেলার সমস্ত কৌশল আয়ত্ত করব, তারপর বেরিয়ে পড়ব। আমরা পাশের গ্রামকে হাডুডু খেলায় হারিয়ে দেব, মহাকুমা শহরে যাব হাডুডু খেলতে, সেখান থেকে কাপ জিতে আনব। তারপর জেলাশহরে গিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শিল্ড নিয়ে আসব। এক্সিবিশন ম্যাচ খেলব সব বড়ো বড়ো শহরে।

এইখানে আমি একটু দম নিলাম। কারণ এর পরেই আমায় বলতে হত, আন্তঃজেলা, আন্তঃপ্রাদেশিক, জাতীয় ও শেষে অলিম্পিক হাডুডু প্রতিযোগিতায় আমাদের বিজয়ের কথা। হায়, তা কখনো হবে না। তাই দম নিয়ে আশায় বুক ভরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী তোমরা খেলবে তো?

সবাই পরম উৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং উৎসাহে করলব করে ওঠে, হ্যাঁ স্যার খেলব, খেলব।

পরদিন থেকে ছাত্ররা নিয়মিত হাডুডু খেলতে আরম্ভ করে দিল। বয়স, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট ও সিনিয়র তিনটি দল গড়লাম। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যারা জুনিয়র তারা এসে জয়পতাকা নেবে কালক্রমে ইন্টারমিডিয়েট ও সিনিয়রদের হাত থেকে। এমনি করেই আমাদের জয়যাত্রা আজীবন অপ্রতিহত থাকবে।

নিজে আশৈশব শহরে লালিত। সেই শহর যে এখন আমায় এক রাত্রির আশ্রয়ও দেবে না, সেই শহর আমায় হাডুডু খেলা না-শেখালেও কী করে খেলানো যায় শিখিয়েছিল। তাই গাঁয়ের নামকরা হাডুডু খেলোয়াড়কে কোচ নিযুক্ত করলাম, সে একসময় খুব বড়ো এক হাডুডু-কম্পিটিশনে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে একটি নতুন চাঁদমার্কা হ্যারিকেন পুরস্কার পেয়েছিল। তার এই কৃতিত্বের অংশভাগ সমস্ত গ্রাম। তাই আজও সে আদরের দুলাল। আমি তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম যে, এমন একটি হাডুডু দল গড়তে হবে যার জয়যাত্রা কখনো থামবে না।

পুরোদমে হাডুডু খেলা শুরু হল। বয়সের ভার শরীরে চাপানো। তাই তাদের সঙ্গে হ্যাফপ্যান্ট পরে বা মালকোঁচা মেরে মাঠে নামা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি,

খেলার কোর্টের পাশে টিনের চেয়ার টেনে বসে কে কেমন তৈরি হচ্ছে দেখতে শুরু করলাম। গ্রামবাসী প্রথমে মাস্টারের পাগলামি বলে ক্ষেতের আলে হুঁকো রেখে মাঠে নেমে বলদের লেজ মুচড়ে দেয়, লাঙলের হাতল আরও জোরে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বুঝল এ মাস্টারের পাগলামি নয়। তখন তারা বিকালে ক্ষেতের কাজ শেষ করে খেলার মাঠের চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করল।

ক্রমে ক্রমে গ্রামময় সবাই জানল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তখন তারা সেই অজ্ঞাত সাফল্যের সম্মানে অংশীদার হওয়ার জন্যে নিজেদের তৈরি করতে শুরু করে।

কিছুকাল পরে একদিন খেলা চলার সময়ে দেখলাম, এক কৃষক ধামায় করে কিছু মুড়ি নিয়ে মাঠের ধারে বসে আছে। ভাবলাম, খেলার শেষে সে বুঝি ক্ষুধিত খেলোয়াড়দের কাছে মুড়ি বেচতে চায়। ভেবে বড়ো আনন্দ হল এমনি করে কে জানে হয়তো মাঠের চারপাশে অনেক দোকানপাট বসবে। হয়তো একদিন আসবে যখন খেলার মাঠে ঢুকতে গেলে ভিন্ন গ্রামের লোকের কাছে টিকিট চাইব। নিজেদের গাঁয়ের লোকের যে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না।

সে যাক, সেই লোকটি কিন্তু বিক্রির জন্য মুড়ি আনেনি। তবে তার বউ ভেজে দিয়েছে খেলার শেষে ক্লান্ত আদরের দুলালদের হাতে দু-মুঠো করে দেয়ার জন্যে। সেই দিন থেকে মনে হল আমি যা চাই তা হবে— সমস্ত গ্রাম এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে, আমার চিন্তা কী?

একদিন আমি আমাদের কোচকে পাঠিয়ে দিলাম পাশের গাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। তারা কি হাডুডু প্রতিযোগিতায় উৎসাহী? প্রথমে উপেক্ষা ও পরে বিস্ময়ের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতায় রাজি হয়। একদিন আমার সিনিয়র দল পাশের গাঁয়ের দলকে অক্লেশে হারিয়ে দিয়ে ফিরে এলে সম্মিলিত ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

স্পষ্টতই আমি দেখলাম, পথের রেখা কখনো মোছে না। কিছুই চলে যায় না, কিছুই শেষ হয় না; ধূলিসাৎ কুটিরের মসলা দিয়ে তুমি রাজপ্রাসাদ গড়তে পার।

প্রথম বিজয় পাছে সবাইকে আনন্দে দিশাহারা করে দেয় তাই এই জয়কে কেন্দ্র করে আমোদ-আহ্লাদ আমি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলাম। এমনকি আমি খেলোয়াড় ছাত্রদের একদিন বিশ্রামের আবেদনও নামঞ্জুর করে দিই।

সদ্যলব্ধ এই বিজয় গ্রামবাসীকেও উদ্বেল করে তোলে। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন যে আবার ফুলে উঠতে পারে এ তারা ভাবতে পারত না। কোনোদিন যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যেতে পারে এ চিন্তা তাদের ছিল না। তাই সকলেই এর পর থেকে পরম উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারা সাধ্যের অতিরিক্ত সীমায় পৌঁছে খেলোয়াড়দের জন্যে গাছের একছড়া কলা, একটি বাতাবিলেবু বা পেঁপে ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য স্নেহের আধারে পাঠাতে শুরু করল। আমি তখন দেখলাম, এই উপহার পাঠানোর ব্যাপারটাও নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। কেননা, এই খেলোয়াড়বৃন্দ যারা কালে সভায় বিশেষ স্থান নেবে তাদের সবল হওয়ার প্রয়োজন আছে। এবং নিয়মিত সুখাদ্য অবশ্যই তার সহায়তা করবে।

তাই আমি গ্রামবাসী প্রতি পরিবারের জন্যে উপহার-সামগ্রীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিই। যেমন ফৈজদ্দি তার বাতাবিলেবুর গাছ থেকে মাসে দু'টি করে লেবু নিয়ে আসবে, দীননাথের নারকেলগাছে কয়েকটি নারকেল এখনও আছে অতএব সে নিশ্চয়ই কিছু নাড়ু তৈরি করে দিতে পারবে। সোভানালি ও মন্তাজ এবার কিছু ধান পেয়েছে অতএব তারা কেন কিছু চিঁড়ে বা মুড়ি নিয়ে আসে না? এমনি করে প্রতি পরিবারের দেয় বস্তু মিলিয়ে দেখা গেল মাসের প্রায় দিনই ছেলেরা খেলার শেষে কিছু খাবার পায়।

আমাদের হাডুডু খেলা পুরোদমে চলতে লাগল অতঃপর।

এমনি করে একদিন বর্ষা এসে গেল। সারা আকাশ মুছে দিয়ে বর্ষা এল। কিন্তু আমরা খেলায় ক্ষান্ত দিলাম না। গ্রামবাংলার এই খেলা হাডুডু অকর্ষিত জমির একাংশ জলে-ডোবা ও অপর অংশ কর্দমপূর্ণ হলেও চলে মহোৎসাহে। তাই বর্ষার সময়ও আমরা খেলতাম। কেবল খুব বেশি বৃষ্টি হতে থাকলে বা মাঠে হাঁটুজল জমে গেলে বিমর্ষচিত্তে স্কুলের বারান্দায় বসে থাকতাম। অবশ্য একলা থাকতে হত না কোনোদিনই। আমার নিয়মে খেলা হোক বা না-হোক খেলোয়াড় সবাইকে হাজির থাকতে হত। কেবল জুনিয়র টিম রেহাই পেত এই নিয়ম থেকে।

ঠিক হল শরৎকালে আমরা মহকুমা শহরে যাব খেলতে। তার আগে একটি শক্তিশালী দলকে যদি আমাদের গ্রামে এনে খেলানো যেত তাহলে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হত। কোচকে আমি আবার বললাম কোনো ভালো দলকে আমাদের গ্রামে আনা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে।

কিছুদিন পরে আনন্দে সবাইকে ডুবিয়ে দিয়ে কোচ খবর দিল মহকুমার অন্যতম সেরা হাডুডু দল আমাদের গ্রামে এসে খেলতে রাজি হয়েছে। যদিও তাদের গ্রাম প্রায় বারো মাইল দূরে তবু তারা কষ্টটুকু স্বীকার করবে। তবে দূর থেকে আসবে বলে তাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। গ্রামবাসী সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি রাজি হয়ে গেলাম। সারা গ্রামজুড়ে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। কেননা এই দলকে হারিয়ে দিতে পারলে মহকুমা শহরে আমাদের আসন বাঁধা।

সাধারণত আমার খেলোয়াড়রা বিকেলে দু'ঘণ্টা করে খেলত। কিন্তু একবার আমি ব্যবস্থা করলাম ভোরবেলাও এক ঘণ্টা করে খেলতে হবে। খেলার শেষে ঘরে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে তারা স্কুলে আসবে।

প্রতিযোগিতার আগের দিন বিকেলে শেষ প্রস্তুতিক্রীড়া দেখার জন্যে সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল। স্কুলের সংলগ্ন মাঠের অংশটুকু আমি মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলাম।

খেলার শেষে ভিড় কিছু কমলে আমরা আলোচনা করতে বসলাম কীভাবে প্রতিপক্ষকে অভ্যর্থনা জানানো হবে, কী খাওয়ানো হবে তাদের ইত্যাদি। আমাদের খেলোয়াড় দল একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে খেলার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলাপ করছিল। আমি আমার হাতে তৈরি সাফল্যের স্তম্ভগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। গর্বে-আনন্দে-আশায় আমার বুক ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। সবলদেহী, চকচকে চোখে তারা আমার কথায় নিমেষে বিশ্বজয় করতে পারে বলে আমার মনে হল।

আর ঠিক সেদিন, সেদিনই রাত থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বিকালে আকাশে মেঘ খুব অল্প ছিল। আর সামান্য বৃষ্টিতে হাডুডু খেলা আটকায় না, তাই আমরা প্রফুল্লচিত্তে সকাল সকাল বিছানায় চলে গেছিলাম শক্তির অপচয় রোধ করার জন্যে।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। মনে হল, কিছু আগে বর্ষণ শুরু হয়েছে, খেলার মাঠ এখনও ডোবেনি দেখে আশ্বস্ত হলাম কিন্তু চিন্তাও হল যদি বৃষ্টি দু-এক ঘণ্টার মধ্যে না থামে!

বৃষ্টি থামল না। খেলোয়াড়রা সকালবেলাই ভিজতে ভিজতে স্কুলঘরে এসে হাজির হল। অন্যান্য ছাত্ররাও এল। গ্রামের সবাই টোকা মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে এসে সবকিছু ঠিক আছে কিনা খোঁজ নিয়ে যেতে লাগল। মাঠে জল জমে গেলে মেয়েরা তো দাঁড়াতে পারবে না ভেবে অনেকে আশঙ্কা করে গেল।

বৃষ্টি ক্রমাগত বেড়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। বেলা বারোটার দিকে প্রতিপক্ষের এসে পৌঁছনোর কথা। স্কুলের একটি ঘরে তাদের খাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। দুটো বেজে গেল, তারা এল না। দু'পক্ষের খেলোয়াড় একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবে এই ভেবেছিলাম। কিন্তু দুটোর সময়েও যখন কেউ এল না তখন নিজের খেলোয়াড়দের খাইয়ে দিলাম। নিজে খেলাম না— জানতাম এই বৃষ্টিতে কারো পক্ষে ঘরের বাইরে আসা সম্ভব নয়, তবু আশা।

ব্যবস্থা করা ছিল, প্রতিপক্ষ গ্রামের সীমানায় পৌঁছলেই একদল ছাত্র টিন বাজিয়ে সবাইকে খবর দেবে। আর আমরা তখন এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে আনব। কিন্তু বেলা তিনটের পরে ব্যান্ডপার্টি তাদের সরঞ্জাম ফেলে দিয়ে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরে গেল।

অবিরাম বৃষ্টি পড়ে চলে। ক্রমে সবাই ঘরে ফিরে যায়। বিকেলের আগেই যেন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। কেবল আমি আর আমার খেলোয়াড়ের দল স্কুলঘরে বসে প্রবল বর্ষণের সঙ্গী হই।

চারটের দিকে আমি আমার দলকে তৈরি হতে বললাম— কী জানি যদি বৃষ্টি এক্ষুণি থেমে যায় আর তারা এসে হাজির হয়। খেলোয়াড়েরা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তৈরি। তারা উৎসাহে-আশায়-আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়ে। পরস্পর পরস্পরকে কৃত্রিম আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তৈরি করে নেয়। পায়ের আওয়াজ অশান্ত হয়ে ওঠে।

বাইরে চোখ ফেলে দেখলাম মাঠ ও পথের সীমানা লুপ্ত হয়ে গেছে। চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আসতে চায়। বৃষ্টির আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম জনহীন, শব্দহীন হয়ে যায়।

আমি তখন আমার খেলোয়াড় কয়েকজনকে নিয়ে বারান্দায় এলাম। ক্রোধে, ক্ষোভে তারা যেন উন্মাদ হয়ে উঠতে চায়। চেয়ে দেখলাম তাদের বলিষ্ঠ শরীরের পেশিসমূহ ফুলে ফুলে উঠছে। তাদের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে চলে ক্রমাগত। অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তারা ছিঁড়ে টুকরো করে দিতে চায়। কেন তারা এল না! কী করি তাহলে আমরা এখন! কী করি? তারা ক্রমাগত এই প্রশ্ন করে চলে।

তখন স্থির-বিশ্বাসে জানলাম, এই আমি আশৈশব চেয়েছি। এখন নিশ্চিন্তে হৃত শহর পুনরুদ্ধারে যাত্রা করতে পারি।

রিজিয়া রহমান

ইজ্জত

আকাশের রংটা কেমন অদ্ভুত কালচে। সাদা মেঘে ভরা সিসে রঙের আকাশ। হু হু উথাল-পাতাল হাওয়া। দূরে হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে যুদ্ধরত তালগাছের মাথায় একটা চিল। সিসে রঙের নিষ্ঠুর ঘোলাটে আকাশ। একটানা দমকা বাতাসের দাপটের সঙ্গে তালপাতার শোঁ শোঁ গোঙানি। সেইসঙ্গে থেকে থেকে চিলটার অসহায় চিৎকার। হালিমনের ভয় করছিল। রাগ হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তালগাছের ঝুঁটি চেপে ওই কান্নার মতো শব্দটাকে থামিয়ে দিতে। ইচ্ছে করছিল ধারালো দায়ের কোপে ওই হিংসুটে ঘোলাটে মেঘলা পরদা ছিঁড়ে নীল উজ্জ্বল দিনকে ছিনিয়ে আনতে। সে নয় আকাশের বেঈমানির শাস্তি হল! কিন্তু, নিচে? হু হু করে বাড়ছে গাঙের পানি। বিল-চক পানিতে একাকার। রাঙা রাঙা ঘোলা রাক্কুসে পানির তোড় বিরাট হা নিয়ে গ্রাস করছে। সব ধান-পান তলিয়ে গেছে। ঘরের ভিটি ধুয়ে যাচ্ছে পানিতে। খুঁটি টলমল। কখন যেন হোগলাপাতা ছাওয়া ঘরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবু পানি বাড়ছে আর বাড়ছে। কেবল বেড়ে-ওঠা পানির হিংস্র কলবল খলবল। ছেঁড়া কাপড়ের কানি গায়ে জড়িয়ে হালিমন শিরশির করে কাঁপছে। শীত করছে তার। থেকে থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ঝাপটায় হয়তো শীত করছে। ঘরের দাওয়ার কোনায় মাটির চুলোয় বগবগ করে পানি উঠছে। একপাশের ঝিক গলে পড়েছে পচা ঘায়ের মাংসের মতো। হালিমনের ভাত খাবার সানকিটা ঘরের পৈঠার কাছে একহাঁটু বানের পানিতে ঘুরে ঘুরে ভাসছে। ভাসমান শূন্য সানকিটার দিকে তাকিয়ে হালিমনের শীতে-ধরা শরীরটা কেমন করে উঠল যেন। পেটের মধ্যে অবুঝ মোচড়। সন্তানপ্রসবের অবধারিত বেদনার মতো নিশ্চিত ক্ষুধার তাগিদ। ক্ষুধা! যাকে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করা যায় না। সেই অবুঝ বোধটা নিয়ে একা অসহায় উনিশ বছরের হালিমন কী করবে বুঝে পেল না। ঘোলাটে পানি আর সিসে রঙের আকাশের চেহারা ভুলে হালিমন ভাবল সানকি ভরা ঝরঝরে ফুরফুরে রোদ্রোজ্জ্বল একসানকি ভাতের কথা। সুন্দর সাদারঙের ভাত। সোনারঙের ডাল। আর কী? না, আর কিছু না। একথালা ভাত আর ডাল, এর চাইতে বেশি বড় কিছু বুঝি এই মুহূর্তে হালিমনের স্বপ্নে আসতে পারে না। হালিমন ক্ষুধার্ত। একটানা চারদিন না-খাওয়া। ভেসে যাওয়া খাল-বিল, ডুবে যাওয়া সুপুষ্ট ধানের চারা, ধসে যাওয়া ঘরের ভিটি আর তলিয়ে যাওয়া বাগানের ধারে পড়ো পড়ো কুঁড়েতে

উপবাসী নিঃসহায় হালিমনও বুঝি তলিয়ে যাবার আগে একটা তীব্র চেতনার উপলব্ধি নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে পারে না। তা হল পেটের অবুঝ তাগিদ। ভাত চাই, একথালা ভাত। সেই হালিমন, মিলিটারির হামলায় যার বাপ-মা ভাই-বোন সব মরেছে। কেমন একরকম পাউডার ছিটিয়ে তাদের দো-চালা টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সেই লাল হায়নারা। সতের বছরের হালিমনকে মারেনি। সুপুষ্ট ডাগর-ডোগর হালিমনকে না মেরে তারা ডেকেছিল— ইধার আ না ছোকরি। তু সে তো যেয়াদা ফায়দা উঠানা পড়েগা পহেলে। তাদের মুখের ভাষা বোঝেনি হালিমন। কিন্তু বুঝছিল চোখের ভাষা। ঠোঁটের হাসি। তাতেই বুঝেছিল তার ইজ্জত বিপন্ন। গুলির আঘাতে লুটিয়ে না-পড়ে, মরিয়া হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল হালিমন।

এমন শিকার হাতছাড়া হবার আক্ষেপের চেয়ে এমন ভয়াবহ কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল নেশাসক্ত হামলাদাররা। তারপর ঘোর কাটিয়ে আগুনের উপর কিছু গুলি খরচ করে চলে গিয়েছিল অন্য হানায়। আশ্চর্য! সে গুলি হালিমনের গায়ে লাগেনি। তার চেয়েও আশ্চর্য, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া হালিমন মরেনি।

বর্বর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিক্ষত জ্বলাপোড়া গাঁটা যেমন ধুকছিল, তেমনি শরীরের নিম্নাঙ্গে ঝলসে যাওয়া ক্ষত নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে ছিল হালিমন।

ইজ্জত বাঁচাবার জন্য যে মেয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মেয়ে অবশ্যই সহানুভূতি ও সম্ভ্রমের পাত্রী। অন্তত সেই নৃশংস শত্রুকবলিত দিনে। গ্রামের লোকেই হালিমনকে সেবা-শুশ্রূষা ওষুধ-পত্তর করে সুস্থ করে তুলেছিল। তারপর স্বাধীনতার পরে রিলিফের লোকেরা এসে তাকে গোলপাতা দরমা দিয়ে ঘরও তুলে দিয়েছিল। আত্মীয়-পরিজন হারানো হালিমনের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল শহরের খবর-কাগজের লোকেরা। কিন্তু তারপর? তারপর আর কী! দু'পা পোড়া মেয়ে দরমার ঘরে থেকে লোকের বাড়ি কাজকর্ম করে নিজের খাওয়াটা চালিয়ে নেবার জন্য— কোনো লোক কিন্তু এগিয়ে এল না। আড়ালে-আবডালে সন্দেহের ফিসফাস, 'ও মেয়েকে মিলিটারি ছুঁয়েছে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিল তাই।' হালিমন সে ফিসফাসে অবিচলিত। মনে মনে গর্বই করত সে। নাই-বা হল তার ঘর, নাই-বা জুটল স্বামী। কিন্তু সে তো ইজ্জত খোয়ায়নি। একথা সত্যি, পা পুড়ে একটা পা খাটো হয়ে তার চলার ছন্দে হয়তো বিকৃতি এসেছে, কিন্তু বিকৃতি আসেনি মনে, জীবনে। সে গতর খেটে পেটের ভাত রোজগার করে, গতর বেচে নয়— এ অহঙ্কারী মূলধন ক'টা সহায়-সম্বলহীন মেয়ের আছে? এর জন্য হালিমন নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রমসম্পন্ন মহিলা ভাবতেও কুণ্ঠিত নয়।

সেই তো সেবার কার্তিক মাসে, রিলিফের ঠিকেদারির কাজ করা সেই লোকটা, যে নাকি এখন বাজারখোলার বড় আড়তদার, তাকে কেমন দাবড়ানি দিয়েছিল হালিমন। পোড়াকপালে বাহাত্তুরে মিনসে। ঘরে ঝি-বউ আছে। অথচ মাঝরাতে এসে টোকা দিয়েছিল হালিমনের ঘরের ঝাঁপে। কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নায় বেড়ার ফুটো দিয়ে লোকটাকে দেখে নিয়েছিল হালিমন। সেই জালেম খুনি লোকগুলোর মতো শিকারলোভী নেকড়ে-চেহারা নয়, যেন একটা মুরগিচোর শেয়ালের মতো রাতদুপুরে

জিভের লালা ঝরাচ্ছে। ঘরের কোনা থেকে বড় আঁশবটিটা তুলে এক ঝটকায় ঝাঁপ খুলে ফেলেছিল হালিমন— কই গেলি ছিনালির পুত! আয়। এক্কই কোপে তর কল্লাডা নামাইয়া থুই। আয় হারামি। জন্মের সাধ মিটাইয়া দেই। ঝকঝকে ধারালো বটি হাতে আঁচললুটোনো হালিমনের ভয়ংকর চেহারা দেখে লোকটা ক্রমে পিছু হটতে হটতে পালাবার পথ খুঁজছিল। যেন রাগী কুকুরের তাড়া খেয়ে লেজগুটানো পলায়নপর শেয়ালের মতো দিশেহারা হয়ে গেছে। হি হি করে তীব্র হাসি হেসে উঠেছিল হালিমন। সেই প্রচণ্ড দুঃসাহসিক হাসির ঝাপটায় ঘরের পেছনের গাবগাছ থেকে ডানা ঝটপটিয়ে দুটো বাদুড় উড়ে গিয়েছিল। শিউরে উঠেছিল শীতাচ্ছন্ন মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা।

লোকটা পালিয়েছিল। ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে হালিমন হাসছিল আর বলছিল— অহন পলাছ ক্যান! পলাছ ক্যান রে কুত্তার বাচ্চা। হালিমনের ধারে আবার আইলে এহাবারে কল্লা থুইয়া যাবি কইলাম।

এরপর থেকে মাথার কাছে বটিটা নিয়েই ঘুমোত সে। কথাটা অবশ্য খুব একটা চাপা থাকেনি। গাঁয়ের লোক শুনে বলেছে— উরে, মা রে, ওইডা মাইয়া মানুষ নি। জ্বীনা। হালিমন ঠোঁটে মোচড় দিয়ে হেসেছে। ভেবেছে এতে তার সম্ভ্রম বেড়েছে বই কমেনি।

পেটের মধ্যে আবার তীব্র মোচড়। ঘরের পেছনে আসমত মোল্লার মরিচ পালানের দিক থেকে কেমন একটা ছপছপ শব্দ আসছে। হালিমন উৎকর্ণ হল। বোধহয় আসমতের বিধবা মেয়েটা কোমরপানিতে তলিয়ে যাওয়া পালানের কানাচে কচুর লতি খুঁজছে। হালিমন নিজেও তো ক'দিন পালানের কচুর লতি আর আতাপাতা শাক সেদ্ধ করে কোনো রকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করেছে। গম-কোটা ছাতু পানিতে গুলে খেয়েছে। এখন একদানা খুদ কি একমুঠো গমও সারা ঘরটার কোথাও অবশিষ্ট নেই। শূন্য ছাতাধরা হাঁড়ি-কলসিগুলোতে রাজ্যের পিঁপড়ে-আরশোলা-কুনো ব্যাঙ আশ্রয় নিয়েছে। চাইবেই-বা কার কাছে। বানে ডুবে যাওয়া ক্ষুধার্ত গ্রামটার সবার ঘরেই খুদকুঁড়ো বাড়ন্ত। শাকপাতা সেদ্ধ করে খাবার শুকনো জ্বালানিই-বা কই?

ছপ ছপ শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল হালিমনের ঘরের পাশে। বসে বসেই গলা উঁচাল হালিমন। গরুর জাব-খাওয়া চাড়িতে বসে দু'হাতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে আসমত মোল্লার বারো বছরের ছেলে রমিজ। চাড়ি বেয়ে হালিমনের ঘরের দাওয়ায় এসে নামল রমিজ। একহাতে চাড়িটা ধরে রেখে আর-এক হাতে হালিমনের ঘরের বেড়া ধরল। সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ডুবে থাকা দুর্বল ভেজা ভিটির বেড়া দুলে উঠল। বেড়া ছেড়ে পা ফসকে ঝপ করে পানিতে পড়ল রমিজ। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছেঁড়া গামছা কোমরে জড়ানো রমিজ হেসে উঠল— খাইছে রে বুয়া। তর ঘর তো অহনই পড়ব। আমাগো পুবের ভিটির ঘর তো আইজ বিহানেই মুখঠাসা দিয়ে পড়ছে। বড় ঘরডারে আমি আর বাবায় সুপারিগাছ কাইটা ঠ্যাকনা দিছি। তুই আমাগো বাড়িতে লরে বুয়া।

— বৃষ্টির ঝাপটা-মারা ভেজা বাতাসে হালিমনের শীতবোধ আরো বাড়ল। বানের পানির মতো ঘোলা ঘোলা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরাসক্ত জবাব দিল হালিমন— কই আর যামু! সবতেরই তো এক অবস্থা।

একটু থেমে আবার বলল— পানি কি কিছু টানছে নাকিরে রমিজ?

চাড়িটা হাতে ধরে রেখে রমিজ মুখ বাঁকাল— এত জলদিই! মিলিটারি খাইয়া থুইয়া গ্যাছে আধখান। বাকি খাইল অভাবে। এইবার আজরাইল হইয়া আইছে বইন্যা। ধান-পান খাইছে অহন বাকিখান খাইয়া ঘর-দুয়ার তলাইয়া তয় না পানি নামব। হালিমন নিরুত্তর। নির্বাক দৃষ্টি বিপর্যস্ত তালগাছের ডালে। রমিজ বলল— তর লিগ্যা একটা জিনিস আনছি। খাবি?

হালিমন সচকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরাল— কী? কী রে রমিজ্যা? চাচী বুঝি আমার লিগ্যা ভাত পাঠাইছে?

রমিজের ভেজা চুল বেয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টিতে কালচে হওয়া নীল ঠোঁটের উপর দিয়ে। মুখের পানি মুছে রমিজ শুকনো হাসল— ভাত পাঠাইব কই থন? খুদের জাউ খাইছি পরশুগা বিহানে। দুই দিন তো হাবিজাবি দিয়া প্যাট ঠাণ্ডা করত্যাছি। আইজ বড় বুজি গেছিল বরইতলে শাক টোকাইবার। দ্যাহে এই মোডা এক সাপ বরইগাছের ডালে প্যাচ দিয়া ঝুলতে আছে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে ফেলল রমিজ। চাড়ির ভেতরে হাত দিয়ে একমুঠো ভাজা কাঁঠালদানা তুলে আনল। হালিমনের দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসল— নে বুয়া খা। মায় কাইল রাইঙের চুলায় যহীর আগুনে ভাজছিল। আমি কয়ডা সামলাইয়া আনছি তর লিগ্যা, তুইও তো কয়দিন উপাস রইছস বুয়া।

হালিমনের চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে হল। প্রায় খামচে লুফে নিল দানা ক'টা রমিজের হাত থেকে। খোসা ছাড়িয়ে একবারে মুখে দিয়ে ফেলল। কাঁঠালদানা ক'টা খাওয়া হতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। ক্ষুধার মোচড় একশ ছুরির ফলা হয়ে পেটে ঘাই মারতে লাগল। দু'হাতে পেট চেপে ধরে বাঁকিয়ে ছোট হয়ে গেল হালিমন। মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ করে উঠল—

— উঃ রে। আর যে পারি না আল্লাহ্। রমিজ ঘাবড়ে গেল। উপরে উঠে এল। দু'হাতে হালিমনের বাঁকানো শরীরটা নাড়া দিয়ে বলল— ও বুয়া কী হইল? এমুন ক্যান করতে আছস?

গোঙানির টানেই জবাব দিল হালিমন— খিদা, খিদা রে। পরানডা যে আর বাঁচে না। রমিজ্যা আমারে দুগা ভাত দে।

রমিজের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। একটু ভেবে বলল— তুই সবুর কর বুয়া। আমি আইতের কালে দেখছি মরিচ পালানের পাশে ওই ধানের নালার পানিতে একজোড়া নাইরল ভাসত্যাছে। আনিগা।

হালিমন সোজা হয়ে উঠে বসল। বলল— তুই একলা যাইস না, কোহানে আবার হাপ-খ্যেপ বাইজ্যা রইছে। ল' আমিও যাই লগে। উঠে দাঁড়াল হালিমন। চাড়িটা ঘরের দাওয়ায় ঠেলে তুলে হাঁটু-উপচানো পানি ভেঙে দু'জনে মরিচ পালানের দিকে চলল। আকাশের রং আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। এই আকাশ কোনোদিন নীল ছিল। এই আকাশে উজ্জ্বল সূর্য ছিল তা বুঝি ভাবাও যায় না। তীক্ষ্ণ ফলার বৃষ্টির ঝাঁক নিয়ে বাতাস আরো জোরালো হয়েছে।

কোমর-ডুবান পানিতে এসে দু'জনেই থমকে গেল। কোথায় নারকেল। কিছুই নেই। কেবল হু হু করে পানির তোড় নামছে। ভেসে চলছে পচা পাতা, খড়কুটো। রমিজ হতাশ চোখে চারদিকে তাকিয়ে দুর্বল গলায় বলল— এইহানেই তো দেইখ্যা গেছি। কই গেল!

হালিমন রেগে উঠল— দেখছিলি তো তহন ধরলি-না ক্যান? এতক্ষণ কি আর থাকে। কই গ্যাছে গা ভাইস্যা।

রমিজ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— দ্যাখ বুয়া, চাইয়া দ্যাখ, নালা দিয়া কাগো পাতিলা ভাইস্যা যায়। তুই খাড়া। আমি সাঁতরাইয়া যাইয়া ধরি।

বুক-পানি ঠেলে রমিজ নালার দিকে এগিয়ে গেল। হালিমনও দেখল। লাল রঙের একটা মাটির হাঁড়ি ভেসে চলেছে। বেশ বড়। কী আছে ওর মধ্যে! বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অনেক আশার আশ্বাস ঝিলিক দিল মনে; টাকা, সোনা-দানা, অথবা চাল-ডাল বা গম? অর্ধেকটা এগিয়ে সাঁতরে গিয়ে রমিজ আবার ভয় পাওয়া চিৎকার দিল— বুয়া রে। সাপ।

কল্পনার সুখ পিছনে গেল। হালিমন ভয় পাওয়া হতাশায় প্রশ্ন করল— কই রে। কোহানে সাপ?

গলা-পানি থেকে মুখ ফিরিয়ে রমিজ হাত তুলে দেখল— ওই যে পাতিল-ডার লগে লগে সাঁতরাইয়া যাইতে আছে।

হালিমনও দেখল। সত্যিই সাপ। মাথার কিছুটা অংশ উপরে তুলে বিরাট এক সাপ নালার স্রোতে শরীর টান করে হাঁড়ির পাশে পাশে ভেসে চলেছে। যেন হাঁড়িটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হালিমন। ঢোড়া নয়। মাথায় চক্র। সম্ভবত বিষাক্ত সাপ, হাঁড়িটা ধরতে গেলেই সাপের শরীরে হাত পড়বে। দু'জনের নির্বাক নিরুপায় দৃষ্টির সামনে দিয়ে একটা সম্ভাবনাময় হাঁড়ি ভেসে চলেছে। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। এতক্ষণ পানিতে ভিজে শরীর অসাড় হয়ে আসছে। পেটে ক্ষুধার মোচড়ের অবসন্নতা। হালিমনের মনে হল সে বুঝি এখন পানির নিচে তলিয়ে যাবে। সেই বোধটাই তাকে মরিয়া করে তুলল। হঠাৎ করে দুঃসাহসিক কাজ করে বসল হালিমন। সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া সাপটার লেজের দিকে লক্ষ্য করে নালায় ঝাঁপ দিল। সাপের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাঁড়িটা ধরে ফেলল। তারপর এক হাতে হাঁড়ি ধরে সাঁতরে চলে এল কম পানির দিকে। রমিজ স্তম্ভিত। হালিমন হাসছে। এখন সে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সাহসী। হয়তো সে শুনেছিল বিপদের সময় সাপ মানুষকে কাটে না। অথবা চার-পাঁচদিন অভুক্ত মানুষের চোখের সামনে দিয়ে খাদ্য-সম্ভাবনাপূর্ণ একটি পাত্র ভেসে চলে যাওয়া অসহনীয় বলেই হালিমন এমন ঝুঁকি নিয়েছে। হালিমন এখন এসব কিছুই ভাবছে না। পেটের ক্ষুধার মোচড়টা দাউদাউ আগুন হয়ে গেছে। পাতিলটা পালানের কানাচে এনে তার মুখের ঢাকনা সরাল হালিমন। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল— রমিজ্যা রে, জলদি আইয়া দ্যাখ কি ধরছি আমি।

পানি ঠেলে এগিয়ে এল রমিজ— কী রে বুয়া! কী? ট্যাকা?

— না রে। চিড়া। এক পাতিল চিঁড়া।

— দেহি। দেহি। রমিজ ঝুকে পড়ল হাঁড়িটার উপরে।

রমিজের খুশিভরা উৎসুক মুখে তাকিয়ে দৃষ্টি বদলে গেল হালিমনের। রমিজের সামনে থেকে হাঁড়িটা টেনে নিয়ে দু'হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। আর এই মুহূর্তে চিঁড়েগুলোই তার একমাত্র অবলম্বন মনে হল। বুকে হাঁড়ি আঁকড়ে বিরূপ দৃষ্টিতে রমিজকে দেখল হালিমন। না। এ চিঁড়ের ভাগ সে কাউকে দেবে না। এতগুলো চিঁড়ে খেয়েও কম করে পনের-বিশ দিন তার একার চলে যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই মেঘ কাটবে। রোদ উঠবে। বানের পানি টান ধরবে। হালিমন আবার কাজ পাবে। তার দুঃসময় কেটে যাবে।

হালিমন শক্ত ঠাণ্ডা গলায় কথা বলল— না, দেহামু না তরে।

রমিজ অবাক হল— কেন রে বুয়া?

— না।

হালিমনের বিরূপ উতলা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিজ রেগে উঠল— দে বুয়া। পাতিলডা দে। দুইজনেই খাই।

হালিমন দু'হাতে শক্ত করে চিঁড়ের হাঁড়ি ধরে বিশ্রী চিৎকার করে উঠল— দিমু না আমি। কিছুতেই দিমু না।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত রমিজ একমুহূর্তে বোকা হয়ে গেল। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল হালিমনের উপর।

ক্যান দিবি না! দিবি না ক্যান? কে আগে দেখছে পাতিল!

হালিমন অনড়, অচল। চিঁড়ার হাঁড়ি প্রাণপণে আঁকড়ে আছে বুকে। এলোপাতাড়ি কিলচড় মারছে রমিজ পানিতে আলোড়ন তুলে। চিৎকার করেছে— চিঁড়া দে আমারে। চিঁড়া দে। আমি কিছু খাইনাই। আমার প্যাটে ভুখ।

রমিজের চিৎকার কান্না হয়ে গেল। এক হাতে চিঁড়ের হাঁড়ি ধরে আর-এক হাতে রমিজের মাথার চুল খামচে ধরল হালিমন। শক্ত হাতে মাথাটা পানির তলায় ঠেসে ধরল। রমিজ দাপাচ্ছে। তবু মাথাটা ছাড়ল না হালিমন। একহাঁড়ি চিঁড়ার অধিকার সে কিছুতেই ছাড়বে না।

এটাই হালিমনের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। পানির তলায় ধস্তাধস্তি করছে রমিজ। কয়েকবার টলে পড়ে যেতে যেতে নিজে সামলে নিল হালিমন। কিন্তু রমিজের মাথা থেকে হাত আলগা করল না। হঠাৎ হালিমনের তলপেটে একটা লাথি মারল রমিজ। তার পায়ের ধাক্কায় হালিমনের ছেঁড়া শাড়িটা খসে গেল কোমর থেকে। ভেসে গেল বানের পানিতে। এখন হাত বাড়ালে ধরা যায়। কিন্তু এক হাতে চিঁড়ের হাঁড়ি। আর হাতে বন্দি প্রতিপক্ষ। ধস্তাধস্তি হুড়োহুড়িতে শরীরটা আর দাঁড়াচ্ছে না। কী করবে হালিমন। চেষ্টা করল মুখ বাড়িয়ে দাঁতে কামড়ে শাড়িটা ধরতে। তখনি রমিজ আরেকটা ঘাই মারল। মুখটা চুবানি খেল পানিতে। মুখ তুলে হালিমন দেখল, শাড়িটা ভেসে চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। হাত বাড়িয়ে ধরা ছাড়া উপায় নেই। অবসন্ন শরীরটাও যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। শাড়ি আর চিঁড়ের হাঁড়ি দুটো একসঙ্গে বাঁচাতে গিয়ে বোধ হয় হালিমন বুঝল— এভাবে তলিয়ে যেতে যেতে দুটোকে একসঙ্গে বাঁচানো আর সম্ভব নয়। আপাতত মনে হচ্ছে শাড়ির চেয়ে খাদ্যের হাঁড়িটাই তার

জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবান দ্রব্য। কিন্তু শাড়ি? সারা বছরের রোজগার দিয়ে পেটের ভাত মিটিয়ে এই আক্রার দিনে সে একটা আব্রুরক্ষাকারী আচ্ছাদন কিনতে পারবে না। গায়ের পিরান নেই অনেকদিন। ছিল শুধু ছেঁড়া একটাই শাড়ি। এখন কোনটা রক্ষা করবে হালিমা। শরীরটা টলে উঠল। চিঁড়ার হাঁড়ি ধরা মুঠিও আলগা হয়ে গেল। আর কী যেন কেন এই ক্ষণিক অন্যমনস্কতায় হালিমন ধীরে ধীরে হাত আলগা করে রমিজের মাথাটা ছেড়ে দিল। নাকে-মুখে পানি আটকান দমবন্ধ হয়ে-আসা রমিজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। চিঁড়ার হাঁড়ি তখন তলিয়ে গেছে। রমিজ বড় বড় দম টেনে বলল— কী করলি তুই!

চিঁড়াগুলান ভাসাই দিলি!

হালিমন নিরুত্তর। নিরাবরণ দেহ আর পেটের ক্ষুধা ছাড়া যেন কোনোকিছুরই উপলব্ধি নেই তার চেতনায়।

রমিজ ধমকে উঠল— কথা কস না ক্যান?

হালিমন ক্লান্ত পরাজিত উত্তর দিল— আমার একখানা ছিড়্যা কানি। তা-ও ভাসাইয়া দিলি! অহন ইজ্জত বাঁচামু ক্যামনে?

রমিজ খিঁচিয়ে উঠল— কিসের ইজ্জত! একবার মিলিটারির ডরে আগুনে ফাল দিছিলি! তহন বুঝি পেটে ভাত আছিল। তাই ইজ্জতের দাম আছিল। প্যাটের ভোকে বাঁচে না, তার আবার ইজ্জত। গলায় ফাঁস নিবার পারস না মাগি!

হালিমন জবাব দিল না। অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখল তার শরীরের আবরণী শতছিন্ন ন্যাকড়ার টুকরোটা বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরে। ক্ষুধার্ত শরীরে সাঁতরে সেটা ধরা আর সম্ভব নয়। সে কি এখন ডুবে মরবে? কিন্তু অভুক্ত শরীরে মনের সে জোর কোথায়? বরং শূন্য জঠরে যে বাঁচারই আকুলিবিকুলি। হালিমন ঘুরে দাঁড়াল। পানি ঠেলে, নালা সাঁতরে ওপার কাচার উপরে গিয়ে উঠল হালিমন। সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহ। ক্লান্ত সিক্ত শরীর। একবুক পানিতে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রমিজ চেঁচিয়ে উঠল— কই যাস। এই পানি-ডুবা দুনিয়ায় জ্বইলা মরবার আগুন পাবি কই?

নিজের পরার ছেঁড়া গামছাটা ছুড়ে দিল রমিজ।

— এইনে আমার গামছা ছিঁড়াডা। পিন্দা যাইয়া ফাঁসি দিয়া মর।

হালিমন এক পলক দাঁড়াল। না, গামছায় তার আর দরকার নেই। এইবারে পানি তার একমাত্র শেষ বস্ত্রখণ্ড নয়, বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার ইজ্জত। এখন আছে শুধু ক্ষুধা। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কথা হল, তার পেটের জ্বালার নিবৃত্তি চাই। কাচার শেষ মাথায় সেই ঠিকাদারের বাড়ি। সেখানে আছে কাঠের পাটাতন করা মজবুত ঘর আর মজবুত করা চালের ভাতের আশ্বাস।

হালিমন বলল— তুই বাড়িত যা গিয়া রমিজ। আমি সমসের ঠিকাদারের বাড়ি যাই। বাজারে ঘর নিমু।

রমিজ বজ্রাঘাতের মতো তাকিয়ে রইল। সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল— ছিনাল।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841803437303